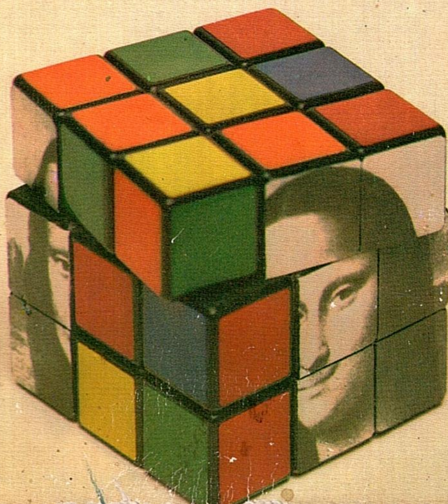
সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ·আ·ক·খ

গ. কিরিলেঙ্কো, ল. করশুনোভা

ব্যক্তিত্ব কী



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

গালিনা কিরিলেঙ্কো, লাদা করশুনোভা

ব্যক্তিত্ব কী



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: সুবীর মজুমদার

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

ABC социально-политических знаний

Г. Кириленко, Л. Коршунова

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ?

На языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

G. Kirilenko, L. Korshunova

WHAT IS PERSONALITY?

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

K $\frac{0301010000-364}{0(14)-89}$ -241-89

ISBN 5-01-001678-8

সূচি

ভূমিকা

বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি ছাড়া বলা চলে, ‘মানুষ’ সমস্যা হল দর্শনের সেই মুখ্য সমস্যা, যার চর্চায় অনন্তকাল ধরে ব্যস্ত আছেন নানা যুগের চিন্তাশীল মনীষীগণ। মানুষের চারিপাশের প্রাকৃতিক জগৎ ও তার অন্তঃপুরে প্রকৃতিগত উন্মেষের প্রতি, যাদের নিয়ে মানুষের বসবাস, তাদের প্রতি এবং একই সময়ে নিজ পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের প্রতি মানুষের সম্পর্ক, মানুষের স্বাধীনতার সীমানা, জীবনের অর্থ, মৃত্যু ও অমরত্ব সমস্যা — এই হল সেই অসম্পূর্ণ প্রশ্নমালা, আমাদের মতে, যা নিয়ে গঠিত হয় তথাকথিত ‘মানুষ’ সমস্যা। ‘যেদিন থেকে মানবজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, লোকে নিত্য এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, মনুষ্য জন্মের অর্থ

কী এবং তার পার্থিব কর্তব্যই-বা কী!' — 'রোম' ক্লাবের জনক আ. পেচ্চেইয়ের এই উক্তি 'মানুষ' সমস্যা বিষয়ক যেকোন গবেষণার সূত্রলিপির কাজ করতে পারে।*

বিভিন্ন সামাজিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, প্রবল বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতির যুগে 'মানুষ' সমস্যার প্রতি আগ্রহ অতিশয় বেড়ে চলেছে। মানবজাতির ও আলাদা আলাদা মানুষের প্রতিটি সন্ধিক্ষণের ও আলাদা আলাদা মানুষের ইতিহাসের নির্বাচন সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত সুতীব্র হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, কে অস্বীকার করবে যে, 'মানুষ' সমস্যা হল 'আমাদের কালের মূল সমস্যা আর তার সফল সমাধানের উপরই নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ।'** তবে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় গভীর নানা সামাজিক পরিবর্তন 'জীবন-তাৎপর্যের' প্রশ্নাদির উত্থাপনা ও মীমাংসার উপর বিভিন্ন রকমের প্রভাব ফেলে।

সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্মীয়মাণ সমাজে সক্রিয়, কর্ম-তৎপর মানুষের চাহিদা বেড়ে থাকলে — যার কাছে সমাজ পুনর্গঠনের সুবিশাল লক্ষ্যগুলি তার আন্তরিক

---

* আ. পেচ্চেই। মানবিক গুণাগুণ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৫, পৃঃ ৬৩ (রুশ সংস্করণ)।

** ভারত আবিষ্কার। মস্কো, চিরায়ত সাহিত্য, ১৯৮৭, পৃঃ ৪৪৫ (রুশ সংস্করণ)।

লক্ষ্যসমূহে পরিণত হয় — বুর্জোয়া সমাজে মানুষের বিকাশ ও পূর্ণতর রূপলাভ প্রক্রিয়া বিপুল কঠিনতার মুখোমুখি হয়। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব একদিকে ব্যক্তিত্বের মান বিকাশের প্রতি, তার জ্ঞান, দক্ষতা, ইচ্ছাশক্তির প্রতি বড় দাবিদাওয়া উত্থাপন করে। অন্যদিকে — বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতি পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়া বহুগুণ বাড়ায়। মানুষের প্রতিভা দ্বারা যাকিছুই সৃষ্টি হয়েছে — জটিলতম যন্ত্রপাতি ও দৈনন্দিন জীবনের জিনিসপত্র, আত্মিক মূল্যবোধ ও 'মানবিক রসে পরিপূর্ণ' প্রকৃতি — তার বিরোধী রূপে থাকে তার পক্ষে কোনকিছু অজানা, শত্রুভাবাপন্ন ব্যাপার। নিজের প্রতি, উত্থাপিত লক্ষ্যসমূহের সাফল্যজনক অর্জনের সম্ভাবনার ব্যাপারে, নিজ অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ততার ব্যাপারে মানুষ বিশ্বাস হারায়। আজকের মানুষের সমকালীন সমাজের এই বৈশিষ্ট্য পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানী ডি. রাইজম্যানের মতে, বিংশ শতাব্দীর মানুষের 'লক্ষ্য হল বাইরের দিকে', সে হারিয়েছে ভরকেন্দ্র, লক্ষ্য উত্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পারিপার্শ্বিকের ব্যাপারে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা, সে পরিণত হয়েছে এক 'আজ্ঞাবহ-মানুষে', যে তার ওপর জবরদস্তি চাপান নানা মূল্যবোধের প্রতি অন্ধভাবে অধীন থাকে।

সামাজিক তৎপরতার ব্যাপারে উৎসাহ ও সুমহান ভাবাদর্শাদির প্রতি বিশ্বাস হারানো এবং একই সময়ে নির্মমতা, আগ্রাসন বৃদ্ধি স্বয়ং পশ্চিমের তাত্ত্বিকগণ দ্বারা বিবেচিত হয় এক বিপজ্জনক উপসর্গ রূপে,

যা সঙ্কটজনক পরিস্থিতিরই পরিচায়ক। সৃজনী উদ্যম জাগরণের ব্যাপারে তাদের দ্বারা প্রস্তাবিত নানা উপায়, আত্মিক বিকাশের ব্যাপারে নানা দাবিদাওয়া বিভিন্ন ধরনের — ব্যাপক মনরোগ নিরাময় থেকে শুরু করে মানুষের আচরণের বংশগত মূলের পরিবর্তন পর্যন্ত। কানাডার ম. ম্যাকলিউয়েন এতে দুশ্চিন্তার বিন্দুমাত্রও কারণ দেখেন না, জীবনে তৎপর অবস্থান খোয়ানকে যিনি বিবেচনা করেন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে মহান সামাজিক মঙ্গল রূপে।

মানুষের ও আধুনিক সমাজে তার স্থানের ব্যাপারে বহুরূপী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকা সত্ত্বেও এক ব্যাপারে পশ্চিমের বিজ্ঞানীদের মিল আছে: 'মানুষ' সমস্যার প্রতি সুপ্রখর আগ্রহের পাশাপাশি বজায় আছে সেইসব জটিল সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন ও মীমাংসার ব্যাপারে তাদের অনিচ্ছা, যেগুলি বিনা মানবিক অস্তিত্বের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে মানুষের অধিবিদ্যক প্রতিতুলনা ভিত্তিক 'মানুষ' সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত হল ব্যাপক সামাজিক সমস্যাদির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকার স্বকীয় ধরনের এক বাহানা। অমার্কসবাদী দার্শনিকরা নিজেদের সীমিত রাখেন কোন এক জাতীয় পরম মানবিক 'গুণাগুণ' চর্চার মধ্যে, যেগুলিতেই তাঁরা নিরীক্ষণ করেন সমস্ত সামাজিক দুর্দশার কারণ এবং যেগুলির উন্নতিতেই দেখেন নানা সামাজিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির উপায়কে। আ. শোপেনহাওয়ারের উক্তি অনুযায়ী, মানুষের জগৎ 'ঠিক হোৎসের নাটকের মতো',

যেখানে সদা উপস্থিত একই নানা চরিত্র, যাদের চিন্তাধারা ও ভাগ্যও একই ধরনের: প্রত্যেক নাটকে উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলী অবশ্য বিভিন্ন, তবে ঘটনাদির অন্তরাত্মা একই ধরনের: এক নাটকের বিভিন্ন চরিত্র অন্য নাটকের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুই জানে না, যদিও স্বয়ং তারাই তাতে অংশগ্রহণ করেছে; তাই আগেকার নাটকগুলির সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পান্ডালোনে আরও বেশি চটপটে ও উদার, তারতালিয়া — বিবেকবান, ব্রিগেল্লা — সাহসী ও কালোমবিনা — নম্র হয়ে ওঠে নি।'* যেহেতু মার্কসবাদ দর্শনের বিষয়বস্তু রূপে মানবিক গুণাগুণের অপরিবর্তনীয় সমষ্টি চর্চায় রত হয় না, তাই পশ্চিমের বহু বিজ্ঞানী মনে করেন 'মানুষ' বিষয় হল মার্কসবাদের আগ্রহের বাইরে। তাই মার্কসবাদকে বুঝি-বা 'মানুষ', 'মানবিক' সমস্যা দ্বারা 'অনুপূরণ করা' দরকার। এইভাবেই দেখা দেয় অস্তিত্ববাদ ও মার্কসবাদকে, মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদকে, বস্তুবাদী ও ধর্মীয় নানা বিশ্ববীক্ষাকে, 'নব মানবতাবাদ', 'মানবিক সমাজতন্ত্রের' ইউটোপিয়াকে ঘনিষ্ঠ করার ভাবধারা।

মার্কসবাদের দর্শনে মানুষ চর্চার স্থান কোথায়? মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনের পক্ষে তা কোন আংশিক নয়, বরং **কেন্দ্রীয়** সমস্যা, দর্শনের গোটা বিষয়বস্তুতে তা নিহিত, তার লক্ষ্যাভিমুখিতা অনুধাবনের

---

* আ. শোপেনহাওয়ার। সংগৃহীত রচনাবলী, খঃ ২, মস্কো, ১৯৮০, পৃঃ ১৮৯ (রুশ সংস্করণ)।

চাবিকাঠিস্বরূপ।

সুতরাং মানুষ বলতে কী বোঝায়, 'যথার্থ মানবিক' ও অ-মানবিকের মধ্যে সীমারেখা কোথায়? মানুষ — এ হল আমি, তুমি, সে; এ হল সবে জন্মানো শিশু ও থুরথুরে বৃদ্ধ, আর মহান বিজ্ঞানী ও অশিক্ষিত কৃষক, আর পুরুষ ও নারী; মনুষ্য গোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে পড়ে যেমন আফ্রিকা মহাদেশের বাসিন্দা, তেমনই ইউরোপবাসী, আর রাশিয়ান, আমেরিকান, আরব ও জাপানি...। কিসে এদের মিল? হতে প্যারে, বাইরের আকৃতি, সাধারণ জৈবিক নানা লক্ষণে?

'মানুষের নৃকুল চর্চার' পক্ষপাতিদের মতে, গোটা মানবিক সংস্কৃতি 'হল বিশেষ এক পরম-লক্ষণের (Primate) শুধু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোষ্ঠীজনিত আচরণ এবং ব্যাখ্যা করা উচিত সেইসব নীতি দ্বারা, যা জড়িত যেকোন পরম-লক্ষণের আচরণের সঙ্গে।'* বহিরাবরণের নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও, প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ আছে সুস্থায়ী নানা আকৃতিগত লক্ষণ, সাধারণ দেহযন্ত্রজনিত বৈশিষ্ট্যাবলী। মানুষের নানা জৈবিক বিশেষত্ব অধ্যয়ন করে আমরা লক্ষ্য করেছি, মানুষ হল এমন এক জৈবিক বিশেষ-সত্ত্বা, যা সুদীর্ঘ জৈবিক ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় 'উত্তরাধিকারজনিত স্বেচ্ছাচারিতার' কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে,

---

* Fox R., Primate Kin and Human Kinship.—in: Biosocial Antropology. L., 1975, P.9

তার আচরণ আর শর্তহীন প্রতিফলনের যোগফল দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে, 'মানুষের জৈবিক প্রকৃতির' এমন বৈশিষ্ট্য নিজেই বুঝি-বা শুধু এক জৈবিক বিশেষ-সত্তা রূপে মানুষ সমস্যা বিবেচনার অপর্যাপ্ততার প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে। কেননা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ব্যাপারে নিজ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের নানা জৈবিক পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত এবং 'বদলে' কিছু না-পাওয়া মানুষ — 'খারাপ', অপরিপূর্ণ এক জন্তু মাত্র, যার অতি অবশ্যই বিনাশ ঘটা উচিত ছিল, অথচ আমরা জানি তা ঘটে নি। সুতরাং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের অত্যাবশ্যক, তবে অপর্যাপ্ত লক্ষণ।

'মানুষের' সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলি কী?

মনে হয়, নিজে থেকেই এর উত্তর দেওয়া চলে: মানুষ সৃষ্ট সব বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের মূলে রয়েছে তার যুক্তি।

প্রকৃতি আয়ত্তে আনায় সুবিপুল সফলতার ব্যাপারে মানুষ অবশ্যই তার যুক্তির কাছে কৃতজ্ঞ। তবে দখলদারিদের হাত থেকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষাকারী সেনার বীরত্বের মূলে, ন্যায়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রামীদের সাহসিকতার, মায়ের ভালবাসার মূলে কি শুধু যুক্তি রয়েছে? চাক্ষুষ ব্যাপার যে, মানুষের পারস্পরিক-সম্পর্ক ক্ষেত্রটি যথেষ্ট হারে নিয়ন্ত্রিত হয় নানা নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা, সব সময়েই যেগুলি যুক্তির সঙ্গে

সুষমভাবে অবস্থান করে না।

দর্শনে অন্য এক অবস্থানও বিদ্যমান, যা অনুসারে না যুক্তি, না সহৃদয়তা, বরং নান্দনিক অনুভূতি, সুন্দরের ব্যাপারে অনতিক্রমণীয় চাহিদা — এই হল, যথার্থ মানবিক ; সৌন্দর্যই বিশ্বের রক্ষাকর্তা।

এটা চাক্ষুষ, যেমন সত্যের প্রতি প্রচেষ্টা, তেমনই সুন্দরের প্রয়োজনীয়তা, ন্যায় ও সহৃদয়তার ব্যাপারে তৃষ্ণা — মানুষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা নেওয়া হয়েছে তার আত্মিক জীবনের দিক থেকে। তবে আমরা যদি মানুষের সারকথা নির্ধারণ সীমিত রাখি তাকে শুধু সত্য, সহৃদয়তা ও সুন্দরের ধারক-বাহকের মধ্যে, তাহলে আমরা অসংখ্য বৈপরীত্যের মুখোমুখি হব।

কেননা কোনমতেই প্রত্যেক মানুষ উল্লিখিত এই 'ত্রিবিধ গুণের' অধিকারী নয়। কোন একজন সুন্দরের অনুভূতি বঞ্চিত, অন্যজন সত্য অনুসন্ধান থেকে বহুদূরে অবস্থিত, আর এমন অনেক লোক আছে, যারা অতি সহজে 'সহৃদয়তার নিয়ম' — নৈতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে 'যুক্তি', 'সহৃদয়তা', 'সুন্দরকে' বিভিন্নভাবে বোঝা হয়েছে।

যেমন, ভারতের প্রাচীন মহাকাব্য 'মহাভারতে' মুখ্য নারী-চরিত্র সুন্দরী দ্রৌপদী চমৎকার কবিতার লাইনে তাঁর পঞ্চপতির সৌন্দর্য, সাহস, বুদ্ধির জয়গান গেয়েছেন। নৈতিক কীর্তি রূপে বিবেচিত তাঁর প্রেম ও বিশ্বস্ততা আজকের মানুষের চোখে

শুধু অনৈতিক বলে মনে হয়।

স্বাভাবিকভাবেই ধরা যেতে পারে, মানুষের চেতন-ক্ষমতা, তার নৈতিক, নান্দনিক চাহিদা নির্ধারিত হয় তার সামাজিক পরিবেশ দ্বারা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, মানুষের ব্যাপারে আমাদের সংজ্ঞা অলক্ষ্যে সমাজে, মানুষের ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে।

মানুষের সারকথা শুধু তার আত্মিকতার উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। মানুষ হল এক জগৎ, যাতে সে বাস করে, যে কিনা সামাজিক পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু তারই জন্য নির্ধারিত এক স্থানের অধিকারী। মার্কসের উক্তি অনুযায়ী, 'মানুষের সারকথা আলাদা কোন ব্যক্তিতে হাজির বিমূর্ত কোনকিছু নয়। নিজ ক্রিয়াকলাপে তা হল সব সামাজিক সম্পর্কের যোগফল।'*

সুতরাং, মানুষ কী — দু'চার কথায় তার সংজ্ঞা নির্ধারণ অসম্ভব ব্যাপার। 'মানুষ' — এই ধারণার অনেক অর্থজনিত পরশ বিদ্যমান। প্রায়ই আমরা 'মানুষ' বলে অভিহিত করি নির্দিষ্ট **এক ব্যক্তিকে,** তার নানা জৈবিক বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব বহিরাবরণ, আত্মিক জীবনের অদ্বিতীয় নানা দিক, সমাজে সুনির্দিষ্ট অবস্থান সহ, জীবন পথে যা শুধু তার জন্যই হাজির।

তবে আমরা যখন **মানুষের সারকথা** সম্বন্ধে বলি,

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৩, পৃঃ ৩ (রুশ সংস্করণ)।

তখন বোঝাই অন্য কোনকিছুকে। এখানে 'মানুষ' — কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং এক বিমূর্ত সত্তা, যা নির্দেশ করে প্রকৃতি থেকে তার তারতম্যের নানা নীতিকে, সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ সারমর্মকে, মানুষের সাবজেকটিভ মনোভাবের অবজেকটিভ ভিত্তিকে, মানুষের ক্রিয়াকলাপের পরিশিষ্ট ক্ষেত্রকে।

তাহলে কি আমাদের নিজস্ব অন্তর্জগৎ, সমাজে আমাদের অবস্থান, আমাদের সম্ভাবনা ও চাহিদা বোঝার জন্য আমাদের পক্ষে শুধু এই দুই ধারণা — 'একক ব্যক্তি' ও 'মানুষের সামাজিক সারবস্তুই' যথেষ্ট? শুধু এই দুই ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা হলে আমরা সমাজের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নিম্নলিখিত মডেল পাই : সামাজিক সম্পর্কাদির, সামাজিক যোগাযোগ সমূহের (মানুষের সামাজিক সারবস্তু) গোটা যোগফল বুঝি-বা সমাজে আচরণ আজ্ঞা, নিয়ম-কানুন, মাত্রার আকারে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে ফুটে ওঠে। কোন ব্যক্তি বিশেষ হয়ে ওঠে নানা সামাজিক ক্রিয়ার শুধু এক লক্ষ্যবস্তু, স্বকীয় এক দর্পণ, যাতে কম-বেশি পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয় সামাজিক জগৎ।

সমাজ একস্তরা হলে, ব্যক্তি বিশেষের কাছে উত্থাপিত দাবিদাওয়া অতি সরল, একার্থক ও পরস্পর-বিরোধী না হলে, এমন মডেল সত্যের কাছাকাছি হবে। সমাজ বুঝি-বা মানুষের মধ্যে একগোছা আজ্ঞা পুরে দেয়, যা অনুসারে মানুষ — সামাজিক অখণ্ডতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিনম্র আজ্ঞাবহ

রূপে — বসবাস ও কাজকর্ম করে। তবে আধুনিক মানুষ থাকে এক জটিল ও পরস্পর-বিরোধী দুনিয়ায়, যাতে অসংখ্য পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা বিদ্যমান, বিভিন্ন সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বৈজ্ঞানিক ধারারও মুখোমুখি অবস্থান রয়েছে। সমাজে চালু আছে অসংখ্য একেবারে পরস্পর-বিরোধী মাত্রা, নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি। মানুষ এই সামাজিক অখণ্ডতার নিষ্ক্রিয় ছাপ হয়ে থাকলে তার আত্মিক জগৎ পরিণত হবে নানা পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার এক সংঘর্ষ মঞ্চে। তবে সমাজে মানুষ — সর্বাগ্রে হল কর্মী। তা সে যেকোন দার্শনিক অবস্থান থেকেই আমরা মানুষ চর্চা শুরু করি না কেন, আমরা এ অস্বীকার করতে পারি না যে, মানুষের হাতেই, ইচ্ছা-শক্তিতে, মেধায় তৈরি হয়েছে অতি জটিল যন্ত্রপাতি, নানা শহর, পাতা হয়েছে পথঘাট ও সেতু, করা হয়েছে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সৃষ্টি হয়েছে শিল্প নিদর্শন। একক ব্যক্তি কীভাবে কাজকর্ম করতে পারে, যার আত্মিক জগৎ হল বিপরীত ধরনের নানা অবস্থান, মাত্রা ও ধারণার পুরোপুরি 'নৈরাজ্যস্বরূপ'? নানা নিয়ম, মাত্রার পরস্পর-বিরোধী গোছার আকারে ব্যক্তি বিশেষের চেতনায় 'স্থানলাভ করে' সামাজিক জগৎ তার সামাজিক তৎপরতার, কাজ করার ইচ্ছার গতি পুরোপুরি রুদ্ধ করে। মানুষের হাল হয় উপকথার সেই গাধার মতো, যার অবস্থান সমদূরত্বের দুই গাঁট খাবারের ঠিক মাঝখানে।

খাবার ইচ্ছে দুটোই, অথচ খেতে পারে না একটাও। তবে অভিজ্ঞতা আমাদের দেখায়, তা ঘটে না। সমাজ যত বেশি নিঃসঙ্গ ধরনের হয়, পরস্পর-বিরোধী, সক্রিয়, স্বাধীন কাজকর্মের ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতাও তত বেশি উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

সুতরাং, এক নিষ্ক্রিয় ছাপ, নানা সামাজিক প্রভাবের লক্ষ্যবস্তু রূপে ব্যক্তি বিশেষের ধারণা যথেষ্ট নয়, তা মানুষের সক্রিয়তার ভিত্তি ব্যাখ্যার কোন সুযোগ দেয় না। মানুষের ক্রিয়াকলাপ কিসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সামাজিক সম্পর্কের শুধু **অবজেক্ট** নয়, বরং **সাবজেক্ট** রূপেও বোঝার জন্য আরও এক ধারণা — মানুষের **ব্যক্তিত্বের** ধারণা উত্থাপনের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিত্ব — সামাজিক সম্পর্কের সাদামাটা অন্ধ-বাহক, রবারস্ট্যাম্প নয়। সামাজিক সম্পর্ক প্রতিসৃত হয় ব্যক্তিগত দাবিদাওয়া, নানা লক্ষ্য ও ভাবাদর্শের প্রিজম ভেদ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে সামাজিক সম্পর্কের বিদ্যমান ব্যবস্থার স্বাধীন সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নানা কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা। বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের যোগফল ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে তত বেশি পরিপূর্ণভাবে রূপদান করতে পারে, যত বেশি হারে তা নিজের প্রত্যক্ষ ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে, চালু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে, তার প্রতি স্বাধীন সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম। সুতরাং, ব্যক্তিত্ব হল এক ব্যক্তি বিশেষ তার নানা সামাজিক

বৈশিষ্ট্য সহ, যাকে বিবেচনা করা হয় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অবজেক্ট ও সাবজেক্ট রূপে। উল্লিখিত সবকিছু থেকে ব্যক্তিত্বের আরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য — তার ঐতিহাসিক ধর্মের কথা বলা যায়। তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমাজে এক বিশেষ ব্যক্তির অবজেকটিভ প্রয়োজনীয়তা কখনও হঠাৎ দেখা দেয় না। ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ায়।

তবে মানবজাতির ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোন ব্যক্তিত্ব দেখা দেবার অর্থ এই নয় যে, সব ব্যক্তিই আপনা-আপনি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত বিকাশ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টার দরকার হয়। ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা ও জীবনের শেষ পর্যন্ত তা থাকা — এ হল শিক্ষা ও আত্মশিক্ষার অন্যতম এক মূল কর্তব্য। যেমন সরল সমাজ-বিজ্ঞান (ব্যক্তিত্ব হল সমাজের নিষ্ক্রিয় ছাপ, নানা সামাজিক প্রভাবের অবজেক্ট) থেকে, তেমনই সাবজেক্টিভবাদ (ব্যক্তিত্ব হল সব সামাজিক প্রক্রিয়ার শুধু সাবজেক্ট) থেকে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণার অবস্থান সমদূরত্বে। মার্কসবাদের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল ব্যক্তিত্ব গঠনের অবজেক্টিভ সামাজিক শর্তকে স্বীকার করা এবং একই সময়ে — সমাজে এক সক্রিয় উন্মেষ রূপে ব্যক্তিত্বকে বিবেচনা করা, ব্যক্তিত্বের প্রতি ঐতিহাসিক পন্থা অনুমোদন করা, তার আত্মিক জগতের অদ্বিতীয়, ব্যক্তিগত চরিত্রকে গণ্য করা। এইসব অবস্থান থেকেই আমরা ব্যক্তিত্ব

গঠনের নানা ঐতিহাসিক পর্ব, তার আত্মিক জগতের মূল স্তরগুলি বিবেচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। দেখা যাক্, কেমন মানুষের স্বপ্ন দেখতেন অতীতের দার্শনিকরা, বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিত্বের সামনে কী কী সমস্যা হাজির হয় আজকাল, দুই সামাজিক ব্যবস্থার সহাবস্থানের যুগে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কেমন ব্যক্তিত্বের দরকার, আর তা গঠনের মূল পথগুলিই-বা কেমন।

১। মানুষের ব্যক্তিত্ব —
এক ঐতিহাসিক ব্যাপার

১। মানুষ হওয়ার পথে

মানুষের ‘জন্ম’ সূত্র অনুসরণ, Homo Sapiens হয়ে-ওঠার সুস্পষ্ট পর্বগুলি নির্ধারণ, জীব জগতে তাকে আলাদা স্থান দেওয়া — এ সবের বিশেষ প্রচেষ্টা না করে আমরা বরং এই প্রক্রিয়ার প্রধান কালপর্বগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য টানা যায় ষোলআনা ভিন্ন ভিত্তিতে : শরীর-আকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জীবনযাত্রা, খাদ্যবৈভিন্ন্য, বাক্-ক্ষমতা, ইত্যাদি অনুযায়ী। তবে খোদ মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে ভিন্ন রূপলাভ করতে শুরু করে শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ার দরুন। ঠিক এই শ্রমেই পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের সেই বিশেষ যোগাযোগ,

নিজের ব্যাপারে সেই বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী কালে মানুষকে গ্রহনক্ষত্রের সীমা অতিক্রম করতে, সাগর-মহাসাগরের সুগভীর তলদেশ ও ভূগর্ভ উদ্ধারে, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, অপরূপ শিল্প সৃষ্টিতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেকোন জীব ও মানুষের চাহিদা একই রকমের। তার দরকার খাদ্য ও পানীয়ের, ঠান্ডা ও গরমের, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার, বংশরক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনার...। তবে এ সবই সে বাস্তবে রূপ দেয় পশুর থেকে ভিন্ন উপায়ে। পশু যত জটিলই হোক না কেন, আর প্রথম দৃষ্টিতে মানুষের অনুরূপ যতই ক্রিয়াকলাপ চালাক না কেন, পশু সর্বদাই তার প্রত্যক্ষ জৈবিক চাহিদার বশবর্তী থাকে। এর অর্থ কী : পশুর করা যেকোন কাজই তার 'আদি' জৈবিক চাহিদাপূরণের প্রচেষ্টাস্বরূপ, এমন কি মাঝেসাঝে আমাদের এ মনে হলেও যে, কোন পশুর নতুন নতুন চাহিদা দেখা দিয়েছে। মানুষের থেকে পশুর পার্থক্যস্বরূপ পশু নতুন নতুন কোন চাহিদার অধিকারী হয় না, সে শুধু যথেষ্ট জটিল নানা কাজকর্ম করতে শেখে। যেমন, অতি সরল জ্যামিতিক চিত্রাদির তফাৎ বোঝা, নির্দিষ্ট নানা বাক্যধারায় প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন, ট্রেনারের নানা হুকুম পালনের অর্থ এই নয় যে, জ্যামিতির ব্যাপারে তার উৎসুক্য বা কসরতে আগ্রহ বেড়েছে। এইসব 'মানুষ জাতীয়' আচরণের মূলে আছে যন্ত্রণা (সাজা) এড়ানোর, পুরস্কার লাভের প্রচেষ্টা।

তাই পারিপার্শ্বিক জগতের হরেক রকমের বস্তু পশুর মনে সেগুলির গুণাগুণের গোটা সমৃদ্ধ-ভাণ্ডারের আকারে প্রতিফলিত হয় না, হয় বরং সেইসব দিক দ্বারা, যেগুলি নানা জৈবিক চাহিদাপূরণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। পশুর দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তির সঙ্গে অজড়িত বস্তুর কোন অস্তিত্বই বুঝি-বা তার কাছে নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বানর তার সমস্ত ঔৎসুক্য সত্ত্বেও, অথবা বিজ্ঞানীদের কথায়, সুউন্নত লক্ষ্যাভিমুখী প্রতিফলন-ক্ষমতা, 'এটা কী?' ধরনের প্রতিফলন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, শিশুদের খেলনার গঠন পদ্ধতির ব্যাপারে কস্মিনকালেও আগ্রহ দেখায় না। তাকে আকর্ষণ করতে পারে বাইরের আকার, চলা-ফেরা করার, আওয়াজ করার ক্ষমতা, এককথায়, যা কিছুই ভয় দেখাতে পারে, খাওয়া চলে, যা নিয়ে খেলা, ইত্যাদি, করা চলে। তবে কোন জিনিস গঠনের নানা অবজেকটিভ নিয়ম — উৎসুক শিশু যা নিয়ে সদা ব্যস্ত ('খেলনাটা চলা-ফেরা করছে কেন?') — বানরের আগ্রহ পরিসরের বাইরের ব্যাপার। মানুষের ওপর নির্ভর-না-করা স্বাভাবিক আকারে বিদ্যমান পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি পশুর কোন আগ্রহ নেই।

ঠিক এর ওপরই নির্ভর করে পশুর নিজের প্রতিও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ সদা অবাক হয়েছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিঁপড়েদের ছিমছাম ক্রিয়াকলাপ দেখে। তবে দল-বেঁধে কোন জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া পিঁপড়েদের ওপর বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ

প্রমাণ করেছে, তাদের বোঝা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া - জটিল কোন সংযোগ রক্ষাকারী ক্রিয়াকলাপের পরিণাম নয়, যাতে প্রত্যেকের 'নিজস্ব জায়গা রয়েছে', বরং পিঁপড়েদের যান্ত্রিকভাবে শক্তি ক্ষয়ের ফল, যাতে প্রত্যেকে 'যে-যার মতো' কাজ করে। বাইবেলের একটি উপাখ্যান সুবিদিত, যার মতে লোকেরা ঠিক করেছিল ব্যাবিলনে আকাশ-ছোঁয়া এক মিনার তৈরি করবে ; কিন্তু হঠাৎ তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল, একে অন্যকে আর বুঝতে পারল না, তাই মিনারও আর তৈরি করা হল না। জটিল কোন কর্তব্য পালনে পশুদের আচরণও ঠিক এই 'ব্যাবিলনের মিনার তৈরির' পরিস্থিতির অনুরূপ (যদি অবশ্য প্রত্যেক পরীক্ষা-বস্তুর স্থান, তার কাজকে শর্তহীন প্রতিফলন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা না হয়)। একই সঙ্গে যদি কয়েকটি বানরের সামনে এ কর্তব্য উত্থাপন করা হয় যাতে একটার ওপর আরেকটা বাক্স রেখে ওপরে ঝোলান কলা পাড়া যায়, তাতে কেউই তাতে সফল হয় না। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে প্রত্যেক বানর অন্যকে গণ্য না করে কাজ শুরু করে, দেখা দেয় কলহ, ফলে বাক্সের মিনারও আর গড়া হয় না। অথচ এই একই কাজ প্রত্যেক বানর আলাদাভাবে সহজেই করে।

সুতরাং, পশুরা তাদের নানা চাহিদা ছাড়তে, সেগুলি 'ভুলতে' পারে না। তাই স্বাভাবিক বিশ্বের ব্যাপারে চেতনালাভ (চেতনাজনিত সম্পর্ক), এই বিশ্বে,

নির্মল আকাশ, সবুজ অরণ্য, স্বচ্ছ নদনদী ও বিশাল পাহাড়-পর্বতের ব্যাপারে আনন্দে-অবগাহন (নান্দনিক সম্পর্ক) পশুর পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। অন্যের জায়গায় নিজেকে বসানোর (নৈতিক সম্পর্ক) ক্ষমতাও পশুর পক্ষে বৈশিষ্ট্যজনক নয়।

পশুর রাজত্ব থেকে মানুষকে এইভাবে 'আলাদা করার' ব্যাপারে আগে থেকেই আপত্তি চোখে পড়ছে। কেননা, লোকে বলতে পারে, অনেক পশুই তো 'লোকেদের মতো' কাজকর্ম করতে পারে — তারা পাথর, লাঠি-সোটা, অন্যান্য 'হাতিয়ার' ব্যবহার করতে পারে, যার প্রমাণ দিয়েছে উপরে উল্লিখিত বানরের ওপর পর্যবেক্ষণের ঘটনা। তবে পশু ও মানুষ দ্বারা বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। পশুর পক্ষে লাঠি-সোটা, পাথর পশুর স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গির 'যুক্তির' অধীন থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বানর লাঠির সাহায্যে ফল পারার সময় তা হাত আরও 'লম্বা' করার কাজ করে। মানুষ কিন্তু সেই যুক্তির 'অধীন থাকে', যা অন্তর্ভুক্ত আছে খোদ শ্রম-হাতিয়ারে, তাই মানুষের হাতিয়ারজনিত ক্রিয়াকলাপ প্রভাব ফেলেছে মানুষের হাতের গঠনের বৈশিষ্ট্যের উপর। পশুদের 'হাতিয়ার' বহুলাংশে আকস্মিক, অর্থাৎ সেসব হাতিয়ারের কাজ আকস্মিক ধরনের, সে কাজ আলাদা প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কোন জিনিস ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরোলেই, সেই একই লাঠি বানরের কাছে তার আচরণের পক্ষে এক ফালতু জিনিসে পরিণত হয়।

মানুষ কিন্তু বিশেষভাবে খুঁজে ফেরে নানা বস্তু, আর তারপর তা থেকে নানা হাতিয়ার বানায়, পরবর্তী কালে ব্যবহারের জন্য সযত্নে তা রক্ষা করে। সেগুলির মধ্যে বুঝি-বা নিত্যকালের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় নানা কাজ নিহিত হয়। পশুরা কোন হাতিয়ার বানায় না, উপস্থিত এই-মুহূর্তের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহৃত নানা হাতিয়ারের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে না। মানুষের মতো তারা কখনই তাদের কাজকর্মের লক্ষ্যবস্তুকে, কাজের উপকরণকে (হাতিয়ারকে) এবং নিজেকে অর্থাৎ সুচিন্তিতভাবে নিজ কাজকর্মের লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বকারী কাজকর্মের কর্তাকে (subject) বিশেষ স্থান দিতে, আলাদা করতে পারে না। অথচ গুচ্ছের আকারে নিজ ক্রিয়াকলাপকে খণ্ড খণ্ড করা, মূল্যায়ন করা, প্রকল্প তৈরি করার ঠিক এই মানবিক ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বের প্রতি খোদ মনুষ্য সম্পর্কের গোটা বিশেষত্ব।

বিশ্বের প্রতি নীতিগত নতুন সম্পর্ক কেন দেখা দিয়েছিল? মানুষ সৃষ্টিতে কী সাহায্য করেছিল? এর উত্তর আছে এঙ্গেলসের এই রাশভারি সংজ্ঞায়। তিনি লিখেছেন, 'শ্রমই স্বয়ং মানুষের সৃষ্টিদাতা।'*

আমাদের পূর্বপুরুষ — সুউন্নত বানরদের জীবনে শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ উদ্ভবে প্রেরণা দিয়েছিল আমাদের বাইরের জগতের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি। এই

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ২০, পৃঃ ৪৮৬ (রুশ সংস্করণ)।

প্রাকৃতিক রদবদলের সূত্রপাত ঘটেছিল সেই ৭ কোটি বছর আগে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ জাতীয় সুপ্রাচীন বানর ড্রায়োপিথেকাস থেকে। মানুষের বিবর্তন চক্রের প্রথমের লগ্নগুলির উন্মেষ ঘটেছিল এক ধরনের কীটভোজী স্তন্যপায়ী পশু — তুপাইডা (Tu-paidae) থেকে। বনজঙ্গল উধাও হওয়া, উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাসের দরুন জীবনযাত্রার ধরন বদলেছিল, সুউন্নত বানররা খুদে পশু শিকার, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলাফেরা শুরু করেছিল, যেহেতু সাভান্না (আফ্রিকার তৃণভূমি) এলাকায় উত্তম দৃষ্টিপাত ও দিকনির্ণয়ের জন্য দেহের উল্লম্ব অবস্থান ছিল অত্যাবশ্যক। সাভান্নায় খাদ্যদ্রব্যের অবস্থান সুবিশাল এলাকাজুড়ে। এমন অবস্থায় একা খাদ্যানুসন্ধান মোটেই সম্ভব নয়। হরেক রকম সঙ্কেতের (খাদ্যের অবস্থান, মাথা গোঁজার ঠাঁই, বিপদ সম্বন্ধে) মোটামুটিভাবে নির্ধারিত এক ব্যবস্থা সহ ছোটখাটো পশুদল দেখা দিতে শুরু করেছিল। শিকারকালে অত্যাবশ্যক পাথর, লাঠিসোটা, পশুর হাড় ব্যবহারের কল্যাণে জৈবিক ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় অধিকতর শ্রেষ্ঠতা দেখা দিতে থাকে।

আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী প্রাক্-মনুষ্য আকার উন্মেষের নিকটবর্তী কালসীমা হল ৫৫ লক্ষ বছর। মানুষের উত্তরণ প্রক্রিয়া ঘটেছে তুষারাবৃত, পর্যায়ক্রমে উষ্ণভবনের পরিস্থিতিতে, যার ফলে পৃথিবীতে গোটা জীব জগৎ অস্তিত্বের অবস্থার প্রবল রদবদল ঘটেছিল (৩৫ লক্ষ বছর থেকে ১০ হাজার বছর

আগে)। আধুনিক ধরনের Homo sapiens মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আনুমানিক মাত্র ৪০-৫০ হাজার বছর আগে।

জীবের ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়া (যার ফলে আধুনিক ধরনের মানুষ দেখা দিয়েছে) হল সুদীর্ঘ ও পরস্পর-বিরোধী। তার অগ্রগতি ঘটেছে সাদামাটা সরল রেখা ধরে নয়। বিবর্তনের বিচারে অধিকতর সম্ভাবনাময় জীবগুলি অন্যান্য, আরও বেশি অনুন্নতদের পাশাপাশি টিকে ছিল, তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। প্রায়ই এই শেষোক্তদের সরাসরি দৈহিক বিনা-শের পথে ক্রমবিবর্তন সোপানে তারা তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছিল। মানুষে পরিণত হবার বিবর্তন প্রক্রিয়ার 'নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির', ইতিমধ্যেই জন্ম-নেওয়া মনুষ্য-ধরনের — যা আরও পরিপক্ব ধরনের মানুষের পথ উন্মুক্ত করেছিল — লক্ষ্যাভিমুখী বিনাশের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে আধুনিক ইংরেজ লেখক ইউ. গোল্ডিং কর্তৃক তাঁর 'উত্তরাধিকারী' কাহিনীতে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সংক্রান্ত শিক্ষায় আজও অনেক বিতর্কীত প্রশ্ন রয়েছে। এগুলির একটি জড়িত হল সেইসব দেহজনিত লক্ষণের সঙ্গে, যেগুলির সাহায্যে মানুষ দেখা-দেবার প্রসঙ্গ বিচার করা চলে : কোন্‌টিকে নির্ধারক বলে গণ্য করা চলে — দু'পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা, আঙুল নাড়াচাড়া, নাকি মস্তিষ্কের আয়তন? অন্যটা জড়িত হল মানুষের 'আদিনিবাস' অনুসন্ধানের সঙ্গে : মানবজাতি

কি এক অঞ্চলে, এক জাতীয় বানর থেকে, নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, নানা ধরনের বানর থেকে দেখা দিয়েছিল, আর এর দ্বারাই কি বর্ণগত তারতম্য নির্ধারিত হয়েছে? এ ব্যাপারেও বিতর্ক চলছে : ১ লক্ষ বছর আগে বসবাসকারী তথাকথিত নিয়ানডার্থাল মানুষই কি মানবজাতির আদি পূর্বপুরুষ, নাকি বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক শাখা মাত্র, মানুষের প্রতিষ্ঠা পর্বে যার কোন প্রভাব ছিল না। এসব প্রশ্নের একার্থক উত্তর দিতে আধুনিক বিজ্ঞান অক্ষম। তবে একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট। মানুষ ও মানবজাতির উদ্ভব — বস্তু বিকাশের এক নিয়মানুগ ফল। মানুষের নানা জৈবিক বৈশিষ্ট্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্বের ও স্বাভাবিক নির্বাচনের জন্য সংগ্রামের নিয়ম তথা জৈবিক বিবর্তনের নিয়ম তার প্রাথমিক গুরুত্ব হারায়। দেখা দেয় বস্তুর গতিবিধির এক নতুন ধরন — সামাজিক, মানুষ বিকাশের জৈবিক নিয়মকানুনের বদল না ঘটালেও, তার বশবর্তী ধরনের। এই সাধারণ তাত্ত্বিক অবস্থানকে পুরোপুরি বোঝার জন্য স্মরণ করা যায় যে, মানুষ এমনকি তার খোদ জৈবিক ধরনের চাহিদাও পশুর থেকে অন্যভাবে মেটায়। একেবারে শুরুতে পোষাক দেখা দিয়েছিল ঝড়-বৃষ্টি-ঠাণ্ডার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য; অথচ ক্রমশ তা এই আদি প্রয়োজনীয়তার বৈপরীত্য ধরনের অসংখ্য কর্মপালন শুরু করেছিল : এ হল যেমন নান্দনিক প্রিয়বস্তু, তেমনই সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক, তেমনই (খ্রীষ্টীয় বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী) আদি

পাপ স্মরণকারী। পোষাকের রকম-সকম বদলায় জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে নয়, বরং ঐতিহাসিক যুগবদলের উপর নির্ভর করে। পরিশেষে, ফ্যাশনের সর্বশক্তিমান কর্মধারা সবকিছু করে যাতে মানুষ তার পোষাক নির্বাচনে পরিচালিত হয় নানা সামাজিক হেতু দ্বারা এবং তার আদি পাপের ব্যাপার ভুলতে চেষ্টা করে।

এই সাধারণ মতাবস্থানকে অস্বীকার করা হলেও একক প্রশ্নের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত এখন আর প্রভেদমূলক নয়। অতীতের মতোই তা আবার বিজ্ঞানীদের দুই শিবিরে বিভক্ত করে — বস্তুবাদী এবং ভাববাদী, তা সে মানুষ সৃষ্টির বস্তুবাদী ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি চিত্রের যতই সঠিক সংজ্ঞা উত্থাপন করা হোক না কোন। বস্তুবাদী ধারণার নানা বিপরীত মতবাদের অন্যতম হল তথাকথিত **সমাপ্তিবাদ** (**লাতিন** Finis শব্দ থেকে — সমাপ্তি, চূড়ান্ত লক্ষ্য)। প্রাকৃতিক বিকাশের সর্বোচ্চ লক্ষ্য রূপে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে কোন এক 'প্রচেষ্টা' বুঝি-বা প্রকৃতিতে নিহিত আছে, যে লক্ষ্যই বিশ্বজনীন আত্মিক সূচনাকে নির্ধারণ করে। প্রসঙ্গত আধুনিক ফরাসী বিজ্ঞানী ও ধর্মবিদ প. টেইয়ার দ্য শার্দেঁ লিখেছেন, 'জগতে অবস্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য আমার বস্তুকে বাহ্যিক পরিবেষ্টনকে রূপদান, আত্মার শক্তিকে কল্পনা করার..., বিবর্তনকে গতিবিধি, সর্বোচ্চ শিখর ও সমালোচনামূলক বিন্দু প্রদানের এবং পরিশেষে সবকিছুকে শূণ্যে নিয়ে

আসার প্রয়োজন হয়েছিল।'*

ইদানীং গণচেতনায় এই ধারণা প্রসারলাভ করেছে যে, জীবন, বিশেষত, যুক্তিযুক্ত জীবন পৃথিবীতে এসেছে মহাকাশ থেকে। কাল্পনিক ধরনের নানা রচনা থেকে গণচেতনায় ঘুরে-ফেরা এই ধারণা তার নিরীহ ভাবটি খোয়াচ্ছে। মানুষ তার সমালোচনাহীন রোজকার চেতনার দর্পণে পশুর আকার ধারণ করছে, রূপকার্থে যে কিনা উল্লম্ব অবস্থান টিকিয়ে রাখতে সক্ষম, যদি শুধু সে নিত্য 'উপরের' দিকে দৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টা চালায়। অতীতে সে শুধু সেখানে, উপরে মহাপরাক্রমশালী ও কঠোর ঈশ্বরকে দেখে থাকলে, হালে তার সৃষ্টিকর্তার স্থান দখল করেছে তদানুরূপ মহাপরাক্রমশালী 'মহাকাশের নানা আগন্তুক'। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অচিরাচরিত মোড়কে মোড়ানো গণচেতনায় প্রবেশ করছে **সৃষ্টিতত্ত্বের** (জগৎ মানুষ ও ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার তত্ত্ব) বহুকালের চিরাচরিত ধারণা। অবশ্য অস্ট্রিয়ার পরিচালক এরিখ দেনিকেনের চলচ্চিত্র 'ভবিষ্যতের স্মৃতিচারণ' থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের ধর্মীয় ধারণা পর্যন্ত ব্যবধান যথেষ্ট। তবে মানুষ উৎপত্তির ও বিকাশের নানা অবজেকটিভ পটভূমির ব্যাপারে জ্ঞান রহস্যময় নানা অনুমান দ্বারা মানবজাতি বিকাশের শূন্যস্থানগুলি 'পূরণের' ছলনাজনক প্রচেষ্টা এড়ানোয় সাহায্য

---

* পিয়ের টেইয়ার দ্য শার্দেঁ। প্রসঙ্গ-মানুষ। মস্কো, নাউকা প্রকাশন, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৭ (রুশ সংস্করণ)।

করে, যেসব অনুমান মানবজাতিকে নিজস্ব ভাগ্য, নিজস্ব ইতিহাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, বঞ্চিত করে শুধু তার অতীত থেকেই নয়, এমনকি ভবিষ্যতের ব্যাপারে দায়িত্ব থেকেও।

মানুষের বিকাশপর্ব সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। তবে মানুষের কী কী বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল? তার নানা দেহজনিত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে — সোজা হয়ে চলা, কণ্ঠনালীর গঠন, মস্তিষ্কের আয়তন, হাতের গঠন, নাকি চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা, নিজের মতো নানা লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্টি লাভের কথা? এঙ্গেলস যখন তাঁর ধ্রুপদী উক্তি 'শ্রমই মানুষের সৃষ্টিকর্তা' ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের বিকাশ — একই সময়ে যেমন তার জৈবিক প্রকৃতি, তেমনই সামাজিক সারবস্তুরও বিকাশ। এ হল একই প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংযুক্ত ও পারস্পরিক নির্ভরশীল দুই দিক।

একদিকে, সোজা হয়ে চলার ব্যাপারে প্রাকৃতিক পরিস্থিতিই প্রেরণা জুগিয়েছে, হাতের উন্নতির ও তার গঠন পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে — সোজা হয়ে চলার কল্যাণে মানুষের জীবনে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। একদিকে, শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের অঙ্কুর মানুষের কথা বলতে শুরু করায় সাহায্য করেছে, অন্যদিকে — এই কথা বলার ফলে বিমূর্ত চিন্তাধারা বিকাশলাভ

করেছে, মস্তিষ্কের গঠন-কাঠামোর পূর্ণতর রূপদান, ইত্যাদিতে সহায়তাদান করেছে।

শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে বললে, এ হল মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ার বিশেষ এক ধরন। মার্কস লিখেছেন, 'শ্রম সর্বাগ্রে হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘটমান এক প্রক্রিয়া, এমন এক প্রক্রিয়া, যাতে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিজের ও প্রকৃতির মধ্যে নানা বস্তুর লেনদেন প্রয়োগ করে, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে।'* অতএব, শ্রম হল মানুষের এক **লক্ষ্যাভিমুখী** ক্রিয়াকলাপ, যা পরিচালিত হয় প্রকৃতির পুনর্গঠনের উদ্দেশে, নিজের নানা চাহিদাপূরণে তাকে উপযোগী করে তোলার উদ্দেশে। নানা লক্ষ্যার্জন সম্ভব শুধু শ্রমের বিভিন্ন **হাতিয়ারের সাহায্যে**, যৌথ, **মিলিত** কাজকর্মের দ্বারা। পশুর যেকোন, সবচেয়ে জটিল কাজের থেকে পার্থক্যস্বরূপ আছে মানুষের শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের এই তিন বৈশিষ্ট্য। নীতিগত এই পার্থক্যটি উত্তম দৃষ্টিগোচর সাধারণ এই দৃষ্টান্তে — আদিম মানুষের যূথবদ্ধ শিকার গড়ার ঘটনা। শিকারে প্রত্যেক অংশগ্রাহীর তৎপরতার কারণ সর্বাগ্রে অবশ্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। তবে শিকারে — জটিল এই যৌথ ক্রিয়াকলাপে — অংশগ্রাহীর যে-যার কাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন তাড়া দেবার ভূমিকা নেয় — তার কাজ পশুকে

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ২৩, পৃঃ ১৮৮ (রুশ সংস্করণ)।

ভয় দেখান এবং তাকে ফাঁদের দিকে নিয়ে যাওয়া। এর দ্বারাই তার সক্রিয় যোগদানের সমাপ্তি ঘটে। তার এই কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল কোনমতেই তার খিদে মেটায় না, উপরন্তু সে দেখে পশুটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে এবং সে তাকে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সুতরাং জটিল এই যৌথ কাজে শুধুমাত্র একটি অবস্থানের অধিকারী উক্ত তাড়া-দেওয়া লোকের ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষাকৃতভাবে স্বাধীন তাৎপর্য লাভ করে। সাফল্যজনক শিকারে খিদে মেটার অনুভূতি নির্ধারিত হবে আলোচ্য শিকারীদলের সদস্যদের মধ্যকার যোগাযোগ দ্বারা, কখনই খাদ্যের ব্যাপারে সাদামাটা জৈবিক চাহিদা দ্বারা নয়। মানবপালের প্রত্যেক সদস্য সাময়িকভাবে বুঝি-বা নিজেদের স্বাভাবিক চাহিদার কথা 'ভুলে যায়', যাতে কিনা নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সাবর্জনীন কাজে সাফল্যে সহায়তাদান করা যায়। তবে এর জন্য তার প্রয়োজন হল জটিল এই ক্রিয়াকলাপের সব ক্ষেত্রের ব্যাপারে ধারণা থাকার, তার চূড়ান্ত ফল, ইত্যাদির ব্যাপারে জ্ঞান থাকার, দলের লক্ষ্যের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য তুলনা করতে পারার, পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র জানা থাকার, শিকারের প্রত্যেক অংশগ্রাহীর তাতে স্থানের ব্যাপারে ধারণা থাকার, স্থানীয় এলাকা, উদ্ভিদ ও জীব জগতের ব্যাপারে অবজেকটিভ জ্ঞান থাকার। অন্যকথায়, নিত্য বদলানো পরিস্থিতির নানা অবজেকটিভ বৈশিষ্ট্যকে তার অনুধাবন করতে পারা চাই। এ ব্যাপারে পশুদের আচরণ অন্য রকমের।

তাদের বাইরের ‘লক্ষ্যাভিমুখী’, ‘যুক্তিযুক্ত’ কাজকর্ম প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ‘যুক্তিহীন’। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাকড়সা তার জাল নড়া থেকে সঙ্কেত পায় যে, শিকার ধরা পড়েছে এবং তড়িঘড়ি ছুটে যায় তার দিকে। কিন্তু কৃত্রিমভাবে কম্পন সৃষ্টি করা হলেও সে তৎক্ষণাৎ এই সঙ্কেতে সাড়া দেয়, এমনকি জালে কেউ ধরা না পড়লেও।

নিজের নানা চাহিদাপূরণের তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা অস্বীকার করার ঠিক এই ক্ষমতাই, উত্থাপিত লক্ষ্যার্জনের উদ্দেশে পরিচালিত জটিল পথের ব্যাপারে চেতনা, মানুষের উপর অ-নির্ভরশীল পরিস্থিতির ব্যাপারে চেতনাই মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপে মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত উপকরণের প্রতি তার নজর আরও প্রসারিত হচ্ছে। আগে যা তার কাছে অত্যাবশ্যক লক্ষ্য (দৈহিক চাহিদাপূরণ) বলে মনে হত, সময় সময় তা দ্বিতীয় সারিতে স্থানলাভ করছে। এখানে স্কুলছাত্রদের তুলনা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। ভূতপূর্ব জনৈক ছাত্রের প্রথম প্রথম একমাত্র লক্ষ্য ছিল উত্তম ফলের পেছনে ছোটা; হঠাৎ সে লক্ষ্য করতে শুরু করল যে, তা অর্জনের উপায়ের ব্যাপারে আকর্ষণবোধ করছে। সে আত্মচেতনা উপলব্ধি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। ঠিক সেভাবেই মানবজাতি শ্রমের সাহায্যে ঠাণ্ডা ও খিদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় ক্রমশ এ বুঝতে শুরু করল যে, সময় সময় অত্যাবশ্যক ছাড়া বাঁচা চলে,

তবে 'অতিরিক্ত' ছাড়া চলে না। উপায় ছেড়ে শ্রম লক্ষ্যে পরিণত হতে লাগল, যেহেতু শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ খোদ মানবিক দাবিদাওয়ার এক নতুন চক্র গড়তে শুরু করে — চেতনাবোধে, মেলামেশায়, সৃজনকর্মে। কিন্তু অতি আদিম মেহনতী কাজকর্মে নিহিত মানুষের বিকাশ সম্ভাবনা এবং মানুষের সব সম্ভাবনার প্রকৃত সদ্ব্যবহার, কোন কোন ব্যক্তিত্ব দ্বারা 'মানবিক আদর্শ' অর্জনের মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল। মানুষের নিজের ব্যাপারে পথের মূল পর্বগুলির ব্যাপারে আসুন দৃষ্টিপাত করা যাক।

বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার কল্যাণে এক নতুন জৈবিক আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, অন্য সব জীবের থেকে যার পার্থক্য বিদ্যমান, আর চেহারার তারতম্যজনিত নানা লক্ষণ ছাড়াও রয়েছে জৈবিকভাবে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধির প্রায় ষোলআনা অনুপস্থিতি।

'বাঘ চমৎকার জানে কীভাবে বাঘ থাকতে হবে, — লিখেছেন আ. পেচ্চেই, — মাকড়সা থাকে ঠিক মাকড়সার মতোই। সোয়লো পাখি সেই অভ্যেসই রপ্ত করে, যা সে করতে পারে। আর শুধু মানুষেরই মানুষ হবার শিক্ষালাভ করা দরকার।'*

ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে নিজস্ব বিকাশ প্রক্রিয়ায় (ব্যষ্টিজনি), যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় তার ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়া জাতিজনি।

---

* দ্রঃ আ. পেচ্চেই। মানবিক গুণাগুণ। মস্কো, প্রগতি, ১৯৮৫, পৃঃ ১১৮ (রুশ সংস্করণ)।

মানুষের সারবস্তু নির্ধারক নানা সম্পর্ক সর্বকাল ও সর্বজাতির জন্য একেবারে চূড়ান্ত আকারে প্রদত্ত হয় নি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ বলতে ছিল দলবদ্ধতা ও সমতার সম্পর্ক, প্রভু ও দাস সম্পর্ক, নানা বস্তুর মাধ্যমে প্রদত্ত ও সরাসরি ব্যক্তিগত নির্ভরশীল সম্পর্ক, ইত্যাদি। **ইতিহাসবাদ** — এ হল মানবসমাজ ছাড়াও স্বয়ং মানুষ চর্চারও অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত। নিত্য পরিবর্তনশীল সামাজিক জগতে প্রকৃতির প্রতি, অন্যান্য লোকের প্রতি, নিজের প্রতিও মানুষের সম্পর্ক বদলাচ্ছে, তার নানা অনুমান, ভাবাদর্শ, জগতের ব্যাপারে চেতনাবোধ ও পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও পাল্টাচ্ছে।

তবে মানুষ সম্বন্ধে মার্কসীয় উপলব্ধি চলতি-ব্যাপার, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের চরিত্র বদলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জরুরী হল পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মানুষের সম্পর্ক বদলের অবজেকটিভ **নিয়মগুলি** বোঝা, মানুষের আত্মিক জগৎ গঠনের ও বিকাশের বৈষয়িক ভিত্তি নির্ণয় করা। মানুষ উপলব্ধিতে ইতিহাসবাদ হল সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতি ঐতিহাসিক-বৈষয়িক পন্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পরিশেষে, একক ব্যক্তি — মানুষ — ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের উপলব্ধিতেও মার্কসীয় ইতিহাসবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জৈবিক দিক থেকে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধির অনুপস্থিতির দরুন একক ব্যক্তি কর্তৃক

নিজ সামাজিক সারবস্তু রপ্ত করার জন্য শুধু **সম্ভাবনাই**, সামাজিক সম্পর্কের সমৃদ্ধ জগতে তার অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনাই উন্মুক্ত হয়। এমন নানা ঘটনা সুবিদিত, যখন একক কোন ব্যক্তি সমাজ থেকে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে শুধু এক এক জৈবিক প্রকারভেদ রূপেই মানুষ থেকে গেছিল। দুই ভারতীয় মেয়ে অমলা ও কমলা তাদের জীবনের প্রথমের বছরগুলি পশু পরিবৃত অবস্থায় কাটানোর ফলে এমনকি মানুষের মতো হাঁটতেও পারত না ; তারা কনুই ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলাফেরা করত, আর অবশ্যই তাদের মধ্যে অন্যান্য, পুরোপুরি মানবিক গুণাগুণও অনুপস্থিত ছিল, যেমন, কথা বলা ও চিন্তা করার ক্ষমতা। সুতরাং, জঙ্গলে পশুদের মধ্যে বাস করে মানুষ হয়ে ওঠা এবং লোকেদের কাছে চলে আসা মাউলি চরিত্র বাস্তবে যা ঘটে, তার সরাসরি বিপরীত ব্যাপার।

অতএব, একক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হবার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল তার **সমাজীভবন** প্রক্রিয়া, অর্থাৎ, নানা সামাজিক মাত্রা, আচরণবিধি, আচারপ্রথা রপ্ত করা। তবে সমাজ প্রদত্ত নানা মাত্রা রপ্ত করা ব্যক্তিত্ব দেখা দেবার আবশ্যিক হলেও যথেষ্ট পূর্বশর্ত নয়। ব্যক্তিত্ব — অতি অবশ্যই এক ধরনের সুস্থায়ী অখণ্ড সত্তা ; নানা লক্ষ্য ও চাহিদার এক ব্যবস্থা। অন্যকথায়, নানা মাত্রা, নিয়ম, আচার-প্রথাকে একক কোন ব্যক্তির 'রপ্ত' করা, তার অন্তরের গুণাবলীর অধিকারীতে পরিণত হওয়া,

সামাজিক জীবনে সুনির্দিষ্ট প্রভাব ফেলা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্বনির্ভরতা প্রকাশ করা, সেকেলে নানা সামাজিক মাত্রা, ঐতিহ্য বিনাশ করতে এবং নতুন সৃষ্টি করতে পারা চাই ও উচিত। তবে ব্যক্তিত্ব আবির্ভাবের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় সমাজ বিকাশের শুধু সুনির্দিষ্ট পর্বে। ব্যক্তিত্ব — এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। 'ইতিহাসের যত বেশি গভীরে আমরা ফিরে যাব, — মার্কস লিখেছেন, — ততই বেশি হারে একক ব্যক্তি, আর সুতরাং উৎপাদনকারী একক ব্যক্তিও পরাধীন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যে হল আরও বেশি সুবিস্তীর্ণ এক অখণ্ডতার অন্তর্ভুক্ত...।'*

একক ব্যক্তির এই 'পরাধীনতা', অথবা অন্যকথায়, 'ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার সম্পর্ক' (অন্য লোকের ওপর, বংশ, সম্প্রদায়, পরিবার, ইত্যাদির ওপর) বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হলেও তা ছিল সমস্ত প্রাক্-পুঁজিবাদী গঠন-কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যস্বরূপ।** তাই ব্যক্তিত্ব গড়ে-ওঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ পূর্বশর্ত রূপে ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার সমস্ত ধরন থেকে একক ব্যক্তির ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ, তার স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান হারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪৬, অংশ ১, পৃঃ ১৮ (রুশ সংস্করণ)।

** ঐ, পৃঃ ১০০-১০১।

২। 'আমরা' এবং 'ওরা'

মানবজাতির ইতিহাসের ঊষালগ্নে, আদিম গোষ্ঠী সমাজে ব্যক্তি বিশেষের পরনির্ভরতার কারণ কী ছিল? একান্ত সংক্ষিপ্তাকারে বলা চলে যে, সে পর্যায়ে ব্যক্তি বিশেষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের সারবস্তু নিহিত ছিল যূথবদ্ধ দলের সঙ্গে এবং নিজ উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের নানা অবজেকটিভ পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের একাকার অবস্থার মধ্যে। ব্যক্তি বিশেষ ও সমাজের মধ্যে এমন একতার ভিত্তি হল সর্বাগ্রে উৎপাদন উপকরণসমূহে সামাজিক মালিকানা। তবে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমাজে— যেখানে সামাজিক মালিকানাই হল মালিকানার প্রভুত্বকারী ধরন— ব্যক্তি বিশেষ ও সমাজের মধ্যে ষোলআনা সমরূপের কথা বলা বোকামির পরিচায়ক। বরং উল্টো; সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া, তার বিকাশ কোন ব্যক্তিত্বের— যে 'স্রোতের বিপরীতে' যেতে ভয় পায় না— সক্রিয়, স্বাধীন কাজকর্ম বিনা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব, আদিম সমাজে ব্যক্তি বিশেষ যেসব পরিস্থিতিতে বসবাস ও কাজকর্ম করত, তার সমগ্র জটিল সমাহারকে বোঝার জন্য উৎপাদন উপকরণসমূহে সামাজিক মালিকানার সাদামাটা উল্লেখই যথেষ্ট নয়। ব্যাখ্যা করা দরকার, কীভাবে ও কোন্ কোন্ আকারে সামাজিক মালিকানা বাস্তবে রূপলাভ করত, গোষ্ঠীর সব লোকের মালিকানাধীন খোদ উৎপাদন উপকরণগুলি কেমন ছিল।

আদিম শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের নানা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সাধারণত মানুষের রোজকার কাজের সীমিত অবস্থার, উৎপাদনী শক্তি বিকাশের অতি নিম্ন হারের কথা বলা হয়। সুবিদিত যে, উৎপাদনী শক্তি — এ হল মানুষের তৈরি উৎপাদন উপকরণসমূহ এবং স্বয়ং মানুষ, যার আছে শ্রমের অভ্যেস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, যে নানা লক্ষ্য উত্থাপন এবং সেগুলি অর্জনের জন্য যথাসঙ্গত নানা উপকরণ খুঁজে পেতে সক্ষম। শ্রমের জন্য জিনিসপত্র উৎপাদনের আধুনিক অংশগ্রাহীর পক্ষে সাধারণত সেইসব জিনিসের প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক আকার খোয়ালেও আদিম সমাজের মানুষের কাছে তা ছিল খোদ প্রকৃতিরই অঙ্গ — সাদামাটা পাথর, হাড়, কাঠ, পশুচর্ম। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে তখনও 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' — বহু প্রজন্মের শ্রমের ফল — মাথা তোলে নি, যা গঠিত ঘরবাড়ি, গরম পোষাক, আরামপ্রদ রাস্তাঘাট নিয়ে, সময় সময় যা 'কুমারী' প্রকৃতি থেকে আধুনিক মানুষকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে।

আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতিতে নিমজ্জিত, তখনও ছিল তার প্রত্যক্ষ অঙ্গ, তার সঙ্গে নিজ আত্মীয়তা সে নিত্য অনুভব করত, খোদ নিজের তখনও এ বোধ ছিল না যে তার অবস্থান প্রকৃতির বিপরীতে, সে প্রকৃতির শুধু উপযোগীই হয়ে উঠতে পারে না, বরং তাকে নিজের উপযোগী করতে সক্ষম, আর তাও নিজ ক্ষমতা বজায় রেখে, সঞ্চয় করে ও বিকাশ ঘটিয়ে। প্রথমের দিকে তার শ্রমজনিত

ক্রিয়াকলাপকে অভিহিত করা চলে 'রপ্তকরণ' রূপে, উৎপাদনী রূপে নয়। মানুষ তা রপ্ত করত (অবশ্যই, মোটামুটিভাবে মানবিক পদ্ধতি দ্বারা), খোদ প্রকৃতি যা 'উৎপাদন করত', আর করত শিকার করে, সংগ্রহবৃত্তি দ্বারা, মাছ ধরে, গুদামঘর, খাদ্যদ্রব্যের গোলাবাড়ি তৈরি করে। শুধু পরবর্তী কালেই সে পশুপালন, আর তারপর জমিচাষ করতে শুরু করে। চারদিক থেকে তাকে ঘেরা প্রাকৃতিক বিপদ-আপদের মোকাবিলা মানুষ কীভাবে করত? মনে হয়, সেই তৎপরতা, আঁচ পাওয়া, দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করাই যথেস্ট হয়, প্রচন্ড 'ঝামেলায়' পড়া অধিকাংশ লোকের মনেই যা জেগে ওঠে! হতে পারে যে, আধুনিক মানুষকে পান্ডব-বর্জিত কোন এক দ্বীপে গিয়ে পড়া এক ধরনের রবিনসন ক্রুসোর সমতুল্য রূপে উত্থাপন করা — সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যার এক আদর্শ চিত্র, যাতে বসবাস করত আদিম সমাজের মানুষ। তবে আধুনিক মানুষ — ধরা যাক্ সে সাময়িকভাবে নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন — শেষ পর্যন্ত কোন না কোন হারে সে সমাজের নিত্য ধারক ও বাহক : সৌরজগৎ বিকাশের নিয়মকানুনের ব্যাপারে, অবিচল কারণ-পরিণাম যোগাযোগের ব্যাপারে তার আশাভরসা আছে। সে চমৎকার বোঝে যে, অতি সরল মায়া দ্বারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের রদবদল সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা চারিপাশের জগৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার ব্যাপারে চেতনাসম্পন্ন ; অত্যাবশ্যক থেকে

আকস্মিককে, গৌণ থেকে মুখ্যকে আলাদা করতে পারে। পরিশেষে, যেকোন আধুনিক মানুষ ভূগোল, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ব্যাপারে আশায় ভরা, বস্তুজনিত কাজকর্মে অভ্যস্ত ; তুলনা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, সমতুল্য, যুক্তি, প্রমাণ, অনুমান ও খণ্ডন করার বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী। অন্যকথায়, মানবজাতির বহুযুগের স্মৃতিশক্তিতে সমৃদ্ধ আধুনিক মানুষ আদিম সমাজের মানুষের থেকে কিসের দ্বারা যেন অপরিসীম হারে আরও বেশি নির্ভরযোগ্যভাবে সুসজ্জিত, নানা বিমূর্ত অবস্থা, ইত্যাদি সৃষ্টিতে তখন অক্ষম সেই আদিম মানুষের অবস্থান ছিল বিশ্বের নিয়মকানুন অনুধাবন থেকে বহু দূর। তবে জটিল বাস্তব অবস্থায় পড়ে আধুনিক মানুষ সক্রিয় তৎপরতার গতি রুদ্ধকারী হ্যামলেট জাতীয় সেই বিজ্ঞ মন্থরতা। অথবা, উল্টো, খামখেয়ালি কাজকর্মে উৎসাহ-দেওয়া বিচারবুদ্ধিহীনতা, অথবা অনুচিত অনুভূতিশীলতা প্রদর্শন করতে পারে। আত্মিক জীবনের এই সব রূপভেদেরও অবস্থান মানবজাতির স্মৃতিতে। আধুনিক সমাজ নানা চরিত্র, প্রতিভা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের গোটা এক গ্যালারি সৃষ্টি করছে। আমাদের প্রস্তাবিত নানা পরিস্থিতিতে এর পূর্বানুমান করা একান্ত কষ্টকর, এই বা সেই ব্যক্তি কেমন আচরণ করবে।

তবে মানবজাতির বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার অন্যতম এক বিজয়স্বরূপ এমন বহুরূপী আচরণবিধি (পদ্ধতি) ৫০ থেকে ১০ হাজার বছর আগে বসবাসকারী

মানুষের পক্ষে ছিল মৃত্যুসম। আদিম মানুষ তার পারিপার্শ্বিক শত্রুভাবাপন্ন জগতের বিরুদ্ধে একমাত্র যা দিয়ে রুখতে পারত, তা হল এই : আদিম গোষ্ঠীর সব মানুষের সর্বাধিক সংহতি ভিত্তিক সামাজিক জীবনের বিশেষ সংগঠন পদ্ধতি, যার মূলকথা সমাজের সব মানুষের জন্য একক মাত্রার উপস্থিতি, গোষ্ঠীর প্রত্যেক লোকের জন্য বিশদভাবে নির্ধারিত আচরণবিধি আর থাকা দরকার ব্যক্তি বিশেষ ও বংশের মধ্যে পরিপূর্ণ মিল। এমন সমাজ নানা অধিকার ও দায়িত্বে বিভক্ত নয়, এমন কোন কাজকর্মও নেই, ব্যক্তি বিশেষ যা করে সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত (অবসর), 'ব্যক্তিগত' সময়ে। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সে শোনায় নিজ উপজাতির কথা, যেহেতু নিজের জীবন ও নিজ গোষ্ঠীর জীবনের মধ্যে কোন প্রাচীর খাড়া করে না। নিজের কাজের জন্য ব্যক্তিগত কোন দায়িত্বও নেই। গোষ্ঠীর কোন লোক দ্বারা বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন করা, কোন এক শিকারীর ব্যর্থতা অথবা কোন এক নারীর গর্ভধারণে অক্ষমতা — এসব কোন ব্যক্তিগত ত্রুটি নয়, এর দায়িত্ব বর্তায় গোষ্ঠীর সব লোকের উপর, যারা অভ্যন্তরীণ বন্ধন দ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে আদিম ব্যক্তি বিশেষ নিজ গোষ্ঠীর লোকজনের যত বেশি ঘনিষ্ঠ, তেমনই অন্যান্য লোকেদের থেকে দূরত্বও তত বেশি। 'যেমন অন্য উপজাতির ব্যাপারে, তেমনই খোদ নিজের ব্যাপারেও মানুষের পক্ষে উপজাতি

এক সীমারেখা রূপে রয়ে গেছিল...। এ যুগের লোকেরা আমাদের চোখে যতই শ্রদ্ধাভাজন লাগুক না কেন, তাদের মধ্যে কোন নিঃসঙ্গতা ছিল না, মার্কসের উক্তি অনুযায়ী, তারা এখনও আদিম গোষ্ঠীর নাভিছিন্ন নয়।'*

আদিম ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে পরিপূর্ণ অর্থে মানুষ শব্দ বলতে বোঝায় তার সহউপজাতিক লোককে। লোকজন — এ হল নিজ বংশ, গোষ্ঠী, উপজাতির সদস্য। বহু উপজাতির নাম অনুবাদ করলে হয় 'লোকজন'। যারা আলোচ্য বংশের, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা হল 'ওরা', ভিনদেশী, লোক-নয়। 'ভিনদেশীদের' বাস অন্য জগতে, তাদের সঙ্গে যা ঘটতে পারে, প্রকৃত 'লোকজনের' সঙ্গে তা ঘটা সম্ভব নয়। যেমন নাইজেরিয়ার অন্যতম এক উপজাতির প্রতিনিধিরা মনে করত, তাদের প্রতিবেশীরা হল ভিন্ন উপজাতির লোক — রাতে তারা ঘুমোয় নদনদীর তলদেশে, মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়। সুবিদিত যে, আদিম গোষ্ঠী — এক জটিল গঠন-ব্যবস্থা। ছোট ছোট গোষ্ঠী মিলিত হত গোত্রে (clan), গোত্র — উপজাতিতে। স্বভাবতই, সবচেয়ে নিবিড় যোগাযোগ থাকে গোষ্ঠীতে। পুরাকালের ধারণা অনুসারে গোষ্টী ছিল বুঝি-বা জগতের

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ২১, পৃঃ৯৯ (রুশ সংস্করণ)।

কেন্দ্রবিন্দু ; গোষ্ঠীর সঙ্গে সহউপজাতিক লোকের যোগাযোগ যত দুর্বল, তার সামাজিক মূল্যও তত কম। তাকে তখনও মানুষ বলে স্বীকার করা হয়, তবে বুঝি-বা নিচের মহলের। গোষ্ঠীর সঙ্গে, সামাজিক গ্রুপের সঙ্গে লোকেদের যোগাযোগ যত ক্ষীণ, তাদেরকে তত বেশি অপরিপূর্ণ রূপে গণ্য করা হয়।

নিজ গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ অনুভব করে আদিম ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে মানবজাতির প্রতি নিজ বন্ধনের ব্যাপারে চেতনালাভ করে না, অনুভব করে না যে, 'আমরা' এবং 'ওরা' — অখন্ড এক সত্তা। এটাই হল কোন এক স্থানীয় মানব গোষ্ঠীর উপর ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার প্রকাশ। ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতার হাত থেকে ক্রমিক মুক্তি প্রক্রিয়া এবং আরও বড় এক সামাজিক অখন্ডতার সঙ্গে নিজ বন্ধনের ব্যাপারে চেতনালাভ — এ দুই প্রক্রিয়া চলে পাশাপাশি।

মানুষের অখন্ডতা 'তার' জগতের সঙ্গে, 'তার' লোকজনের সঙ্গে আরও প্রকাশিত হয় এতে যে, নিজ পূর্বপুরুষদের — পিতামাতা থেকে সুদূর, প্রায়ই উপজাতির কল্পিত মোড়ল পর্যন্ত — সুদীর্ঘ সারিতে নিজেকে মূলকেন্দ্র বলে অনুভব করে।এই ধরনের আদিম 'ইতিহাস তত্ত্ব' আসলে পুরোপুরি ইতিহাসবিরোধী তত্ত্ব। অতীতের কথা, নিজের সুদূর পূর্বপুরুষদের কথা আদিম মানুষের শুধু স্মৃতিতেই রয়ে যায় না। অতীতে বসবাসকারীদের সে বর্তমান জীবনে

নিজের থেকে আলাদা করে না। তাদের সঙ্গে সে শুধু নিজের সদৃশ্যতা খুঁজে পায়, তাদের উপস্থিতি নিত্য অনুভব করে, অতি অবশ্যই সেই একই কাজকর্ম করে, যা করত তার পূর্বপুরুষরা। উল্লিখিত সবকিছুর এক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় বাইবেলের পুরানো নিয়মে (The Old Testament) : যেখানে বলা হয়েছে : 'যা ছিল, তা-ই হবে ; যা ঘটেছিল, তা-ই ঘটবে, এবং সূর্যদেবের চরনতলে নতুন বলে কিছুই নেই। এমন কিছু ঘটে, যা সম্বন্ধে বলা হয় : 'দেখ্, এটা নতুন বটে', কিন্তু আমাদের আগে যুগ যুগ ধরে তার অস্তিত্ব ছিল।'* বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল জার্মান লেখক টমাস মান বাইবেলের পুরানো নিয়ম বিষয়বস্তু ভিত্তিক তাঁর 'যোসেফ এবং তাঁর ভ্রাতৃগণ ' উপন্যাসে সেকেলে চেতনার এই বৈশিষ্ট্য এভাবে উন্মুক্ত করেছেন : '...বৃদ্ধের 'আমি'র যথেষ্ট স্পষ্ট কোন সীমারেখা ছিল না, — বাইবেলের অন্যতম এক চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, — ছিল বুঝি-বা পিছন থেকে উন্মুক্ত, গিয়ে মিলেছিল অতীতের সঙ্গে, যা পড়েছিল তার ব্যক্তিত্ববোধের গন্ডির বাইরে, এবং আকণ্ঠ শুষে নিয়েছিল সেইসব যাতনা, যার স্মরণ ও পুনঃস্থাপন করা উচিত ছিল, বস্তুত, সবকিছুকে সূর্যালোকে নিরীক্ষণ করা হলে, প্রথম পুরুষের

---

* বাইবেল। মস্কো পাত্রিয়ার্ক প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩, পৃঃ ৬১৮, অনুচ্ছেদ ১,৯, ১০ (রুশ সংস্করণ)।

নয়, বরং তৃতীয় পুরুষের আকারে।'*

আদিম ব্যক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত শুধু গোষ্ঠীর সঙ্গেই নয়, বরং উৎপাদনের নানা অবজেকটিভ পরিস্থিতি, তার চারপাশের প্রকৃতি, যাতে সে চাষবাস করে এবং যাতে তার কুটির দাঁড়িয়ে আছে সেই জমি, অরণ্য, পর্বতমালা, পশুপাখি, ইত্যাদির সঙ্গেও। আদিম গোষ্ঠী মালিকানা অনুযায়ী নিজ ক্রিয়াকলাপ শর্তাদির ব্যাপারে প্রত্যেক লোকের সম্পর্ক শুধু এই ধরনের নয় যে, 'আমি' কিসের মালিক, বরং নিজ জগতের একপাশের এক অংশ রূপে, খোদ নিজেরই এক অংশ রূপে। আদিম মানুষের কাছে 'আমরা' বলতে শুধু লোকজনই বোঝাত না, বরং বোঝাত জমি, পশুপাখি, অরণ্য আর নদনদীকেও। তাই নিজ গোষ্ঠীর জমিতে ভিনদেশীর এমনকি উপস্থিতিও — আদিম মানুষের চিন্তাধারার যুক্তি অনুসারে — ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, মানুষ ও প্রাকৃতিক শক্তি, 'তার' জগতের মধ্যকার সংযোগের কাজকে তা দুর্বল করতে পারে। নদী পারাপারকালে অস্ট্রেলিয়ার জনৈক আদিবাসী কারুমারি নদীর আত্মার কাছে প্রার্থনা করছে: 'আমায় ছুঁস না! আমি এ দেশেরই লোক!' মাটির সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের নিত্য অনুভূতি প্রকাশলাভ করত, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এর দ্বারা যে, পূর্ব আফ্রিকার

---

* টমাস মান। যোসেফ এবং তাঁর ভ্রাতৃগণ। মস্কো, ১৯৬৮, খঃ ১, পৃঃ ১৩৪ (রুশ সংস্করণ)।

মাসাই জাতির লোকেরা মাটিতে বল্লম বিদ্ধ করা এড়িয়ে চলত, যাতে তাতে কোন আঘাত না লাগে। বাড়ির জন্য প্রাণকাঁদা, আপন জমিতে অতি অবশ্যই সমাধিলাভের প্রচেষ্টা — আধুনিক মানুষের কাছেও এসবের অস্তিত্ব রয়েছে, তবে আদিম গোষ্ঠীর লোকের কাছে এ শুধু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতীতকে স্মরণ করাই নয়; এ হল ব্যক্তি বিশেষের খোদ অস্তিত্বের আবশ্যিক শর্ত।

প্রথম দৃষ্টিতে, এই ধরনের নানা বিষয়বস্তু তথা মাটি ও অরণ্যরাজি, নদনদী ও পর্বতমালার সঙ্গে আত্মিক বন্ধন — আধুনিক মানুষের কাছেও ইপ্সিত, তবে ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরের আদর্শ, যে-মানুষ আজ প্রকৃতি থেকে, এ ধরনের অস্তিত্ব থেকে সম্পর্ক-ছিন্ন। সভ্য-জগৎ ছেড়ে দূরে চলে যাওয়ার, এমন এক সমাজ গড়ার আহ্বান — যার লোকজনরা থাকবে প্রকৃতি ও খোদ নিজের সঙ্গে সুসমঞ্জস অবস্থায় — আধুনিক পশ্চিমের সংস্কৃতিতে খুবই জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক দশকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মকরণের আদর্শ পশ্চিমের কিছুসংখ্যক তত্ত্ববিদের চেতনায় রূপলাভ করেছে স্বর্গোদ্যান তথা ইডেন উদ্যান সংক্রান্ত বাইবেলীয় উপকথার প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা, যেখানে মানুষ বসবাস করত গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিশ্চিন্তে ও সুখে। এই উপকথার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অতীতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদি সম্পর্কের আদর্শ নমুনা রূপে এবং ভাবীকালের মানুষের আদর্শ রূপে, পরিশেষে

যে আধুনিক সভ্যতার নানা পাপ এড়াতে পেরেছে। ইডেন উদ্যানের ইউটোপিয়া — যা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সঙ্কটহীন, সংঘর্ষহীন সম্পর্কের ব্যাপারে প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছে — বাইরের দিক থেকে বিপরীত-ধর্মী অন্য এক তথা এরই মতো অতীতে ঘোষিত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আদর্শ নমুনার সমতুল্য, যা কোন অংশেই প্রথমোক্তের চেয়ে কম ইউটোপিয়ান নয়।

নরওয়ের এক লেখক কুন্ট ফাল্ডবাক্কেনের 'অস্তাচলের দেশ' উপন্যাসে অদূর ভবিষ্যতে সমাজের এমন এক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ, মেলামেশার স্বাভাবিক পরিবেশ খোয়ানো মানুষ যখন সক্রিয়, সৃজনশীল জীবনের ক্ষমতা হারায় অতিরিক্ত বিকশিত 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' তথা সমাজ সৃষ্ট মেলামেশার কৃত্রিম পরিবেশের উপর আশা রেখে। তবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্য সম্পর্ককে সমাজ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার দ্বারাই জীবনে সৃষ্ট মেলামেশার কৃত্রিম পরিবেশের লাগাম ধরে রাখতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলার সামনে সুষম, ভদ্র জীবন পিছু হটতে শুরু করে। 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুবিশাল এক আস্তাকুড়ে রূপান্তরিত হয়, যা শহরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। আর শহরের শেষসীমায় আবর্জনা এলাকায় দেখা দেয় এক নতুন জীবন, উদ্ভব

ঘটে নতুন ধরনের মানুষের (ভাবীকালের মানুষের প্রতিরূপ)। সে বুঝি-বা ফিরে যায় তার উৎসকালে, নিজ অস্তিত্বের জন্য লড়াই শুরু করে। মূল্যবোধের এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে: শক্তি, কৌশল, প্রাকৃতিক ঠাহর ক্ষমতা, জীবনের ব্যাপারে পাশবিক তৃষ্ণা, এমনকি নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিগত মনোভাব। মানবসভ্যতা কর্তৃক অর্জিত সব সাফল্য খোয়ানোর মূল্যে মানুষ বুঝি-বা প্রকৃতির সঙ্গে নিজ সুসমঞ্জস সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে।

তবে বাইবেলের পুরানো নিয়মের সেই ইডেন উদ্যানে শান্তিময় জীবন এবং নিষ্ঠুর, স্বার্থপর 'প্রাকৃতিক' মানুষের অবয়ব, যে তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামরত — এ দুই-ই প্রকৃতির সঙ্গে আদিম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত ধরনগুলি থেকে অনেক দূরের, যথার্থ ইতিহাসবাদ থেকে বহু দূরের ব্যাপার। প্রকৃতির সঙ্গে, সহজাতিক লোকজন ও খোদ নিজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বসবাসের জন্য আদিম ব্যক্তিকে যে মূল্য দিতে হয়েছিল, আধুনিক মানুষের কাছে তা অত্যধিক বলে মনে হতে পারে — এই সামঞ্জস্যের মূল্য দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতিতে। মানবসভ্যতার এবং আলাদা প্রতিজনের ভাগ্যের ব্যাপারে আধুনিক মানুষ চিন্তিত। আমাদের গোটা দুনিয়াকে সে নিজের 'সুবৃহৎ ভবন' বলে মনে করে। আদিম ব্যক্তির কাছে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গোটা মানবসভ্যতা সঙ্কুচিত হয়ে তার উপজাতির,

তার গোষ্ঠীর আকার ধারন করেছিল। যাকিছুই ছিল তার বসতির গন্ডির বাইরে, তার ক্রিয়াকলাপ ক্ষেত্রের গন্ডির বাইরে, তার সবেরই অবস্থনে ছিল তার চিন্তা ও কল্পনা পরিসরের বাইরে এবং আদিম ব্যক্তি তার মূল্যায়ন করত 'আবর্জনার সাগর' রূপে, বিশৃঙখলা, তমসা, মৃত্যু রূপে। আদিম মানুষের দুনিয়া ছিল নিবিড়। পদচিহ্ন না পড়া পর্বত শিখরে উঠে, সুগভীর গুহায় নেমে সে এমনই অনুভূতি লাভ করত, বুঝি-বা ঘুরে এল 'জগতের শেষপ্রান্ত' থেকে। তবে এমন বিশ্ববোধ অবজেকটিভ ঐতিহাসিক আবশ্যিকতার উপর নির্ভর করে থাকলে, আদিম মানুষের বিশ্ব-অনুভূতির পুনঃসৃষ্টির, সুসম্পন্ন কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের বোঝা ছুড়ে ফেলার, 'যৌথ অচেতন অবস্থার' ঘাড়ে সব দোষ চাপানোর প্রচেষ্টা মানুষকে অমানুষ করার, তার মানবিক সারবস্তুকে হেয় করার রূপধারন করে।

গোষ্ঠী, মানুষ ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে এক অখন্ডনীয় বন্ধন গড়ায় লোকজনকে কী সাহায্য করেছিল? আদিম সংস্কৃতির যেকোন গবেষণায় আমরা পড়ি যে, সে সময়কার লোকেদের মিলিত করেছিল রক্তের আত্মীয়তার সম্পর্ক। নিঃসন্দেহে সে সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক বিপুল ভূমিকা পালন করেছিল। তবে আমরা কোন এক উপজাতির সব সদস্যের পক্ষে এক সাধারণ 'পূর্বপুরুষের' কথাও জানি, যেমন, পুমা জাতীয় বনবেড়াল

বা কৃষ্ণসার মৃগ, ক্যাঙ্গারু বা উটপাখি...। এমন 'পূর্বপুরুষ' রূপে হয়ত-বা ছিল উদ্ভিদ অথবা এমনকি অপ্রাণী প্রকৃতির কোন বস্তু। এখানে আমরা এমন ঘটনার মুখোমুখি হই যখন প্রত্যক্ষ, রক্তের সম্পর্ক ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল মানুষের পারস্পরিক ও প্রকৃতির সঙ্গে সব জটিল সম্পর্কের, অথবা এমনকি প্রকৃতির নানা ঘটনার মধ্যকার যোগাযোগের। অতএব, শুধুমাত্র আত্মীয়তার যোগাযোগ থেকেই আদিম মানুষের জীবনযাত্রার সব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় নি, বরং খোদ এই আত্মীয়তার সম্পর্ক তার পারিপার্শ্বিক জগতের ব্যাখ্যাদানে সার্বজনীন নীতির কাজ করেছিল। এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশলাভ করছে আদিম মানুষের চেতনার অন্যতম এক মূল বৈশিষ্ট্য, যাকে অভিহিত করা হয় **পৌরাণিক** চেতনা রূপে।

পুরাণ ও পৌরাণিক চেতনা বলতে কী বোঝায়? এ হল পারিপার্শ্বিক জগৎ ও তার সঙ্গে নিজ সম্পর্কের ব্যাপারে চেতনালাভের বিশেষ এক ধরন, যার ভিত্তিতে থাকে মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ, আত্মা ও বস্তুর 'আত্মীয়তা' অথবা মিলকে স্বীকৃতিদান। আদিম ব্যক্তির সেই খাদ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, যার অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই ছিল তার ও পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে। সর্বাগ্রে সে দেখে একতা। চিহ্ন, প্রতীক ও বস্তু, সারবস্তু ও ঘটনা, একক ও সাধারণ, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, দূরের ও কাছের, সম্ভব ও অসম্ভব,

কোন বস্তু সম্বন্ধে নিজের ধারণা ও খোদ বস্তু, কারণ ও পরিণামের মধ্যে একতা। পৌরাণিক চেতনায় এসবের মধ্যে পার্থক্য টানা হয় না, যেমন, বাস্তব ও মায়া, ইপ্সিত ও প্রকৃত, বস্তুগত ও ভাবজনিত, অনুপস্থিত থাকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির, সুষম মনোভাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আবেগধর্মিতা। এই অখন্ডতা, অথবা যাকে অভিহিত করা হয় আদিম চেতনার সম্মিলন রূপে (গ্রীক ভাষায় synkretimos), তার উপরই নির্ভর করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর গুণাগুণের সঙ্গে মানবিক গুণ ও মানবিক সমাজের মিল দেখা দিয়েছিল।

পৌরাণিক চেতনা দ্বারা জগৎ রপ্ত করাই নির্ধারিত করে আদিম মানুষের আচরণ পদ্ধতি, যে মায়াজনিত ক্রিয়ার গোটা এক ব্যবস্থা ব্যবহার করত। **মায়াজনিত** ক্রিয়া — এ হল সেই ক্রিয়া, যার ভিত্তিতে আছে বুঝি-বা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান এমনসব 'রক্তের' যোগাযোগের ঐন্দ্রজালিক সদ্ব্যবহার, যেমন, কোন বস্তু ও তার প্রতিমূর্তির, গোটা বস্তু ও তার অংশের, প্রতীক ও প্রতীকী বস্তুর, নাম ও ব্যক্তির মধ্যকার যোগাযোগ। পারিপার্শ্বিক জগৎ রপ্ত করার এমন ঐন্দ্রজালিক, কাল্পনিক পদ্ধতি এক বড় মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করেছিল। বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করায় তা আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল, কঠিনতার মোকাবিলায় সংহতি সৃষ্টি করেছিল, প্রায় সম্পূর্ণ 'অ-জ্ঞানের' পরিস্থিতিতে পরম জ্ঞানের মায়া সৃষ্টি করেছিল। তবে আমাদের যুগেও হরেক রকমের সামাজিক

প্রতীকের ব্যবহারও বুঝি-বা আমাদের মনে শক্তি যোগায়! দৃষ্টান্তস্বরূপ, সামরিক তৎপরতায় পতাকা সব সময়েই বুঝি-বা শক্তি, সাহস ও সংহতি সঞ্চয়ের কাজ করেছিল; লড়াই করে পতাকা ধরে রাখার অর্থ ছিল বুঝি-বা শত্রুপক্ষর কাছ থেকে তার একাংশ শক্তি 'ছিনিয়ে নেওয়া'। আধুনিক লোকও মোটেই সব সময় জগতের সঙ্গে, সেই ধরনের অন্যকিছুর সঙ্গে নিজের যোগাযোগ চিন্তার সাহায্যে, বুদ্ধির বিশ্লেষণী কাজকর্মের দ্বারা স্থাপন করে না। মাঝেসাঝে সেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির সমস্ত শক্তি দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে নিজ যোগাযোগ উপলব্ধি করে। আর এতে তাকে সাহায্য করে নানা প্রতীক ও চিহ্নের জগৎ। নানা চিহ্ন তার আবেগের এক ধরনের 'নির্ভর কেন্দ্রে' পরিণত হয়। আধুনিক মানুষের কাছে জগতের এমন প্রত্যক্ষ-আবেগধর্মী রপ্ত করার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা তার কাছে মিলেমিশে একাকার হয় সেই জটিল যুক্তিযুক্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে, যা আমাদের চেতনাকে মায়ার জগৎ দ্বারা ভারাক্রান্ত হতে দেয় না। তবে আধুনিক মানুষের চেতনা নানা মায়াময়, কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হওয়ার, জগৎ সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত নানা পৌরাণিক ধারণায় তাকে আপ্লুত করার, পারিপার্শ্বিক জগতের ব্যাপারে সন্দেহ করার, *সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করার খোদ সম্ভাবনাকে* বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা আমাদের যুগেও বিদ্যমান।

প্রাচীন যুগের মানুষের পৌরাণিক চেতনার নানা

বৈশিষ্ট্য, মানুষ ও প্রকৃতির ব্যাপারে এর অখন্ডতা, অবিভাজ্যতা, অত্যধিক আবেগ-প্রবণতা, ইত্যাদি খোদ তার নিজের ব্যাপারেও প্রকাশলাভ করে : প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা না থাকলে আমারও অস্তিত্ব... নেই, যে কিনা অন্য সব 'আমি'র থেকে অদ্বিতীয়, পরম পার্থক্যের অধিকারী, যা আমি বহন করি আমার জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করে, একেবারে বিভিন্ন নানা পরিস্থিতিতে তা রক্ষা করি, আর তা সদা আমি আমার মতো থেকে। নিজের প্রতি এমন সম্পর্ক, নিজের মূল্যায়ন — আধুনিক মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন মানুষের কাছে তা ছিল অপ্রয়োজনীয়। কোন শিশু, আর তারপর কিশোরে পরিণত সে তার তথাকথিত 'বয়ঃসন্ধি' কালে শুধু অন্য এক বয়সের শ্রেণীবর্গেই 'চলে আসে' না, বরং নতুন এক সামাজিক কর্তব্য পালন শুরু করে বুঝি-বা তার পুনর্জন্ম ঘটে। যেমন, আফ্রিকার কিকুইয়ু উপজাতির ৬-৮ বছরের শিশুকে 'দ্বিতীয়বার জন্মের' আচার পালন করতে হয়, আর শুধু তারপরেই সে নিজের আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে নিজ দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি দেয়। নামকরণ প্রথা (উপাধি গ্রহণ অনুষ্ঠান) দ্বারা সাবালক মানুষের বুঝি-বা জন্ম হত, যে কিনা স্বাধীনভাবে পরিবার বসাতে সক্ষম। এই 'নতুন মানুষ' নতুন নামও পেত, যা তার সামাজিক অবস্থান পাকাপোক্ত করত। পৌরানিক চিন্তাধারা দ্বারা নাম বিবেচিত হত খোদ ব্যক্তি বিশেষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে,

নাম ও তার অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে এক বিশেষ মায়াবী যোগাযোগের অস্তিত্ব ছিল, নাম — এ হল স্বয়ং মানুষ। তাই ব্যক্তিগত নাম লুকানো হত, যাতে করে শত্রু বা দুরাত্মা সেই নামাধারীর কোন ক্ষতি না করতে পারে। অনেক ধর্মে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বারণ। নাম বন্টন হত গোষ্ঠী দ্বারা, যা ছিল 'ব্যক্তি বিশেষ-নাম-গোষ্ঠী'র মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের প্রকাশস্বরূপ।

সুতরাং, ব্যক্তি বিশেষ ও বংশের একাকার অবস্থা রূপলাভ করেছিল খোদ চেতনা ও 'ব্যক্তিত্ববোধের অনুভূতি', গোষ্ঠী থেকে নিজেকে আলাদা করার ক্ষমতা — এসবের অনুপস্থিতিতে। অন্তরের অটলতাবোধ বঞ্চিত ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব প্রক্রিয়া পৌরাণিক চেতনা দ্বারা বিবেচিত হয় পুনঃরূপদানের অনুরূপ অবস্থার রদবদল রূপে। অযথাই বিভিন্ন ধরনের সনাতন ধর্ম — যেগুলি এমন চেতনার অনেক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে — আত্মা চলাচলের ধারণা প্রচার করে। ভাবা যেতে পারে যে, এই অবস্থা বলে প্রাচীন মানুষ আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল, বঞ্চিত ছিল প্রতিদ্বন্দিতা, প্রতিযোগিতার রেশ থেকে। এটা ঠিক নয়। বরং উল্টো ; তার কাছে একান্ত জরুরী হয়ে উঠে সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপে প্রথম হওয়া, যাতে সে 'সিদ্ধহস্ত'। তবে এই সক্রিয়তা পুরোপুরি সেই পরিসরে সঞ্চিত, যা ব্যক্তি বিশেষের জন্য হাজির করেছে গোষ্ঠী। এই পরিসরের বাইরে যাওয়া, অন্য কোন ব্যাপারে

নাক-গলানো, অথবা কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা — আদিম ব্যক্তির কাছে একেবারেই অজানা ব্যাপার। গবেষকগণ বারংবার তথাকথিত 'মানসিক' (মানুষের শুধু চেতনার, মানসিক কারণে ঘটা) মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা ঘটে কোন নিষেধাজ্ঞার অজান্তে লঙ্ঘনের দরুন। যেমন, প্রখ্যাত মানবতাবাদী, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত আ. শয়াইটজার এমন এক কাহিনী বিবৃত করেছেন, যখন এক বালক (কলা খাওয়া যার বারণ ছিল) মারা গেছিল এই জেনে যে, সে সেই পাত্র থেকে খাবার চেখেছে, যাতে তার আগে কলা সেদ্ধ করা হয়েছিল।

সুতরাং দেখছি, আদিম মানুষের আমার-আপনার সঙ্গে যেমন মিল, তেমনই অমিল আছে। এটা বুঝতে পেরে যে, সুদূর সে সময়কার শুধু সামাজিক-ঐতিহাসিক নানা পরিস্থিতির তখনকার অতিনিম্ন উৎপাদন হার, অল্প শ্রম-তারতম্য, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি অবস্থা, জ্ঞানের অনুপস্থিতি সহ — দরুনই বাস্তবে আলোচ্য ধরনের মানুষ দেখা দিয়েছিল, আর আমাদের এও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের জীবনেও, আধুনিক মানুষের মধ্যেও এমনসব বৈশিষ্ট্যের দেখা মেলে, আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যেগুলির মিল আছে। 'আমি' ও প্রকৃতির, 'আমি' ও ইতিহাসের একাকার অবস্থার (মিলের) শুধু অনুভূতিকে আর পৌরাণিক চেতনায় গণ্ডিতে নয়, বরং নান্দনিক মর্মপীড়া, ইতিহাসের অনুভূতির আকারে বিবেচনা করা উচিত।

পরবর্তী ঐতিহাসিক বিকাশের কল্যাণে দেখা দিয়েছিল এক নতুন ধরনের মানুষ। এই প্রক্রিয়ার নানা কারণ সর্বাগ্রে খোঁজা দরকার বৈষয়িক সম্পর্ক ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন : 'ঐতিহাসিক বিকাশকালে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের জীবনের — যেহেতু তা হল ব্যক্তিগত — এবং তার জীবনের — যেহেতু তা শ্রমের এই বা সেই ক্ষেত্রের অধীন ও তার সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ — মধ্যে তারতম্য দেখা দেয়।'*

৩। 'মানুষ — তাদের সবার চেয়ে বড় বিস্ময়'

এই তারতম্যের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত নির্ভরশীল সম্পর্কের এক নতুন ধরন, নতুন পর্ব ; এ হল প্রভু ও অধঃস্তন লোকের সম্পর্ক, শ্রেণীজনিত সমাজে যার আধিপত্য বিদ্যমান। আদিম গোষ্ঠী সমাজে ব্যক্তিগত নির্ভরশীল সম্পর্ক বলতে ছিল গোষ্ঠীর সব লোকের একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতার সম্পর্ক, শ্রম উপকরণগুলির ব্যাপারে যারা ছিল সমান সম্পর্কের অধিকারী। যে-সমাজে শ্রমের উপকরণসমূহ সমাজের সব লোকের সম্পত্তি নয়, বরং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, সেখানে প্রভু ও অধঃস্তন সম্পর্ক সমর্থনপুষ্ট হয় **অর্থনীতি-বহির্ভূত** জবরদস্তির সাহায্যে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৈহিক বলপ্রয়োগ অথবা আচার-

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, ৩ খণ্ড, ৭৭ পৃঃ (রুশ সংস্করণ)।

প্রথা, অধিকার, ভাবাদর্শ, ধর্মীয় চাপসৃষ্টির সাহায্যে জোরজুলুম চালিয়ে।

জীবনের সব ক্ষেত্রে দেখা-দেওয়া এই প্রভু-অধঃস্তন সম্পর্ক মানুষের উপর, আদিম গোষ্ঠী সমাজের বদলে আসা শ্রেণীজনিত সমাজে মানুষের বিকাশের উপর কেমন ছাপ ফেলে? পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি ও স্বয়ং নিজের প্রতি মানুষের নতুন সম্পর্ক স্থাপনের নানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাস সমাজে। ব্যক্তি বিশেষের বিকাশের এক নতুন পর্বের, মানুষের নতুন সামাজিক মূল্যায়নের কথা পুরাকালের সরলতা ও আবেগ সহ বর্ণিত হয়েছে সফোক্লিসের (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) 'আন্তিগোনে' ট্রাজেডিতে :

'অনেক বিস্ময় আছে ধরায়,
মানুষ — তাদের সবার চেয়ে বড়
বিস্ময়' ।*

স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ, সাহস ও বীরত্ব, লজ্জা ও দোষ — এ হল একগুচ্ছ নতুন মানবিক মূল্যবোধ, পুরনো সামাজিক গঠন-ব্যবস্থায় যেগুলি ছিল অজানা এবং সেগুলির উৎপত্তি ঘটে এই সময়ে, প্রখর উপলব্ধি ও আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছিল।

---

* পুরানাট্য। মস্কো, চিরায়ত সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৭০, পৃঃ ১৯২ (রুশ সংস্করণ)।

আমরা আগেই বলেছি, মানবজাতির ইতিহাসের প্রতিটি নতুন পর্ব হল স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও নিজস্ব নানা সম্ভাবনা উপলব্ধির দিকে মানুষের এক পদক্ষেপস্বরূপ। 'অ্যাণ্টি-ড্যুরিং' রচনায় এঙ্গেলস লিখেছেন, 'সংস্কৃতির পথে প্রতিটি অগ্র-পদক্ষেপ ছিল স্বাধীনতার উদ্দেশে পদক্ষেপ।'*

নির্যাতন, অধঃস্তন সম্পর্ক, পরাধীনতা ভিত্তিক সমাজে ব্যক্তিত্ব অনুভূতির জাগরণ কেন দেখা দেয় ?

শ্রেণীজনিত সমাজে সেই বংশগত বন্ধন বিনষ্ট হয়, গোষ্ঠীর সব লোক যার দ্বারা এক অখন্ড সত্তায় জড়িত। ব্যক্তিগত মালিকানার দরুন ব্যক্তিগত স্বার্থও — নিজের সম্পত্তি রক্ষা করা ও বাড়ানো — দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তির — নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থাদির প্রহরীস্বরূপ — অবজেকটিভ বিচ্ছিন্নতার দরুন অন্য ব্যক্তি, গ্রুপ, সামগ্রিকভাবে সমাজের সঙ্গে নিজেকে প্রতিস্থাপন করার প্রবণতা দেখা দেয়। তবে এমন অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে এক সরল তথা শ্রেণীজনিত সমাজে ব্যক্তি বিশেষের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা রূপে বোঝা উচিত নয়। বরং উল্টো। প্রখর ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ ও অন্তর্যুদ্ধ, গতিশীল রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক বিতর্কের আবহাওয়া, জটিল রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির খোলাখুলি আলোচনার পরিস্থিতি — এ সবই

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ২০, পৃঃ ১১৬ (রুশ সংস্করণ)।

লোকজনকে ঘনিষ্ঠ করেছিল। এসব অবশ্য গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ পারস্পরিক যোগাযোগের সেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সম্পর্কস্বরূপ ছিল না, যা ব্যক্তিগত স্বার্থাদির মিলের দিকে, আদিম মানবপালকে এক অখন্ড সত্তায় মিলিত করার দিকে নিয়ে গেছিল। না, সমস্ত প্রখর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আত্মিক যোগাযোগ উৎসাহ লাভ করেছিল ঠিক এই ব্যক্তিগত স্বার্থের উপস্থিতির কল্যাণে। তবে নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসরণ করে লোকে অন্যান্য রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যেও নিজের মতো লোকজনকে দেখতে শিখেছিল। সেকেলে চেতনার বৈশিষ্ট্যস্বরূপ 'আমরা' ও 'ওরা', 'লোকজন' ও 'না-লোকজন' রূপে নিজেদেরকে বিভক্ত করা ক্রমশ উধাও হল। গ্রীক ট্র্যাজেডি নাট্যের জনক এস্খিলোস তাঁর 'পারসিক' ট্র্যাজেডিতে শত্রুপালকে চিত্রিত করেছেন 'অন্দরমহল' থেকে, তাতে তিনি অমানুষিক কিছু খুঁজে পান নি।

মানুষের জগতের সীমারেখা আক্ষরিক অর্থেই প্রসারিত হচ্ছে। মানুষ ইতিমধ্যেই স্বীকার করছে যে, সব মানুষের পক্ষে রয়েছে একক দেশ-কাল, একক বিশ্বব্রহ্মান্ড, যা বিস্তারিত হয়েছে মানুষের 'জীবনযাত্রার' পরিসর ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে।

মানুষ বুঝি-বা রক্তের আত্মীয়তা যোগাযোগের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করছে। নিজের কর্তব্য নির্বাচন, নিজে নিজের জীবন গড়ার মত ইচ্ছাশক্তি তার আছে।

তবে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, এখনও অনুপলব্ধি-করা ও চূড়ান্তভাবে 'অনারপ্ত' নিজের নানা আকাঙখা, কামনার সামনে একা একা মুখোমুখি হয়ে ভয়ে কাঁপে ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। জীবনের বিরুদ্ধে ভয়-দেখানো অদৃশ্যগোচর সবকিছুই প্রাচীন গ্রীসবাসীর কাছে রূপ নিয়েছিল অদৃষ্ট, ভাগ্যলিপি রূপে। তোর স্বাধীনতা — ছলনা, তাকে বলে তার নিষ্ঠুর অদৃষ্টের কন্ঠ। অদৃষ্টের সামনে সবাই সমান — রাজা ও সেনা, নারী ও পুরুষ। ভাগ্য তোকে যত বেশি উপরে নিয়ে যাবে, জীবনে তুই তত বেশি সাফল্য লাভ করবি, তত বেশি ক্ষমতা, পরাক্রম, সম্পদের অধিকারী হবি, ভাগ্যলিপি থেকে তোর কাজকর্ম বিভেদজনক হলে বিপর্যয়ও দেখা দেবে তত বেশি ভয়ঙ্কর।

গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে গ্রীকরা বুঝেছিল তাদের 'সীমানা' লঙ্ঘনকে : পারসিকদের জন্য বরাদ্দ ছিল স্থলদেশ, অথচ তারা হামলা চালিয়েছিল সাগরে। অদৃষ্ট সদা একমুখী, কোনকিছুই ও কেউই তাকে রুখতে পারে না, তা অন্ধ ও 'তমসাচ্ছন্ন'। তা এমনকি ভগবানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরও নির্ভরশীল নয়, ভগবান শুধু তার অতন্দ্র প্রহরী। গ্রীসের স্যামস দ্বীপের অত্যাচারী রাজা পলিক্রাট প্রায় সারা জীবন ছিল সাফল্য, ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী। সে বুঝি-বা নিজের হাতে নিজ ভাগ্য ধরে রেখেছিল। ভাগ্যের সম্ভাব্য ভয়ঙ্কর পরিহাসের ভয়ে ভীত

সে ভাগ্যকে প্রতারণার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা করে জেনেশুনে নিজের প্রিয় অতি মূল্যবান আংটিকে সাগর জলে বিসর্জন দিয়ে। তবে সেই আংটি-গেলা এক মাছ অচিরেই জেলেদের জালে ধরা পড়ল এবং সেটা পলিক্রাটকে ফেরৎ দেওয়া হল। ভাগ্য সেই বলি 'গ্রহণ করল না'। অচিরেই পলিক্রাট তার সব ধনসম্পদ খোয়াল এবং নিষ্ঠুরভাবে মারা পড়ল। সুতরাং দেখছি, প্রাচীন গ্রীকরা ভাগ্যকে যেভাবে বুঝত তাতে সহৃদয় করা, তার সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করা যেত না। এমনকি অসংখ্য গ্রীক দেবদেবীও অদৃষ্টের অধীনে ছিল।

আদিম মানুষের জগতের মতো গ্রীসবাসীর জগৎ ততটা সুস্পষ্ট নয়। সে আর অচেতনার সেই সামঞ্জস্যে, সেই মায়াময় দেশকালে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে পারে না, যাতে বাস করত আদিম মানুষ। একদিকে, সে আরও বেশি করে অনুভব করে মহাকাশের সঙ্গে, নিজ মতের সঙ্গে, সেই ধরনের অন্য কিছুর সঙ্গে বহুরূপী যোগাযোগ, আরও সুপরিসর অখণ্ডতার অংশ রূপে নিজেকে অনুভব করতে শুরু করে। অন্যদিকে, পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দুর্বল হতে থাকে, আদিম মানুষের পথে যা রূপলাভ করেছিল রক্তের আত্মীয়তায়। এই প্রথম মানুষ তার সত্তার বিষাদময় অবস্থা অনুভব করতে শুরু করে, যার প্রকাশ ঘটে মৃত্যু ও অমৃত্যু, অন্ত ও অনন্ত, প্রয়োজনীয়তা ও স্বাধীনতা, আকস্মিকতা, ও নিয়মানুবর্তিতার মতো

পরস্পর-বিরোধী সম্পর্কের মাধ্যমে। অদৃষ্টের ধারণাই হল মানুষের আত্মচেতনার সুনির্দিষ্ট এক পর্ব : পরস্পর-বিরোধী, এখনও পুরাণের পোষাক-পরা তমসাচ্ছন্ন আকারে পথ পাতে জগতে মানুষের স্বাধীন, 'আলাদা' সত্তার চিন্তাধারা।

মানুষ হল এক অখন্ডতার, 'মহাকাশের' অংশ, তার জীবন নির্ধারিত হয় এই অখন্ডতার নিয়মকানুন দ্বারা। সমাজের গন্ডির বাইরে অবস্থিত নানা শক্তির উদ্দেশে কাকুতি-মিনতি বিনা আর অন্যভাবে মানুষের সামাজিক প্রকৃতিকে বোঝা চলে না। তবে একই সময়ে প্রাচীন গ্রীকদের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল অদৃষ্টকে তার অন্ধত্ব থেকে বঞ্চিত করার, তাকে উপলব্ধি ও জয় করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। অদৃষ্টের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, সংঘর্ষের আকারে শুরু হয় মানুষের অস্তিত্বের, তার জীবন তাৎপর্যের মৌলিক পরস্পর-বিরোধিতা গড়ার ব্যাপার। অদৃষ্ট — এ যেমন বাইরের জীবনের নিয়মানুবর্তিতা, তেমনই তা খোদ মানুষের মধ্যে অন্ধত্ব, তমসা, অচেতন মনোভাবের সূত্রপাত। অদৃষ্টের সঙ্গে — জগৎ, সমাজ ও খোদ নিজের সঙ্গে — লড়াই করে মানুষ নিজেকে, নিজের শক্তি ও দুর্বলতাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, রাষ্ট্রে, পরিবারে নিজের 'সীমারেখাকে' উপলব্ধি করে। সফোক্লিসের 'আন্তিগোনে' ট্র্যাজেডিতে নায়িকা তার নিহত ভাইয়ের দেহ সমাধিস্থ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতক রূপে সে দেশের রাজা তার কাকা ক্রেওন্ত সমাধিস্থ করার বিরুদ্ধে

নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরিণামে মারা যান আন্তিগোনে, তার প্রেমিক (ক্রেওন্তের ছেলে), ক্রেওন্ত পত্নী আত্মহত্যা করেন। এই ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে কে ঠিক, কে পালন করেছিলেন ভাগ্যলিপি? ঠিক আন্তিগোনে, কেননা প্রাচীন বংশগত প্রথার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি পরিবার রক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থ তাঁর কাছে ছিল অজানা ব্যাপার। ক্রেওন্তও ঠিক, যিনি রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন; তবে তিনি ব্যক্তিত্বের 'গন্ডি অতিক্রম' করেছেন, মানুষের জীবন ও সার্থক মৃত্যুর খোদ অধিকারকে করেছেন পদদলিত। আন্তিগোনের প্রেমিকও ঠিক, যিনি প্রেমের অধিকার ছাড়া অন্য আর কোন অধিকার জানতে অনিচ্ছুক। ঠিক ক্রেওন্ত পত্নীও, যাঁর মতে রাষ্ট্রের নামে মাতৃত্বের পবিত্র অধিকার বলি দেওয়া হল অনৈতিক। এমনই বহুরূপী ও পরস্পর-বিরোধী আকার ধারণ করে 'অদৃষ্ট', যার 'পার্থিব' চিত্র এখানে হয়েছে উন্মুক্ত! মানুষ যত চোখে পড়ার মতো, যত তৎপর, তার পক্ষে 'সীমারেখা' মানা ততই জটিল, কেননা তা মিলেমিশে একাকার হয় নৈতিক, রাজনৈতিক ও মহাকাশীয় নিয়মকানুনের সঙ্গে।

অদৃষ্ট ও তা প্রকাশকারী তথা দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের পরিণাম সদা বিষাদজনক হওয়া সত্ত্বেও, ঠিক নিজের মতো থেকে অন্ধ ভাগ্যের বিরুদ্ধাচারণ করার অধিকার মানুষের অন্তরে রয়েছে। মার্কস লক্ষ্য করেছেন, এস্খিলোসের

ট্র্যাজেডিতেই দেবদেবীরা 'মারাত্মক আহত হয়েছেন'।* এস্খিলোস সসাহসে দেবদেবীর সমালোচনা করেছেন তাঁদের নিষ্ঠুরতা ও অন্ধত্বের জন্য এবং লোকজনের স্বার্থে দেবতাদের বিধি-নিষেধ ভঙ্গকারী প্রমিথিউসকে উপরে তুলে ধরেছেন যুক্তি ও মঙ্গলের ধারকবাহক রূপে। অদৃষ্টের সঙ্গে মানুষ লড়াই করতে পারে, আর শুধু পারেই না, পারা উচিতও, যদি সে মানুষ রূপে থাকতে চায়! অযথাই প্রমিথিউসের চরিত্র সদা সর্বোত্তম মানবিক গুণাগুণের প্রতীক রূপে ছিল না।

তবে খোদ অদৃষ্টও প্রাচীন গ্রীসবাসীর চেতনায় নতুন নতুন রূপরেখা লাভ করতে শুরু করে। নানা দার্শনিক শিক্ষায় জগতের অন্ধ, তমসাচ্ছন্ন, যুক্তিহীন সূচনার প্রসঙ্গ আর দেখা যায় না। অন্ধ অদৃষ্ট নয়, বরং ধীশক্তি (গ্রীকভাষায় logos — পরম যুক্তিসিদ্ধ সূচনাই রয়েছে জগতের মূলে) একক মানুষের মনে, রাষ্ট্রে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্য অবস্থায় নানাভাবে প্রতিসৃত হয়ে যুক্তির অধিকারী হতে পারেন শুধু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞজনেরা, প্ল্যাটোর মতে। নিজের অন্তরে অন্ধ, তমসাচ্ছন্ন 'কামনাজনিত' ভিত্তি অতিক্রম করা, মনের 'যুক্তিযুক্ত' অংশের প্রকাশ ও বিকাশ — মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলজনক। এইভাবেই ধীশক্তি, মনের যুক্তিযুক্ত অংশ মনের কামনার অংশে রূপায়িত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। তবে এ জয় সহজে হয় না। নিজেকে,

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ১, পৃঃ ৪১৮ (রুশ সংস্করণ)।

তার অন্তরের সব তমসাচ্ছন্ন ও আলোকিতকে মানুষের উপলব্ধি করা দরকার, আর শুধু তারপরই তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত, যা যথার্থ মানব 'সীমারেখার' সঙ্গতিসম্পন্ন নয় — এই হল গ্রীকদের মতবাদ।

মানুষের অমূল্য সঙ্কল্প প্রকাশের বিশ্বজনীন পদ্ধতি রূপে গণ্য করা হত তথাকথিত কাথারসিসকে (গ্রীক ভাষায় katharsis, অর্থাৎ সাফাই করা, আলোকিত করা)।

বর্তমানে সাফাই কর্মকে শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত রূপে গণ্য করা হয়। তবে সেই সুদূর অতীতে 'কাথারসিস' অর্জিত হত সেইসব বিধ্বংসী শক্তির পুনরুৎপাদন ও বাঁচিয়ে তোলার পথে, যেগুলি সুপ্ত ছিল মানুষের মধ্যে, সেইসব সার্বজনীন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে, যেগুলি ঈশ্বর হত্যার পৌরাণিক ইতিহাস পুনঃসৃষ্টি করত এবং পরবর্তী কালে পবিত্র জীবের আকারে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটাত।

এই কাজের প্রথম পদক্ষেপ — ঈশ্বর 'হত্যা' — প্রায়ই ঘটত উন্মত্ত হৈ-হল্লার আকারে, যে সময় লোকে সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করত। পরবর্তী পর্যায় — কৃতকর্মের জন্য মর্মান্তিক অনুশোচনা, নিজ অপরাধের জন্য যাতনা সওয়া, সার্বজনীন শোক। এবং পরিশেষে, — নবজীবন প্রাপ্ত ঈশ্বরের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, সার্বজনীন উল্লাস। এই আচারটি ছিল মানুষের তমসাচ্ছন্ন, পাশবিক কামনা, 'অদৃষ্টের' সঙ্গে সংগ্রামের স্বকীয় এক ধরন। প্রত্যেকের কাছ থেকে এর দাবি ছিল তার মধ্যে এই অযৌক্তিক

ভিত্তির একান্ত দৃষ্টিগোচর প্রকাশ, আর তৎক্ষণাৎ মানুষকে নিজের কাছে এ প্রশ্ন করতে বাধ্য করত : 'এই কি তবে স্বাধীনতা?'। আর তারপর এই কাজের সব অংশগ্রাহীর মনে এ চিন্তার উদ্রেক ঘটাত, নানা সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে এমন ইপ্সিত স্বাধীনতা হল মনগড়া স্বাধীনতা। উপরে উল্লিখিত নানা সামাজিক মাত্রা লঙ্ঘন করে মানুষ কখনও স্বাধীন হতে পারে না। আধুনিক দার্শনিক চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতি বর্ণনার প্রচেষ্টা করা হলে বলা চলে, মানুষ অতি সরল আকারে ও 'হাতে-কলমে' এ শিক্ষা লাভ করে যে, পুরনো ও বিরক্তিকর জামাকাপড়ের মতো নিজের থেকে সব সামাজিক রীতি ঝেড়ে ফেলা চলে না, কেননা মানুষের খোদ তাৎপর্য হল সামাজিক। বরং উল্টো ; ঠিক এই সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘনই হল নিজের উপর অত্যাচার করা। মানুষ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের সামাজিক লক্ষণ উপলব্ধি করে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভগবান রূপান্তরিত হয় নৈতিক, সার্বমানবিক বনিয়াদের প্রতীকে।

সুতরাং, লোকেদের মধ্যে বংশগত যোগাযোগের বদলে ক্রমশ দেখা দেয় নিজের সামাজিক লক্ষণের ব্যাপারে উপলব্ধ মর্মপীড়া। প্রাচীনকালের পুরাকাহিনীর নায়ক-নায়িকারা এভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকলে, যথা, তারা কেবল ভাগ্যলিপিই পালন করে থাকে, আর তারা নিজেরাই নিজেদের 'জীবনস্রষ্টা' নয়, তাহলে প্রাচীন ট্র্যাজেডিগুলিতে নিজের নানা কৃতকর্ম

ব্যক্তিগত দোষের জন্য ইতিমধ্যেই দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটেছে। এমনকি তাদের ধারনায় অদৃষ্ট লৌহকঠিন আবশ্যিকতায় কাজ করলেও এবং কোন দোষ ছাড়াই তারা দোষী সব্যস্ত হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন হয়েছিলেন সফোক্লিসের ট্র্যাজেডির নায়ক রাজা অয়দিপাউস।

ব্যক্তি বিশেষের জীবন আরও জটিল ও পারিবারিক সম্পর্ক স্বশাসিত হওয়ার ফলে বাছাই পরিস্থিতি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চেতনার বিকাশ হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূচকে। শত্রুভাবাপন্ন নানা শক্তির সামনে, দেবতাদের রোষের সামনে **ভীতির** অনুভূতির বদলে এল অধিকতর জটিল ধরনের মর্মপীড়া : লজ্জা ও মর্যাদা, গর্বের অনুভূতি, নামযশের ব্যাপারে প্রচেষ্টা (লোকে কী বলবে, আমার সম্বন্ধে লোকে কী ভাববে? আমার কেমন মূল্যায়ন করবে? মানুষের মধ্যে জন্মানো মানবিক গুণাগুণের জন্য তার পক্ষে বুঝি-বা অত্যাবশ্যক হল বাইরের অন্যদের, সমাজের সমর্থন, বিচ্ছিন্নতার ভয়ে সে ভীত।

সমাজের কাছ থেকে মানুষ পায় নিজের আচরণ 'মডেল', সমাজ তাকে সেইসব নমুনা দেয়, যেগুলি তার অনুসরণ করা উচিত আর তা বাছাইয়ের ব্যাপারে নিজ অধিকারের সদ্ব্যবহার করে। সে সময়ে নিজের পূর্ণতর উন্নতিবিধানের শ্রেষ্ঠতম আকার রূপে ছিল প্রভাবের সঙ্গে কোন্দলহীন উত্তম নমুনার অনুকরণ। তবে এখানেই নিহিত আছে

সেইসব বৈপরীত্যের উৎস, যেগুলি পরবর্তী নানা যুগে জোরদার হয়েছিল। উত্তম নমুনা অনুসারে নিজের পূর্ণতর উন্নতিবিধানের প্রয়াসে মানুষ নিজের লাগাম খোয়াতে পারে। অনুকরণ ভক্তিতে পর্যবসিত হতে পারে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সে সময় মানুষে মানুষে সব সম্পর্কই ছিল ব্যক্তিগত ধরনের। এ সম্পর্ক ছিল নির্দিষ্ট লোকজনের মধ্যে, যারা তখনও জিনিসপত্রের, প্রশাসনের অবয়বহীন কর্মপদ্ধতির দ্বারা আবৃত হয় নি। তবে সমাজে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা, সর্বাগ্রে তার বৈষয়িক অবস্থা সাধারণত পুরোপুরি তার নিজস্ব গুণাগুণের উপর নির্ভর করত না। অতীতে, বংশগত গঠনব্যস্থায় প্রভাব, সমাজে প্রতিষ্ঠা ব্যক্তি বিশেষের সাহস, শক্তি, বিজ্ঞতা, পটুত্বের উপর নির্ভর করে থাকলে, শ্রেণীজনিত সমাজে প্রভাবের শক্তি রূপান্তরিত হয় শক্তির প্রভাবে। তবে জনতার চেতনায় 'অর্থনৈতিক অবস্থান-ক্ষমতা-প্রভাব' বুঝি-বা উল্টো রূপ ধারন করে, তার পরিণাম-বিন্দুকে ধরা হয় উৎস রূপে। একক ব্যক্তির পরাক্রম, ক্ষমতাকে সমাজে ব্যাখ্যা করা হয় তার একান্ত নিজস্ব সদগুণ রূপে। ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি উপরে, ক্রমশ আরও উপরে ওঠে পরিণত হয় 'ঈশ্বরমানবে'। আর এমন প্রভাবের অনুকরণ করা বিপজ্জনক, তাকে শুধু ভক্তি করা যায়। পারস্য, উত্তর ভারত ও মিশর জয় করে অযথাই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নিজেকে আমোন দেবতার পুত্র বলে ঘোষণা করেন নি, আর তা এই বুঝে যে, প্রভাবের

ভিত্তি হওয়া উচিত ঐশ্বরিক প্রভাব। রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাটের প্রভাব ঠিক তেমনই নিহিত ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার, দেবদূতের প্রতীকের ব্যাপারে তার সুনামের ওপর। মানুষের সামাজিক লক্ষণের ব্যাপারে জন্মানো অনুভূতি একান্ত অদ্ভূত রূপলাভ করেছিল : দেশপ্রেম রাষ্ট্রের মূর্তপ্রতীকস্বরূপ সম্রাটের প্রতি প্রেমের আকার ধারন করেছিল।

ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা পর্বে উদ্ভূত এবং বর্তমান কালেও বিদ্যমান **স্বেচ্ছাচারী** চেতনার প্রকৃতি মহান রুশ লেখক দস্তয়ভ্‌স্কির চিন্তার বিষয়বস্তু হয়েছিল : '...খুদে অন্ধবিশ্বাসীরা, — তিনি লিখেছেন, — ভাবাদর্শের সেবা করাকে তাদের ধারণা অনুযায়ী, সেই ভাবাদর্শ প্রকাশকারী খোদ ব্যক্তির সঙ্গে তার মিলন ছাড়া অন্য আর কোনভাবে বোঝে না।'*

নিজেকে, নিজের মানবিক সারবস্তুকে যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে মানুষ তাকে নিজের থেকে আলাদা করতে এবং কোন এক অজানা সত্তা রূপে তাকে ভক্তি করতে শুরু করে। এইভাবেই দেখা দেয় মানুষ কর্তৃক তার নিজস্ব সারবস্তু তফাৎ করার প্রক্রিয়া। যতক্ষণ না মানুষের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ সবকিছু পুরোপুরি তার থেকে আলাদা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মানুষের অধিকারে থাকে। তবে সব মানুষের অধিকারে নয়। সারবস্তুর অধিকারী হয় শুধু সেইসব নির্বাচিত ব্যক্তি, স্বেচ্ছাচারী

---

* দস্তয়েভ্‌স্কি ফ. ম.। রচনাবলী, খঃ ৭, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৯৮ (রুশ সংস্করণ)।

চেতনার যুক্তি অনুসারে যারা সেই প্রজন্মের লক্ষ্যবিন্দু হয়ে ওঠে। সুমহান ব্যক্তিত্ব, 'ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন নেতা' (গ্রীক শব্দ charisma থেকে — অনুকম্পা, ঐশ্বরিক কৃপা — কোন ব্যক্তিকে সবিশেষ, পাপহীন, অতীব অস্বাভাবিক গুণাগুণ প্রদান) — দিগম্বর, জ্ঞান-প্রচারক, রাজনৈতিক নেতা, যাঁকে বিবেচনা করা হত শাসন-ক্ষমতার শুধু প্রতিনিধি রূপেই নয়; তিনি হলেন শাসন-ক্ষমতার স্বয়ং উৎস। স্বেচ্ছাচারী চেতনায় সাধারণকে (শাসন-ক্ষমতা, রাষ্ট্র, নানা নৈতিক মূল্যবোধ, সামগ্রিকভাবে খোদ সমাজ) উপস্থিত করা হয় একক আকারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমনই হলেন 'জাতির জনক' তথা কলম্বিয়ার লেখক গ.গ. মার্কিজের 'এক যাজকের শরৎ' উপন্যাসে জনৈক একনায়ক। সুবিদিত যে, স্বেচ্ছাচারী চেতনা, ব্যক্তিপূজার প্রকাশকে সমাজতান্ত্রিক সমাজও এড়াতে পারে নি। এই ঘটনার পক্ষে কি নানা অবজেকটিভ পূর্বশর্ত ছিল? একেবারে হালেও এ ভাবার চল ছিল যে, ব্যক্তিপূজা হল প্রাক্-সমাজতন্ত্রী ধরনের চেতনার 'নানা অবশিষ্টের' জের, খোদ সমাজতন্ত্রে তা উদ্ভবের কোন অবজেকটিভ ভিত্তি নেই। সত্যিই কি তাই? এ কথা ভাল বুঝে যে, সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রে মানবিক হেতুর ভূমিকা ক্রমবর্ধমান, এ ভোলা চলে না যে, সুনির্দিষ্ট কোন কোন পরিস্থিতিতে সমাজের ভাগ্যের ব্যাপারে একক ব্যক্তিত্বের উপর প্রচণ্ড সামাজিক দায়িত্ব বর্তাতে পারে, তা পরিণত হয় নতুন নতুন সম্পর্কের

জন্য সংগ্রামের স্বকীয় ধরনের 'ধ্বজাবাহীতে', নতুন যুগের মূর্ত-প্রতীকে। তবে এই পরিস্থিতিরও মূলে রয়েছে শাসন-ক্ষমতার রোজকার চেতনায়, শাসন-ক্ষমতার খোদ উৎসে রূপান্তরিত হবার, প্রতীক ও প্রতীকী বস্তুর মধ্যে মিলের সম্ভাবনা। তবে সমাজতান্ত্রিক চেতনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপে স্বেচ্ছাচারী চেতনাকে গণ্য করাও বেঠিক। খুব সম্ভবত এ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেতনা গড়তে না দেওয়ার প্রমাণ। একদা ভ. ব্লস সমীপে এক পত্রে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন : 'কমিউনিস্টদের গোপন সমাজে এঙ্গেলস ও আমার প্রথম যোগদান ঘটেছিল এই অত্যাবশ্যক শর্তে যে, সংবিধি থেকে সেই সবকিছু বর্জন করা হবে, স্বেচ্ছাচারিতার সামনে কুসংস্কারী ভক্তি প্রদর্শনে যাকিছুই সাহায্য করে।'* রাজনৈতিক নেতার আচরণের আদর্শ হল লেনিনের নম্রতা। সোভিয়েত দেশে অধুনা ঘটমান সমাজ জীবনের সব দিকের আমূল পুনর্গঠনের (পেরেস্ত্রোইকার) অত্যাবশ্যক দিকটি হল যেমন 'উপর মহলে', তেমনই 'নিচের মহলে' স্বেচ্ছাচারিতার সমস্ত প্রকাশ প্রত্যাখ্যান করা।

৪। নানা ধরন অনুযায়ী...

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে পুরাকালে মানবজাতি যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। স্বাধীন কাজকর্মের

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৩৪, পৃঃ ২৪৩ (রুশ সংস্করণ)।

ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। নিজের অচ্ছেদ্য কর্তব্য রূপে সে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় রূপে যুক্তির শরণাপন্ন হত। নিজের নানা অধিকার ও কর্তব্য সে উপলব্ধি করত শুধু তার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাপারেই নয়, বরং গোটা মানবজাতির ব্যাপারে।

তবে জগতে নিজের স্থান, জীবনপথ অনুসন্ধানরত ব্যক্তি বিশেষের সামনে একই সঙ্গে দেখা দেয় অসংখ্য সমস্যা, যেগুলির মীমাংসা — মানুষের স্বাধীনতার পথ ধরে। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ ধরে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অত্যাবশ্যক শর্ত।

মধ্যযুগে, সামন্ততন্ত্রের আমলে মানুষের মনে উদ্বেগ-জাগান সব সমস্যা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সমস্যার আকার নিয়েছিল। খ্রীষ্টিয় ভাবাদর্শের প্রভুত্বের যুগে ভাগ্যের — যা বদলের ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই — সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের প্রশ্ন বুঝি-বা উধাও হয়েছিল : তমসাচ্ছন্ন, অন্ধ অদৃষ্টের বদলে এসেছে ঐশ্বরিক পূর্বদৃষ্টি। জগতের অপূর্ব সুঠাম খ্রীষ্টিয় চিত্রে মানুষকে দেওয়া হয়েছে এক বিশেষ, শুধুমাত্র তার জন্যই নির্ধারিত এক জায়গা। জগতে আকস্মিক বলে কিছু নেই, সবই অখণ্ড এক নিয়ন্ত্রক নীতি — ঈশ্বরের অধীন, যাঁর মধ্যেই রূপলাভ করেছে পরম জ্ঞান, পরম উন্নতি, সর্বোচ্চ মঙ্গল।

নিজ স্রষ্টা — ঈশ্বরের অনুরূপ বলে মানুষকে ঘোষণা করা হয়। মানুষ — 'সৃষ্টির বিজয়মাল্য'। পাথরের

শুধু অস্তিত্ব আছে, উদ্ভিদের শুধু অস্তিত্বই নেই, তার এমনকি প্রাণ আছে, যদিও কোন অনুভূতি ক্ষমতা নেই। পশুর অনুভূতি ক্ষমতা থাকলেও, যুক্তি-ক্ষমতা নেই। একমাত্র মানুষেরই অস্তিত্ব, প্রাণ ও অনুভূতি ক্ষমতা আছে, অন্য আরও ঐশ্বরিক সৃষ্টির মতো তার আরও আছে বোঝা ও চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা, সে হল 'দেবদূতের কুটুম'। শুধু এই ঐশ্বরিক উপহার বিকাশের কল্যাণেই মানুষ জগতে তার কর্তব্য পালন করতে, 'উদ্ধার' লাভ করবে। খ্রীস্টধর্ম অনুযায়ী, গোটা জগৎ এই 'উদ্ধার নাটকের' কবলে, তবে শুধু মানুষই তা অর্জনে সক্ষম। মধ্যযুগীয় ক্যাথিড্রালের স্থপতি তাকে বুঝি-বা জগতের নমুনা করে তোলে আর তা করে আকাশপানে, ঐশ্বরিক কৃপার প্রতি সচেষ্ট হয়ে।

সুতরাং ঐশ্বরিক সারবস্তুর অধিকারী মানুষ যথার্থই ঐশ্বরিক পরক্রমেরও অধিকারী। তার আর ভাগ্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে লিপ্ত হবার দরকার নেই, যেহেতু সে নিজে — নিজ ভবিষ্যতের স্রষ্টা, এ কারণে কী? মানুষের মধ্যযুগীয় চরিত্র মোটেই খুব একটা আশাবাদী নয়, আর এখানে আমরা তার একটি মাত্র দিকের কথা বললাম।

মনে হতে পারে, মানুষের পক্ষে বুঝি-বা সব রহস্য উন্মুক্ত হয়েছে। অযথাই মধ্যযুগে অসংখ্য বিশ্বকোষ, জ্ঞান 'ভাণ্ডার' রচিত হয় নি, যেগুলি ছিল চূড়ান্ত জ্ঞানের দাবিদার, লেখা হয়েছিল 'বিশ্ব ইতিহাস', অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মানবজাতির

গোটা পথ যা উন্মুক্ত করেছিল। এমনকি ভূমির দেশজনিত অবস্থান, মানবজাতির জন্মভূমি মানুষের অসাধারণ, মহাকাশীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণস্বরূপ ; যেহেতু ভূখন্ডকে বিবেচনা করা হত বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্র রূপে !

তবে মানুষের প্রতি, তার যুক্তির সম্ভাবনার ব্যাপারে বিশ্বাস তারই সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টিয় ধর্মবিদদের দ্বারা সীমিত হয়েছিল। জগৎকে বোঝা হত সৃষ্টির জগৎ রূপে, যার শেষ দেশ ও কালে। তবে তারই সঙ্গে এই শেষ জগতে মানুষের পূর্ণতর রূপলাভের সম্ভাবনা — সীমিত। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম সাদামাটা যুক্তি নয়, বরং বিশ্বাস দ্বারা চালিত যুক্তি। এ ক্ষেত্রে জগৎ সম্বন্ধে চেতনালাভ পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে ফারাক বিস্তর।

যেহেতু জগতের অস্তিত্ব আপনা-আপনি নেই, যেহেতু তা ঈশ্বর-লিখিত গ্রন্থের অনুরূপ, যেহেতু এই জগতের যেকোন পদার্থের অধিকতর পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত চেতনালাভ সম্ভব শুধু সেই জায়গাটি উন্মোচনের ভিত্তিতে, স্রষ্টার সাধারণ চিন্তাধারায় যে-জায়গায় অবস্থিত কোন সৃষ্ট-বস্তু। তাই শ্রমসাধ্য পরীক্ষামূলক গবেষণা, সাধারণীকরণের উপপাদনী নানা পদ্ধতির সদ্ব্যবহার, কারণ-পরিণামজনিত যোগাযোগ অনুসন্ধান নয়, বরং ঐশ্বরিক নানা প্রোটটাইপ ও তাদের পার্থিব প্রকাশের মধ্যে সোপানভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপনই হল চেতনার লক্ষ্য। অস্তিত্বের আগে আছে সারবস্তু, এককের আগে সাধারণ, অংশের আগে

সমগ্র, ব্যক্তিগতের আগে টিপিক্যাল...। ঐশ্বরিক অদৃশ্য নানা সারবস্তুর দৃষ্টিগোচর প্রতীক রূপে গোটা পার্থিব বস্তুর প্রতি সম্পর্কই শুধু জগৎ রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়। **প্রতীকতা** — পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মধ্যযুগীয় মানুষের সম্পর্কের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগীয় চেতনায় স্বয়ং মানুষের প্রতিও এমন সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে একেবারে নিজস্ব 'মানবিক' বলে গণ্য করা হত তার সেই দিককে, যা পরম সুপার ব্যক্তিগত চরিত্রের ধারক-বাহক, জড়িত সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে। ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ঈশ্বর উপাসনার সঙ্গে শুধু যোগাযোগের কোন এক অখন্ডতা রূপে। তাই তার সমস্ত ব্যক্তিগত, উজ্জ্বল বাইরের প্রকাশ সমালোচনার কবলে পড়েছিল। মানবিক অস্তিত্বের 'নামহীন' অবস্থাকে সর্বোচ্চ সদ্‌গুণ রূপে গণ্য করা হত। অযথাই সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক বিষয়বস্তু প্রায় পুরো অনুপস্থিত নয়, আর সব আত্মজীবনী ('মুনি-ঋষিদের জীবনযাত্রাকে' এ নাম দেওয়া হলে) সেসবের নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন দেখার কোনই সম্ভাবনা দেয় না, সেগুলিতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে শুধু টিপিক্যাল ব্যাপার। মানুষের মধ্যে রূপায়িত হওয়া উচিত টিপিক্যাল, সবার পক্ষে সাধারণ নানা সদ্‌গুণ।

আমরা দেখছি যে, মানুষকে সৃষ্টির 'বিজয়মাল্য' রূপে ঘোষণা করা বাস্তব জীবনে তাকে ধর্মীয় প্রভাবের, সর্বজনগৃহীত খ্রীষ্টিয় সদ্‌গুণের বশবর্তী করে, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের

প্রকৃত কেন্দ্র হয়ে ওঠে মানুষ নয়, বরং ঈশ্বর, **নৃকেন্দ্রবাদ** — যে-ধারণা অনুসারে মানুষ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ও বিশ্বভবনের অন্তিম লক্ষ্য, বাস্তবে তা **ধর্মকেন্দ্রবাদের** আকার ধারণ করে, যার মতে ঈশ্বর হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত কেন্দ্র। একদিকে, মানুষের পার্থিব কর্তব্য — জগৎ অধিপতি হওয়া ; অন্যদিকে, — সে পুরোপুরি ঐশ্বরিক অনুকম্পার পাত্র। এইভাবেই চিহ্নিত হয় সেই বৈপরীত্যের বহিঃরেখা, ষার অনুপ্রবেশ ঘটে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জীবনের সব দিকে। দ্বৈতবাদের ভয়ঙ্কর ছায়া নিত্য বিরাজ করত মানুষের ওপর। সে নিজে ছিল নানা বৈপরীত্যের কেন্দ্রস্থল, আত্মা ও মৃতদেহ, পাপ ও সদ্‌গুণ, শেষ ও অশেষ, সাধারণ ও এককের মধ্যে সংগ্রামের মঞ্চ।

তবে প্রকৃত বৈপরীত্য (যা ব্যক্তিত্বজনিত বনিয়াদ বিকাশ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি থাকে) এবং মানুষ সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় মতবাদের অত্যাবশ্যক উপাদান রূপে মানব প্রকৃতির বৈপরীত্যকে স্বীকৃতিদানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা দরকার। মানুষের অন্তরের নিচু, তমসাচ্ছন্ন বনিয়াদের সঙ্গে তার নিত্য সংগ্রাম করা, সচেতনভাবে নিজের নানা ইচ্ছা দমন করা, শুধু কাজকর্মেই নয়, এমনকি চিন্তাভাবনায়ও পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত। ভাল ও মন্দের জগৎ-জোড়া সংগ্রাম নাটককে খ্রীষ্টধর্ম মানুষের প্রাণেও স্থানান্তরিত করে আর তা করে এই প্রচেষ্টায় যে, এর দ্বারা মানুষকে খ্রীষ্টিয় ভাবাদর্শের পুরোপুরি কবলগ্রস্ত করা যাবে।

এই 'বৈপরীত্য' মানুষের চেতনায় অনুপ্রবেশ করানোর অন্যতম এক পরিণাম হয়েছিল নিজ অন্তর জগতের প্রতি তার সুপ্রখর নজরদান, আত্মচেতনা, আত্মবিশ্লেষণ, নিজের ও অন্যদের ব্যাপারে স্বাধীন মূল্যায়নের দাবি। জাগড়িত চেতনার দরুন সৃষ্টি হয় বিদ্যমান নানা বদ্ধধারণার নিষ্পাপ অবস্থার ব্যাপারে সন্দেহ, যুক্তি দ্বারা সেগুলি বিশ্বাসের — প্রথমে ভীত, আর তারপর আরও বেশি নাছোড়বান্দা — প্রচেষ্টা। মানুষ সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় মতবাদকে খণ্ডন না করে ব্যক্তি বিশেষ তখনই সে ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত, আবেগ-জড়িত সম্পর্ক প্রকাশ করে : 'প্রকৃতির কেমন বিস্ময় এই মানুষ! যুক্তি দ্বারা কতই-না মহান! কেমন অসীম ক্ষমতারই না অধিকারী! গঠন ও চলনে কতই না সঠিক ও বিস্ময়কর! কাজকর্মে দেবদূতের কতই না ঘনিষ্ঠ! দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভগবানের কতই না ঘনিষ্ঠ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য! গোটা জীব জগতের বিজয়মাল্য! তা এই সর্বোত্তম ছাইভস্মটা নিয়ে আমার হবেটা কী!..* আলোচ্য ক্ষেত্রে এই হ্যামলেটীয় বিদ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানুষ সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় ধারণা ও তার প্রকৃত 'ব্যক্তিত্ববোধের' মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতি উপলব্ধির এক ধরন রূপে। মানুষের চেতনায় খ্রীষ্টধর্ম এ চালু করেছিল যে, উদ্ধার লাভের 'অমর জীবনের' আশা স্বয়ং তার উপর, তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের হার, তার সুকাজের

* উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ট্র্যাজেডি। সনেট। 'চিরায়ত সাহিত্য' প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৮, পৃঃ ১৬৭-১৬৮ (রুশ সংস্করণ)।

উপর নির্ভরশীল। এর থেকেই প্রবাহিত হয় ব্যক্তি বিশেষের অন্তর জীবনের প্রবল আবেগ-ধর্মিতা, সে চেষ্টা করে, কষ্ট ভোগ করে, কাজ করে। সে সমদূরত্ব বজায় রাখে যেমন স্টোইকসদের (গ্রীক শব্দ stōikos) অলিম্পিয়া ধরনের শান্ততা থেকে, যারা সমস্ত যাতনা ও ক্ষতির প্রতি, ভাগ্যের সমস্ত আঘাতের প্রতি উদাসীন থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তেমনই হেডোনিজম তথা ভোগবাদ থেকে (গ্রীক শব্দ hēdonē – ভোগ করা থেকে), তেমনই অ্যারিস্টটলের কেরেনাবাদের সন্তুষ্টি লাভের পেছনে ছোটা থেকেও। সারা জীবন সে নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যের বশবর্তী— পার্থিব আনন্দ নয়, বরং চিরসুখ অর্জন। তবে ঠিক যেমন মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্টদের ক্রিয়াকলাপের ফলে রসায়ন বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল, তেমনই মায়াবী লক্ষ্য তথা চির উদ্ধারলাভের পেছনে ঘোড়দৌড়ের ফলে মানুষের মধ্যে লক্ষ্যমুখিতা, ইচ্ছাশক্তির গুণাগুণ, সুবিকশিত আত্মমূল্যায়ণ, আবেগ-ধর্মিতা, আত্মনিরীক্ষণ ও প্রতিফলন ক্ষমতা গঠনে সাহায্য করা হয়েছিল।

সুতরাং, মধ্যযুগে ব্যক্তি যে অবস্থায় ছিল, তা ছিল চরম পরস্পর-বিরোধী। একদিকে, বিকাশলাভ করছে মানুষের অন্তর্জগৎ, স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার ক্ষমতা, অন্যদিকে, মানুষ — 'ঈশ্বরের দাস'। এই পরিস্থিতিই উন্মোচিত হয়েছে দস্তয়েভ্স্কির 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ' উপন্যাসের মহান ধর্ম-আদালতের বিচারক সম্বন্ধে উপাখ্যানে : 'মানুষের পক্ষে এমন ব্যথাতুর আর কিছুই নেই, যেমন তার বিবেকের

স্বাধীনতা, তবে এর থেকে বেশি যাতনাদায়কও আর কিছু নেই। পৃথিবীর মাটিতে আছে তিন শক্তি, মাত্র তিন শক্তি, যুগ যুগ ধরে যা এইসব স্বল্পোশক্তির বিদ্রোহীর বিবেককে জয় ও বন্দী করতে পারে, তাদের পক্ষে সুখ — এই তিন শক্তি : বিস্ময়, গোপনতা, প্রভাব।'*

মধ্যযুগে ব্যক্তি বিশেষের আত্মিক জগতের জটিলতা ও বৈপরীত্য নানা সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেও জড়িত ছিল। সামন্ত সমাজ হল সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ। কোন সম্প্রদায়ে — সামাজিক গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যার অর্থনৈতিক অবস্থান হল আইনসিদ্ধ, এবং তৎসহ সামাজিক চেতনার বিভিন্ন আকারে তা উত্তরাধিকার রূপে হস্তান্তরিত হয়। নিজ সম্প্রদায়ে ব্যক্তি বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হয়, 'মিলেমিশে একাকার' হয় সুস্থায়ীভাবে ; সম্প্রদায়ে তার সংযুক্তি — কোন সামাজিক কাজ নয়, সামাজিক ভূমিকাও নয়, তার সম্প্রদায়ী সত্তা নির্ধারণ করে তার সমগ্র জীবনযাত্রার ধরন। সামন্ত সমাজের মানুষ — এ হল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। ধর্ম এখানেও চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে না। তার সমাজীভবনের প্রথম শর্ত হল মানুষের খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে আসা। জীবন ছিল একেবারে পুঙখানুপুঙখ রুটিনমাফিক, সম্প্রদায়ী অন্তভুক্তির গণ্ডির পরিসরে ছিল সীমিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ছিল নিজস্ব এক 'সদ্‌গুণাবলী' ব্যবস্থা।

* ফ. দস্তয়েভ্‌স্কি। রচনাবলী। খণ্ড ৯, মস্কো, ১৯৫৮, ৩২০-৩২১ পৃঃ (রুশ সংস্করণ)।

পরিবার, পল্লী গোষ্ঠী, গির্জায় যাতায়াত, সম্প্রদায় — সে সময়ের মানুষের এই ছিল সামাজিক যোগাযোগ চক্র। এইসব যোগাযোগের চরিত্র ছিল প্রভুত্ব — বশবর্তিতা, প্রথমে — পরিবার প্রধানের কাছে বশবর্তী থাকা, তারপর — বহু বছরের শিক্ষালাভ প্রথা, সিনিওরের প্রতি ভাসাল সম্পর্ক, রাজা-প্রজা সম্পর্ক। ব্যক্তিগত সম্পর্ক চলত ধর্মের মাধ্যমে। সামন্ত সমাজে সবকিছুই অর্থে পরিপূর্ণ, প্রতিটি ভঙ্গি, আচার প্রতীক-ধর্মী, তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় ধর্ম দ্বারা — ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ রূপে। মানব সমাজ বুঝি-বা ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতের খুদে এক মডেল। সে সময়কার সামাজিক বিশ্বাস-প্রতীকটি বর্ণিত হয়েছে খ্রীষ্টিয় ধর্মগুরু পাভেল কর্তৃক করিন্থবাসীদের উদ্দেশে প্রথম বাণীতে: 'যাকে যা উপাধি দেওয়া হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক্'।* তবে এতেও আরও একটি বৈপরীত্য নিহিত আছে, যেটি তার থেকে কম গভীর নয়, যা উপরে ইতিমধ্যেই সূত্রীবদ্ধ হয়েছে মধ্যযুগীয় মানুষের স্বাধীন ও একই সময়ে সম্পূর্ণ পরাধীন অবস্থা রূপে। ঈশ্বরের সামনে সবার সমতার পাশাপাশি থাকে 'পার্থিব' সামাজিক অসমতা, যা রূপলাভ করে অনড় সামাজিক সোপান প্রথার মাধ্যমে।

তবে মধ্যযুগীয় মানুষ তার 'একপেশে' ইতিহাস-বিরোধী অভিক্ষেপণের তুলনায় ছিল অনেক বেশি

---

* করিন্থবাসীদের উদ্দেশে প্রথম বাণী, ৭,২০, বাইবেল, মস্কো, ১৯৮৩, পৃঃ ১২৫০ (রুশ সংস্করণ)।

জটিল। তার বিশ্ববীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় মানুষের সক্রিয়, সৃজনী প্রকৃতি উপলব্ধির অঙ্কুর।

মানুষের নানা দক্ষতা কিসের দ্বারা ফুটে ওঠে ও পূর্ণতর রূপলাভ করে? অবশ্যই সক্রিয় শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপে। তবে সুবিদিত যে, খ্রীস্টধর্মে শ্রমকে বিবেচনা করা হয় সেই 'আদি পাপের' শাস্তি রূপে, আদিকালে যা করেছিল প্রথম মানুষদ্বয় — আদম ও ইভ। উপকথা অনুসারে, যীশুখ্রীস্ট কাজকর্ম করতেন না। ভগবানের আসেপাশে মানুষের থাকা, তাঁকে ভক্তি করার মূল্যায়ন করা হত রোজকার শ্রমের অনেক উপরের ব্যাপার রূপে। এটুকু স্মরণ করাই যথেস্ট হয় যে, বাইবেলের উপকথা অনুসারে, যীশুখীস্ট্রের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে কর্মী মার্ফার কাজকর্মের চেয়ে মেরীর চিন্তাশীল মঙ্গলকামনার তিনি বেশি মূল্য দিতেন।

তবে শ্রমের প্রতি খোদ শ্রমজীবীদের সম্পর্ক ছিল ভিন্ন ধরনের। সামন্ত সমাজের অর্থনীতি শুধু জোরজুলুমের মধ্যেই নিহিত নয়। তাতে দেখা দিতে শুরু করে অর্থনৈতিক আগ্রহের নানা উপাদান। শ্রমকে আর ক্লেশদায়ক প্রয়োজনীয়তা রূপে নয়, বরং বৃত্তি রূপে বিবেচনা করা হয়। সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে খ্রীস্টধর্ম শ্রমের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে এক ধর্মীয় বাহানা খোঁজায় সচেস্ট ছিল, সারবস্তুর বিচারে যা ছিল খ্রীস্টধর্মের প্রাথমিক রীতিনীতির বিপরীত ধরনের। এমন স্বয়ং ভগবান — প্রথম

কর্মী, 'জগৎ-স্থপতি'। মধ্যযুগীয় ক্যাথিড্রালগুলির রঙিন প্যানেলগুলি চিত্রিত হয়েছিল শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনের টুকরো-চিত্র দ্বারাই নয়, বরং মেহনতী নানা জীবন-দৃশ্য দ্বারাও। কর্মী, কারিগর বুঝি-বা সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একসারিতে স্থানলাভ করেছিল। হস্তশিল্পীদের কর্মশালায় ছিল নানা স্বর্গীয় পৃষ্ঠপোষক। শ্রম হল আত্মা উদ্ধারের অন্যতম এক পথ। মধ্যযুগীয় বিষয়বস্তুর পরিশিষ্টস্বরূপ ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁন্স তাঁর 'মাতামেরীর বাজিকর' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন, কীভাবে এক সাধারণ বাজিকর বার্নাবে পাদ্রি হয়ে উঠে মাতামেরীর সেবার একমাত্র পথ রূপে দেখেছিল নিজ নৈপুণ্যের পূর্ণতর রূপদান এবং নিজ কসরৎ দক্ষতা ও বাজিকরের নৈপুণ্য মাতামেরীর প্রতি উপহারস্বরূপ প্রদান করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজার বেদীর সামনে কাটাত। প্রকৃতপক্ষে বার্নাবে সেবা করত শ্রমের প্রতি, সৃজনকর্মের প্রতি মানব-দক্ষতার। সে মাথানত করত মানুষের নানা সম্ভাবনার উদ্দেশে, যেহেতু সৃজনী ক্রিয়াকলাপ হল মানুষের খোদ সারবস্তুর প্রকাশ। তবে তার এই খেল্-এ সে মাথানত করে নিজস্ব সৃজনী প্রকৃতির উদ্দেশে নয়, বরং কোন এক স্বর্গীয়, তার মাথার উপরের শক্তির উদ্দেশে। যেকোন সৃজনকর্মের পাশাপাশি দেখা দেয় কৃতকর্মের জন্য গর্ববোধ, আর এ বোধ খ্রীষ্টিয় আপসের বিপরীত-ধর্মী। তাই মধ্যযুগে সৃজনী ক্রিয়াকলাপের প্রতি সম্পর্ক ছিল দুমুখো, পরস্পর-বিরোধী ধরনের ভগবানের প্রতি আপসী সেবা এবং

মনুষ্য, পার্থিব ‘গর্ববোধের’ মধ্যকার সীমারেখা প্রচণ্ড চঞ্চল, সৃজনকর্মের দশা হয় কখনও-বা উদ্ধারলাভের স্বর্গীয় পথ-সংলগ্ন, আবার কখনও-বা — যমালয়ের কুক্ষিগত। উইলিয়াম গোল্ডিং-এর ‘শিখরদেশ’ উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে এক ক্যাথিড্রাল নির্মাণকারীদের, স্রষ্টাদের অনুভূতির গোটা রামধনুর রঙ, যে-ক্যাথিড্রাল তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল কখনও-বা ‘কেল্লার’, আবার কখনও-বা ভগবানের উদ্দেশে কঠোর উপাসনার প্রতীক। শ্রমের প্রতি এমন আধা, পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক আত্মিক ক্রিয়াকলাপের সামাজিক মূল্যায়ণেও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

খ্রীষ্টিয় বিশ্ববীক্ষা অনুসারে আত্মিক ক্রিয়াকলাপ হল মানুষের মধ্যে জ্বলমান ‘ঈশ্বরের এক স্ফুলিঙ্গ’। তাই তাকে ব্যক্তি বিশেষের অবিচ্ছেদ্য, অন্তরের এক অঙ্গ রূপে, তার নিজস্ব প্রচেষ্টার ফল রূপে গণ্য করা হত না। বিজ্ঞতা, প্রতিভা — এ হল স্বর্গ প্রদত্ত ঐশ্বরিক উপহার। তাই বহুকাল ধরে শিক্ষক, কবি, সঙ্গীতকারের মেহনতের কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না : তুই যার মালিক নস্, তার জন্যে কি তোকে মূল্যে দেওয়া চলে? মধ্যযুগে তাই নামহীন শিল্প রচনার সংখ্যা এত বেশি : প্রকৃত রচয়িতা হলেন ঈশ্বর এবং তাঁর লেখক-পরিচিতি প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই।

আর শুধু লেখক-পরিচিতির অধিকারই সঙ্গে সঙ্গে নিজ পথ যে করতে পেরেছিল তাই নয়। বহুকাল ধরে মানুষের নিজের ব্যাপারে ‘সৃজনকর্মীর’ কোন

অধিকারও ছিল না। ব্যক্তি বিশেষ হল নিজের অবিকল এক সত্তা, যেহেতু ঠিক এ ক্ষেত্রেই সে তার অতীত ও বর্তমানের নানা কাজকর্মের ব্যাপারে দায়িত্বসম্পন্ন। তবে নিজের সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের নানা ধারণার বৈশিষ্ট্য শুধু নিজের সঙ্গে নিজের অবিকল মিলের অনুভূতিই নয়, বরং আত্মউন্নতিও। বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন, প্রাপ্তবয়স্কতা, বার্ধক্য — প্রত্যেক বয়সের আছে নানা মূল্যবোধ ও স্বার্থের এক বিশেষ চক্র, জগতের প্রতি, লোকজনের প্রতি, জীবন ও মৃত্যুর প্রতি বদলায় সম্পর্ক। রুক্ষ ভাষায়, বাল্যকাল যে কী, মধ্যযুগের মানুষ তা জানত না। দেবদেবীর আইকন মূর্তিতে এমনকি ঈশ্বর-শিশুর চিত্রও সাধারণত ছিল শিশুর নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ছোট কপি। ব্যক্তি বিশেষ হল 'স্থবির'। তবে একই সময়ে সে হল 'খণ্ড-বিখণ্ডিত', নানা কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতির অদ্বিতীয় এক ব্যক্তি সত্তা সে নয়। সে নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করে এক জাতীয় সাধারণ শক্তিসমূহের, সাধারণ মানবিক গুণাগুণের — নৈতিক সৎ গুণ ও পাপের, অহংকার ও আপসের, কিপ্টেমি ও উদারতার, বিজ্ঞতা ও বোকামি, ইত্যাদির সংগ্রাম ক্ষেত্র রূপে। সময় সময় আমরা মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সাহিত্যের বিমূর্ত চরিত্রকে গ্রহণ করি একান্ত নিজস্ব, অদ্বিতীয়ের প্রতিফলনে অতীত যুগের শিল্পীর এক ধরনের অক্ষমতা রূপে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মানুষের বহিরাকৃতির এমন সুনির্দিষ্ট 'মূর্তিহীন' প্রকাশ হল সাধারণ গুণাগুণের ধারক-বাহক রূপে

মানুষ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রকাশস্বরূপ, যে-গুণাগুণের একটি হল আলোচ্য মানুষের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি বিশেষের ধারণা প্রায়ই সদৃশ, মধ্যযুগে তার দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার নানা রূপের প্রতিফলন ঘটত।

প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন উত্থাপন খুবই যুক্তিসঙ্গত : মধ্যযুগে খোদ ব্যক্তিত্ব ধারণার অস্তিত্ব ছিল কী? ব্যক্তিত্ব নামক সাধারণ ধারণার সূত্রপাত ঘটেছিল সেই প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে। তবে প্রথম প্রথম গ্রীক শব্দ 'প্রসোপোন' ও লাতিন 'পেরসোনা' বলতে থিয়েটারের মুখোশকে বোঝাত। তারপর রোমে 'ব্যক্তিত্ব' ধারণা অধিকারজনিত পরশ লাভ করে — অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যার আছে সুনির্দিষ্ট নানা অধিকার ও কর্তব্য। মধ্যযুগের আমলে 'ব্যক্তিত্ব' ধারণা নৈতিকতার পরশে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বোয়েতিয়াসের (Boëhuus, ৬ষ্ঠ শতাব্দী) ধ্রুপদী সংজ্ঞা সুবিদিত : সুষম অখন্ড এক সত্তা। ব্যক্তিত্বের মূল লক্ষণ হয়ে উঠেছিল যুক্তি। ১৩শ শতাব্দীতে টমাস আকিনাস (Thomas Aquinas) বলেছেন নিজ কৃতকর্মের ব্যাপারে ভগবানের সামনে ব্যক্তিত্বের দায়িত্বের কথা, যার অর্থ ব্যক্তিত্ব কর্তৃক স্বাধীনভাবে জীবন-পথ নির্বাচনের কথা।

সুতরাং, মধ্যযুগেই বস্তুত ব্যক্তিত্বের মূল লক্ষণ-রেখাগুলি গড়ে উঠেছিল, মানুষ কর্তৃক নিজ চেতনায় সুনির্দিষ্ট এক অগ্র পদক্ষেপ ফেলা হয়েছিল। তবে একই সময়ে গড়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বের তার অবিচ্ছেদ্য গুণাগুণ থেকে আলাদা হওয়ার, সেগুলিকে অন্য

জগতে 'স্থানান্তরন' প্রক্রিয়ারও গভীরতা বৃদ্ধি হচ্ছিল। সমাজ জীবনের সব দিকে ধর্ম যে-ছাপ সৃষ্টি করেছিল, সামন্ত সমাজে তার দরুন ব্যক্তিত্বের চরম পরস্পর-বিরোধী অবস্থা দেখা দিয়েছিল।

পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের কল্যাণে মধ্যযুগে পরিপক্ব হওয়া ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগতের অনেক পরস্পর-বিরোধিতার মীমাংসা ঘটেছিল, তবে তার দরুন নতুন নতুন, আরও বেশি গভীর পরস্পর-বিরোধিতার উদ্ভব ঘটেছিল।

৫। ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশ

পুঁজিবাদী সম্পর্ক জন্মলাভের ঊষালগ্নে মনে হয়েছিল সক্রিয়, পার্থিব মানুষের পক্ষে বুঝি-বা এক নতুন 'স্বর্ণযুগের' দিন আসছে ; এ মানুষ মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের লৌহ-শিকলের বন্ধনমুক্ত হয়েছে, স্বৈরতন্ত্রের নির্যাতনের কবলমুক্ত হয়েছে। পুরাকালের সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত (সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া মধ্যযুগে এ ছিল নিষিদ্ধ ব্যাপার) ছিল মধ্যযুগীয় নানা ঐতিহ্য, সামাজিক মাত্রা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংগ্রামের স্বকীয় ধরনের পদ্ধতিস্বরূপ। তাই ১৪শ থেকে ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পর্যায়কে, ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের গর্ভে নতুন নতুন পুঁজিবাদী সম্পর্কের অঙ্কুর জন্মের পর্যায়কে অভিহিত করা হয় রেনেসাঁসের যুগ রূপে।

মানুষ সম্বন্ধে নতুন ধারণা দেখা দিয়েছিল

নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। অতীত যুগের মানুষ সামাজিক গঠন-কাঠামোয়, সমাজে, শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে, পরিবারে সুস্থায়ী 'বন্ধনে আবদ্ধ' থাকলে, রেনেসাঁসের যুগে মানুষ ও সমাজের মধ্যে যোগাযোগ আর ততটা নির্মম ছিল না। পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশ, শহরগুলির সমৃদ্ধি, উৎপাদন সম্প্রসারণের দরুন দেখা দিয়েছিল রেনেসাঁসের যুগের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ তৎপর কারবারি, হস্তশিল্পের কর্মশালার পরিচালক, নির্বাচনে পদাসীন ব্যক্তিও (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতালির পক্ষে, তার নানা শহর-রাষ্ট্র সহ), ভাড়াটে-মজুরদের যোগানদার, মহাজনী কাজকর্মের উদ্যোক্তা, কূটনীতিক আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রাহীর দল। এমন সমাজে 'সাবেকী', পাকাপোক্ত স্থায়ী সামাজিক কর্ম, ভূমিকা বলে আর কিছু নেই, '...আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগের আত্মপ্রকাশ ঘটে তার নিজস্ব লক্ষ্যাদির প্রয়োজনে শুধু মাত্র মাধ্যম রূপে, বাইরের প্রয়োজনীয়তা রূপে।'*

মানুষের জীবনের ক্রিয়াকলাপের সীমানার পরিসর আগে বাড়ছে, বদলাচ্ছে। প্রাকৃতিক অর্থনীতি-পরিচালনই যখন ছিল প্রভুত্বকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেই মধ্যযুগে নানা বসত এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ছিল অনিয়মিত, রাস্তাঘাট খারাপ, ভ্রমণকে গণ্য করা হত সুদীর্ঘ ও বিপজ্জনক কাজ রূপে। এলাকা, আয়তন

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪০, অংশ ১, পৃঃ ১৮ (রুশ সংস্করণ)।

মাপার পদ্ধতি ছিল পুরোপুরি ঠিক ধরনের নয় : কনুই, বিঘৎ, আঙুলি, পা দিয়ে মাপা। সব ক্ষেত্রের জন্য একক কোন পরিমাপ পদ্ধতি ছিল না। প্রত্যেক আলাদা ভূখণ্ড মাপা নির্ভর করত তার মালিকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাদির উপর। এক টুকরো যে জমিতে মানুষ জন্মেছে এবং যার সঙ্গে তার গোটা জীবন জড়িত, তা ছেড়ে সে চলে যেতে, নিজেকে আলাদা করতে পারত না।

ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহ এল এক নতুন যুগ — মহান ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগ — আমেরিকা ও ভারত যাবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার, ম্যাগেলানের ভূ-পর্যটন ; এ সবকিছুর কল্যাণে মানুষ হাজির হল সুবিশাল সামুদ্রিক প্রান্তরে, অজানা ভূমিতে, বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করতে তাকে বাধ্য করল। মানুষ নিজেকে নতুন নতুন ভূমির বিজয়ী রূপে উপলব্ধি করতে শুরু করল। অপরিবর্তনীয় 'জীবনযাত্রা পরিবেশের' অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ ছেড়ে দেশ (দেশ-কাল অর্থে) তখন মানুষের ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য-বস্তু হয়ে উঠতে, মানুষের থেকে আলাদা হতে লাগল।

কালের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও বদলাতে লাগল। মধ্যযুগে মানুষ নিজের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারত না। খোদ তার নিজের মতোই তা ছিল ঈশ্বরের অধিকারে। সঠিকভাবে সময় মাপার, তার যত্ন নেওয়ার ও মূল্য দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না — জীবন ছিল অতীব মন্থর। কৃষিকাজের প্রাধান্যের দরুন অবস্থা এমন

হয়েছিল যে, লোকে প্রকৃতির সময় ছন্দের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নিজেকে সে সময়ের মালিক রূপে উপলব্ধি করত না। শিল্প বিকাশের সঙ্গে এক নতুন দাবি তথা সঠিক সময় জানা, তার যত্ন নেবার ব্যাপার দেখা দিল। নানা শহরের টাউনহলে বসানো হল ঘড়ি, যা দেখাত বিশ্ব সময়, গির্জার সময় নয়। পরিণামে দেখা দিল সময়ের প্রতি নতুন সম্পর্ক, যা মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার নয়, বরং যার রয়েছে একক-গুণসম্পন্ন ধারা, সব লোকের পক্ষে যা এক, যাকে সমানভাবে নানা অংশে বিভক্ত করা, সাশ্রয় ঘটানো চলে, যা উৎপাদনের, সাধরণভাবে মানুষের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের এক জরুরী হেতুতে পরিণত হয়।

দেশ — যার অধিকারী হওয়া যায়, সময় — যা মানুষকে তাড়াতাড়ি সবকিছু করতে, আরও বেশি হিতকর ও শুভ কাজ করতে বাধ্য করে — নতুন নতুন এই মূল্যবোধের উৎপত্তিই হল পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান রদবদলের প্রমাণ। মানুষ — সর্বাগ্রে হল এক সক্রিয়, কর্ম-তৎপর সত্তা, যা দেশের যেকোন অংশকে নিজ ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্যবস্তু করে তুলতে, পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে, চালু নানা ঐতিহ্য, মাত্রা, নিয়মকানুনের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিপাতে সক্ষম।

স্বাধীন স্রষ্টা-মানুষের এক চরিত্র অঙ্কন করেছেন এ যুগের অন্যতম এক চিন্তাশীল ব্যক্তি পিকো দেল্লা মিরানদোলা এবং তা শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক

ইচ্ছাশক্তির উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়ে: 'হে আদম, আমরা তোকে না দেব সুনির্দিষ্ট স্থান, না নিজস্ব ভাবমূর্তি, না বিশেষ কোন দায়িত্ব, যাতে তুই না স্থান, না মুখাবয়ব, না দায়িত্ব তুই ধারন করতে পারিস স্বইচ্ছায়, নিজ ইচ্ছাশক্তি ও নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে। অন্যান্য সৃষ্টির ভাবমূর্তি নির্ধারিত হয়েছে আমাদের দ্বারা স্থাপিত আইনকানুনের গণ্ডিতে। তুই যে কোন গণ্ডির বন্ধনেই আবদ্ধ নস্, নিজের ভাবমূর্তি তুই নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারণ করিস, আমি তোকে যে ক্ষমতা দিয়েছি তা অমান্য করে।'*

যদিও রেনেসাঁস যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অধিকাংশ ধ্যানধারণা ধর্মীয় সংজ্ঞার বস্ত্র পরিহিত, তবে সেগুলির সারবস্তু খ্রীষ্টিয় ধর্মকেন্দ্রবাদের বিপরীত ধরনের, যার কেন্দ্রে আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত কেন্দ্রে পরিণত হয় মানুষ, ধর্মকেন্দ্রবাদের পরিবর্তে আসে **নৃকেন্দ্রবাদ**। ধর্মীয় সংজ্ঞা প্রায়ই এক বহিরাবরণের কাজ করে, যাতে সুউচ্চ মানবিক সদ্‌গুণের স্বীকৃতিকেই শুধু মোড়কে মোড়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন মহান চিত্রকর রাফায়েলকে — তাঁর প্রতিভার শক্তিকে জোর দেবার অভিপ্রায়ে — অভিহিত করা হয়েছিল পার্থিব, 'নশ্বর দেবতা' রূপে অভিহিত করা হত।

---

* পিকো দেল্লা মিরানদোলা দ। মানুষের সদ্‌গুণ প্রসঙ্গে ভাষ্য। — এই বইয়ে: নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস। বিশ্ব নান্দনিক চিন্তার স্মারণিক। মস্কো, ১৯৬২, খঃ ১, পৃঃ ৫০৭ (রুশ সংস্করণ)।

মানুষের আগেকার দ্বিবিধ রূপ (মানুষ — ঐশ্বরিক আত্মা ও রক্তমাংসের দেহের ধারক-বাহক) ভেঙে চুরমার হচ্ছে। মানুষের সবকিছুই বিহ্বল হয়ে দেখার যোগ্য, সবকিছুই 'ঐশ্বরিক', যেমন আত্মা, তেমনই দৈহিক প্রকাশ। মধ্যযুগের পক্ষে বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতিতুলনাও ধুয়ে-মুছে সাফ হচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আগ্রহ, জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে বিপুল সংখ্যক আত্মজীবনী, জীবনচরিত দেখা দেবার মাধ্যমে। ঘটছে মানব দেহের পুনর্বাসন, তাও আবার কোন রূপ আদর্শ, সুউন্নত দেহের নয়, মানুষের ব্যক্তিগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ তার নিজ দেহের, সব বয়সকেই চমৎকার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে — যেমন বাল্যকাল, তেমনই প্রাপ্তবয়স্ক ও বার্ধক্যকে। এমনকি মৃত্যু ভীতিও — নিত্য যখন স্মরণ করা হত memento mori (মৃত্যুর কথা মনে রাখিস) — পৃথিবীতে সক্রিয়, সৃজনী জীবনের শুধু প্রেরণা হয়ে উঠছে।

তবে কর্মভরা, সক্রিয় জীবন — অতি অবশ্যই এ হল অন্যান্য লোকের সঙ্গে বিবাদ, অতি অবশ্যই এ হল নানান নৈতিক কর্ম। নৈতিকতার ব্যাপারে রেনেসাঁস যুগের চিন্তাবীরদের মানবতাবাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? নৈতিক ভিত্তি কি মানুষের প্রতি ভালোবাসার, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু রূপে ছিল? একদিকে, মানুষের যত বেশি মনোবল তার নৈতিক সদ্‌গুণের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল, মানুষের কর্মজীবনও তত বেশি সফল। কিন্তু অন্যদিকে — রেনেসাঁসের

চিন্তাবীরদের ধ্যানধরণায় অবাধ স্বার্থকেন্দ্রবাদের উদ্দেশে পথ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের প্রকৃতির প্রকাশ রূপে 'শক্তিশালীর অধিকারের' ধারণার উদ্ভব ঘটে। মানুষের সৃজনী স্বাধীনতার প্রকাশ রূপে 'যা চাস্ কর' — এই মানবিক মতবাদ ম্যাকিয়াভিলিজনিত আহ্বানের আকার নেয়, যা অনুসারে অদৃষ্টের গায়ে লাথি মারা দরকার, ঠিক নারীর মতো যাতে তাকে বশে আনা যায়। এইভাবেই নৈতিক ভিত্তি ও মানুষের কর্মজনিত প্রকৃতির মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হয়।

মানুষের মধ্যে কর্মজনিত ও যুক্তিজনিত ভিত্তির সামঞ্জস্যের প্রশ্ন নিজস্বভাবে সমাধান লাভ করেছিল। প্রকৃতির প্রতি নিষ্ক্রিয়-অনুধ্যানমূলক সম্পর্ক ছেড়ে সক্রিয়-পুনর্গঠনমূলকে উত্তরণ কার্য সময় সময় গড়ে-ওঠা প্রাকৃতিক-জ্ঞানের প্রকৃত সম্ভাবনাসমূহকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছিল। তাই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে ব্যবহারিকভাবে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে প্রায়শই 'পুরনো', অতীত যুগে উদ্ভূত মায়াবী-ঐন্দ্রজালিক পন্থাদির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। তাই প্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান বিকাশের পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্র, অ্যালকেমিস্ট্রি, অতীন্দ্রিয়বাদী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। ঐশ্বরিক ভবিষদ্বাণী, জ্যামিতিক আবশ্যিকতা, দার্শনিক হেতু ও চাক্ষুষ পরীক্ষামূলক তথ্যাদিকে একই সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। নানা প্রভাব ক্ষেত্রকে আলাদা করা হত না এবং ধর্ম-বিশ্বাস ও সমালোচনামূলক যুক্তির স্থান যে একাসনে হতে পারে না, এ উপলব্ধির অভাব ছিল : ইতালির দার্শনিক ম. ফিচিনো

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটোর আবক্ষমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালাতেন।

রেনেসাঁস যুগের মানুষের বিশ্ববীক্ষা — খ্রীস্টধর্ম ও পুরাকালের জের, যুক্তিবাক ও যুক্তিহীনতা, বিজ্ঞান ও মায়াকে মিলিত করার স্বকীয় এক প্রচেষ্টা। তবে এই মিলন বাস্তবায়িত হয়েছিল সর্বব্যাপী সুঠাম নানা ব্যবস্থা গড়ার আকারে নয়, বরং প্রত্যেক সংস্কৃতি, প্রত্যেক দার্শনিক ব্যবস্থা, প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্বের অধিকার স্বীকৃতির আকারে। একে অন্যের অধীনে থাকা নয়, কঠোর সোপান-ব্যবস্থা গড়াও নয়, বরং বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ধারক-বাহক রূপে অন্য লোককে বোঝার প্রচেষ্টা, অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের, নিজের সঙ্গে কথোপকথনের প্রচেষ্টা। রেনেসাঁস যুগের মানুষ — এ হল 'উন্মুক্ত' ব্যক্তি বিশেষ, যাতে একই রকমের শীলমোহরে সবাই জমায়েত হয় নি, বরং নিজের মধ্যে অসংখ্য একেবারে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ আকর্ষণে প্রচেষ্ট। রেনেসাঁস মানুষের এই 'উন্মুক্ততা', অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত আছে তার সুমহান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। ইতালির কবি পেত্রার্কার উক্তি অনুযায়ী, 'মানব হৃদয়ের চেয়ে বেশি যোগ্য আর কিছু নেই যার মহত্ত্ব কোনকিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়।'* তবে রেনেসাঁস ধরনের মানুষের মধ্যে অন্য এক

* পেত্রার্কা ফ.। রচনাবলী। মস্কো, ১৯৭৪, পৃঃ ২০২ (রুশ সংস্করণ)।

সম্ভাবনাও আছে। যা পরবর্তী নানা যুগে বাস্তবে রূপলাভ করেছিল : যেকোন দৃষ্টিভঙ্গি অস্তিত্বের অধিকার স্বীকৃতির দরুন দেখা দেয় আপেক্ষিকবাদ, যেকোন তত্ত্বের যথার্থতা বোধ রদ করা, নানা উপলব্ধি, মতবাদ, ধ্যানধারণা ও ভাবাদর্শ নিয়ে লক্ষ্যহীন খেলা, নিজেকে হারানো, ব্যক্তিত্বের বিনাশ।

যুক্তিহীনতার সঙ্গে যুক্তিবাদের, স্বার্থকেন্দ্রবাদের সঙ্গে নান্দনিক ভিত্তির অপূর্ব মহামিলন মানুষের বিকাশে সেই মুহূর্তের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল, 'সামাজিক স্বায়ত্তশাসন' লাভ করে ব্যক্তিত্ব যখন সেইসব অদৃশ্য যোগাযোগ-সূত্র পুরোপুরি দেখার অবস্থায় তখনও আসে নি, সমাজের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে যেগুলি তাকে সংযুক্ত করে। রেনেসাঁস যুগের মানুষ হল সেই শিশুর মতো, যে কিনা অতিরিক্ত কঠোর নার্সিং-এর কবল থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতায় আহ্লাদে আটখানা, অথচ তাতে যে বিপদ লুকিয়ে আছে, সেই চেতনা সে তখনও লাভ করে নি।

ধীরে ধীরে মানবতাবাদী বিশ্ব-সম্পর্কের উজ্জ্বল বুহরূপী রঙ তার বাহার হারাতে শুরু করে, টুকরো টুকরো খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেগুলি সদা আকর্ষণকারী ছিল না। গোটা ইউরোপে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা ধর্ম-আদালতের অগ্নিকুন্ড রেনেসাঁস যুগের স্বাধীন চিন্তাধারার অবসান ঘটায়। স্রষ্টা-মানুষ হয়ে ওঠে সাদাসিধে বুর্জোয়া কারবারি ; মানবদরদী ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে আসে সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপরতা।

২। নিঃসঙ্গ বোধের গোলকধাঁধায়

১। জ্ঞানদীপ্তির সুফল

ইউরোপে পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্বকারী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার দরুন সমাজ জীবনের সব দিকের পুনর্গঠন ঘটেছিল। মানুষের প্রতি সমাজের দাবিদাওয়াও বদলাচ্ছিল। রেনেসাঁসের যুগের মানুষের কাছে সব দ্বার ছিল উন্মুক্ত, সবাই তা হয়ে উঠতে পারত, সে ছিল 'ঈশ্বরের অনুরূপ' ও একই সময়ে 'দেহপ্রধান' ; এই মানুষের থেকে পার্থক্যস্বরূপ ১৭শ শতাব্দী থেকে শুরু করে অধিকতর এক রকমের, সুনির্দিষ্ট, সুসামঞ্জস্য ধরনের মানুষ গড়ে উঠতে থাকে। ধীশক্তির (যুক্তির) সাহায্যে মানুষের সব ক্ষমতা ও দাবিদাওয়ার 'তালিকা করা' হতে থাকে, সবকিছুই যে-যার জায়গা খুঁজে পায় ; মানবিক কামনার

‘বংশ ইতিহাস’ গড়ার খুব চল ঘটে। সূচিত জ্ঞানদীপ্তির যুগ — এ হল সুমহান মোহ ও একাধারে নানান আবিষ্কারের যুগ ; এ হল নতুন সমাজের, নতুন বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের আত্মচেতনার স্বকীয় ধরনের এক পর্যায়, যার আত্মপ্রকাশ ঘটে সমাজের উপরি-কাঠামোর ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া সম্পর্কের চূড়ান্ত কায়েম হওয়ার অত্যাবশ্যক পটভূমি রূপে। সে পর্যায়ের নানা যান্ত্রিক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারও নিজের প্রতি মানুষের সম্পর্কের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বারুদ, কম্পাস, লোহা-গালাই চুল্লি, যান্ত্রিক চালনা, বইছাপা — এ সবই ছিল মানুষের বিপুল সম্ভাবনার পরিচায়ক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন সম্বন্ধে, মহাশূন্য ও বিশ্বের শেষসীমা সম্বন্ধে পুরনো ধারণাদি বানচাল-করা কোপারনিকাস, গালিলেই, কেপলারের জ্যোতির্বিদ্যাজনিত নানা আবিষ্কার, উইলিয়াম হার্ভির রক্ত-চলাচল ব্যবস্থা আবিষ্কার, নিউটনীয় বলবিদ্যা সৃষ্টি, যা জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছিল এবং তার কল্যাণে নানা আবিষ্কার ব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল, ফ. বেকন ও র. দেকার্তের চেতনালাভ পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষার বিকাশ, অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা ও প্রমাণ পদ্ধতির বিস্তারলাভ, প্রাকৃতিক জ্ঞানে গণিতের সদ্ব্যবহার — এ সবকিছুই মানুষের ধীশক্তির পরাক্রমের, তার অসীম সম্ভাবনার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছিল। একই সময়ে এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনের এক প্রান্তে ধর্মীয় ভাবাদর্শ ফুলেফেঁপে উঠছিল। এ বিশ্বাস জোরদার হচ্ছিল

যে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রে মানবিক তৎপরতার বহুরূপী সমস্ত প্রকাশ হল প্রকৃতির বিশ্বজনীন নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত, বস্তুর স্বাভাবিক গতিবিধির অঙ্গ। চালু হয় 'স্বাভাবিক ধর্ম' (প্রকৃতির নিয়মই হল ঈশ্বরের নিয়ম), স্বাভাবিক (মৌলিক) অধিকার, প্রাকৃতিক মানুষের ধারণা।

জ্ঞানদীপ্তির যুগের মানুষের চেতনা সম্পর্কে আশাবাদের কোন সীমারেখা ছিল না। যুক্তি দ্বারা শুধু পারিপার্শ্বিক জগৎকেই নয়, বরং নিজেকেও উপলব্ধি করা চলে। গুনতে, সময় বাঁচাতে, মাপতে, প্রকৃতির রহস্য রপ্ত করতে শিখে মানুষ নিজেকে তার নানা ক্ষমতা, অভ্যেস, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রভু রূপে অনুভব করতে লাগল। মানুষ-নিজেই নিজের মালিক। নিজস্ব বিবেকের কন্ঠ, নিজস্ব সদ্‌গুণের অনুভূতি ছাড়া নিজের ওপর আর কোন কর্তৃত্ব, কোনও রকমের জুলুমবাজি স্বীকার না করে সে সাম্প্রদায়িক, পারিবারিক, এমনকি ধর্মীয় বন্ধন ভেঙে চুরমার করেছিল। পুঁজিবাদ তার আদি পর্বে ছিল এমন এক সমাজ, যার প্রয়োজন ছিল সক্রিয়, কর্ম-তৎপর, আত্মচেতনালব্ধ, অবাধ নির্বাচনের অধিকারী ব্যক্তিত্বের।

উন্নয়নশীল পুঁজিবাদের এইসব অবজেকটিভ দাবিদাওয়া উপলব্ধি করার ধরনে পরিণত হয়েছিল মানুষের প্রতি তথাকথিত **নৃতাত্ত্বিক পন্থা** (গ্রীক শব্দ anthropos — মানুষ, logos — শিক্ষা থেকে)। মানুষ সম্বন্ধে এ হল এক বিমূর্ত, ইতিহাস-বহির্ভুত উপলব্ধি, যা সামাজিক সম্পর্ক থেকে মানুষের সারবস্তুকে উপস্থাপিত

করে না, উল্টে বরং সামাজিক জীবনের ব্যাখ্যা দেয় অমর 'প্রকৃতি-প্রদত্ত' মানবিক গুণাগুণের ভিত্তিতে। জৈবিক উৎপত্তির পরম রূপদানের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক পন্থার কোন মিল নেই, মানুষের 'স্বাভাবিক প্রকৃতির' ধারণা — তার ওপর জবরদস্তিভাবে চাপানো নানা মাত্রা, নিয়ম ও আইন থেকে তার মুক্ত থাকার, অবজেকটিভ থাকার ব্যাপারকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা। নৃতত্ত্বের মতাবস্থান অনুসারে 'মানবিক প্রকৃতির' মূল ভিত্তি সমাজ নয়। বরং উল্টো ; ব্যক্তি বিশেষের কোন এক 'সাদামাটা যোগফল' রূপে সমাজ কাজ করে সেইসব আইনানুসারে যেগুলি নির্ধারিত হয়েছে 'মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি' দ্বারা।

এই 'স্বাভাবিক প্রকৃতির' রূপটি কেমন? মানুষ — এ হল বুদ্ধি, হৃদয় ও অনুভূতির জীবন। নৃতত্ত্ব মতবাদের অধিকতর পরবর্তী কালের সমর্থক জার্মান দার্শনিক ল. ফয়েরবাখ মানুষের সারকথার এই সংজ্ঞা দেন: 'সুসম্পূর্ণ মানুষ চিন্তার শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতির শক্তির অধিকারী। চিন্তার শক্তি হল চেতনার জগৎ, ইচ্ছাশক্তি — চরিত্রের বিক্রম, অনুভূতির শক্তি — ভালোবাসা।'* ১৭শ ও কতকটা ১৯শ শতাব্দীর নৃতত্ত্ব মতবাদ হল যুক্তিসিদ্ধ ধরনের। যুক্তিকে তা মানুষের মূল স্বাভাবিক ক্ষমতা রূপে স্বীকার করেছিল।

তবে যুক্তি — মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির 'সর্বোচ্চ

---

* ফয়েরবাখ ল.। রচনাবলী। দার্শনিক রচনা। খঃ ২, মস্কো, গস্‌পলিৎইজদাত, ১৯৫৫, পৃঃ ৩১-৩২ (রুশ সংস্করণ)।

চালক' হলে, মানুষ ও মানবজাতির সব দুর্দশা ঘটে থাকে যুক্তিহীনতা থেকে, তার এই ক্ষমতা বিকাশলাভ না করার দরুন। তাই মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি — সমাজে 'প্রচলিত রীতি শিথিল করার', যুক্তিশক্তির ভিত্তিতে সমাজের রদবদলের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত। মানুষের সব শিক্ষা — সারবস্তুর বিচারে এ হল তার অন্তরে স্বাভাবিক ভিত্তির প্রস্ফূরণ ঘটানো, বাইরের জুলুমবাজি প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা। সামাজিক সমতার ঐকান্তিক সমর্থক ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী জ্ঞান প্রচারক রুসো মনে করতেন যে, আদি সমাজে ছিল মানুষের তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থা, 'স্বাভাবিক (মৌলিক) অধিকার', যার আমলে লোকে ছিল সমান ও স্বাধীন, এবং,... পরস্পরের থেকে অনির্ভরশীল। হ্যাঁ, এমন বন্ধনও লোকেদের জড়িত করতে পারে, যা কোনকিছুরই অধিকারী নয়। অন্যকথায়, রুসোর মতে, (আলোচ্য ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ মানুষের প্রতি নৃতাত্ত্বিক আচরণের পক্ষে টিপিক্যাল), আদিম লোকে বাস করত পুরোপুরি বিচ্ছিন্নভাবে, এক ধরনের রবিনসন ক্রুশোর মতো দ্বীপে। এমনকি বলা চলে যে, খোদ মানুষ, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, — স্থলভাগস্বরূপ মানবজাতির অংশ নয়, বরং এক দ্বীপ, অনতিক্রমণীয় অন্তরায় দ্বারা যা স্থলদেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। আদিম সমাজে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করা হলে (উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে), এমন দৃষ্টিভঙ্গির অতি সরলতা চাক্ষুষ হয়ে ওঠে। রুসোর মতধারা — মানুষের অতীতের,

‘স্বর্ণযুগের’ ততটা আদর্শ রূপদান নয়, যতটা বুর্জোয়া সমাজের, অবাধ প্রতিযোগিতার সমাজের ক্রিয়াকলাপের এক ধরনের সুউচ্চ প্রশংসা (মোহভরা আকারে) ; এ হল সেই সমাজ, যেখানে মানুষের প্রয়োজন হল সেইসব অসংখ্য সামাজিক যোগাযোগ থেকে মুক্তিলাভ করার, অর্থনৈতিক উদ্যোগের পথে যেগুলি তাকে বাধা দেয়। জ্ঞান প্রচারকদের ভাবাদর্শ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন, ‘প্রকৃত মানুষ স্বীকৃতি লাভ করে শুধু **স্বার্থপর** ব্যক্তির চরিত্রে।’*

রুসো মনে করতেন ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ হল লোকেদের স্বাভাবিক সমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যা লঙ্ঘিত হয়েছে সুসম্পূর্ণতার উদ্দেশে সেই মানবিক ক্ষমতা বিকাশের ফলে, যখন একদল লোকের বিকাশ অন্যদের বিকাশকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছিল। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সমতা — এ হল ‘সামাজিক বোঝাপড়ার’ সমতা। অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষকে স্বাধীন থাকতে হল প্রয়োজন হল সামাজিক অখণ্ডতার পক্ষে মানুষের একাংশ অধিকার বাজেয়াপ্ত করা। তবে নিজের স্বাভাবিক অবস্থান খুইয়ে মানুষ বজায় রাখে সবচেয়ে মূল্যবান তথা নিজের স্বাধীনতা ও মালিকানার অধিকার।

এই তত্ত্বের সরলতা, যুক্তিসিদ্ধতা, মানবিকতার ব্যাপারে সে সময়কার বিখ্যাত মনীষীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তবে তাতে তখনই হাজির ছিল পুঁজিবাদী সমাজের ভাবী নানা পরস্পর-বিরোধিতার ঝলকানি।

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ১, পৃঃ ৪০৩ (রুশ সংস্করণ)।

সর্বাগ্রে, আসুন নজর দেওয়া যাক্ রুসোর বক্তব্যে স্বাধীনতা ও মালিকানার অধিকার ধারণাদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী অবস্থানের প্রতি। 'সামাজিক চুক্তি' সম্পাদন করে মানুষ অনেককিছুই বর্জন করতে পারে, শুধু নিজের এই দুই 'পবিত্র' অধিকার ছাড়া। 'হওয়া' (স্বাধীন, সুখী, সমাধিকারী) এবং 'আছে' অধিকারী হওয়া — এই দুই ধারণা মানুষের নৃতাত্ত্বিক মতবাদে পাশাপাশি অবস্থিত।

মানুষ শুধু জমিজমা, বাড়ি ও সম্পদেরই 'অধিকারী হতে' পারে না। আর তার নিজস্ব প্রকৃতিও বুঝি-বা থাকে তার চির মালিকানায়। আর যেহেতু মানুষ আক্ষরিক অর্থেই নিজের ব্যক্তিগত প্রকৃতির 'অধিকারী', তাই সে নিজেই তার সর্বোত্তম বণ্টনকারী। 'সামাজিক চুক্তি' সম্পাদন করে সে এক লাভজনক লেনদেন সম্পন্ন করে — অন্যান্য অধিকার রক্ষার আশ্বাসের বদলে নিজের কিছু অধিকার বর্জন করে।

তবে এ লেনদেন যে সদা প্রতারণা বিনা ঘটবে, তার গ্যারান্টি কোথায়? সমাজ যে মানুষের কাছ থেকে খুব বেশি চাইবে না, সে গ্যারান্টি কোথায়? আর সে চাওয়া ঠিক জনগণের রূপকথার দৈত্যের দাবির মতো, পার্থিব নানা মঙ্গলের জন্য মানুষের কাছ থেকে যে সাধারণত কম-বেশি কিছুই নয়, বরং সবচেয়ে মূল্যবান তথা মানুষের প্রাণের দাবি জানায়।

পুঁজিবাদের পরবর্তী গোটা ইতিহাসই দেখিয়েছে, মানুষ কর্তৃক নিজস্ব সারবস্তুর অধিকারী হওয়া —

ধারাবাহিক মোহ মাত্র। নিজের নিঃসঙ্গতাহীন সারবস্তুর অধিকারী হওয়ার বদলে মানুষের হাতে রয়ে গেছিল শুধু তার ফাঁকা 'বাইরের' আবরণ। 'হওয়া' ও 'আছে'র সামঞ্জস্য অচিরের নিজস্ব ভাঁওতা খুঁজে পেয়েছিল।

নৃতত্ত্ববাদের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের সারবস্তুর এমন ধারণার চেতনাবোধজনিত উৎসটি নিহিত রয়েছে সে সময়কার সাধারণ নানা প্রণালী ব্যবস্থায়। প্রাকৃতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুবাদ ধারণার প্রতিষ্ঠালাভের দরুন সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রসারলাভ করেছিল। 'সামাজিক পরমাণুবাদ', 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' সে সময় কোন রূপকবাক্য ছিল না, বরং সমাজের প্রতি আচরণের সারবস্তুকে প্রকাশ করত। তদানুসারে, মানুষও — এক 'সামাজিক পরমাণু', নানা অমর ও অপরিবর্তনীয় গুণের সমষ্টি। একদিকে, এমন পন্থা সে সময়ের পক্ষে ছিল যথেষ্ট প্রগতিশীল, যেহেতু লোকেদের সমতার ভিত্তি স্থাপিত করত। সমস্ত সামাজিক অন্তরায় ধ্বংসের ব্যাপারে ছিল ভাবাদর্শগত প্রেরণাস্বরূপ। পুরনো, সামন্ত সমাজের নানা জেরকে গণ্য করা হত মানুষের 'চিরকালীন' প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিসম্পন্ন, এক ধরনের ভিনদেশী ব্যাপার রূপে। আবার অন্যদিকে, এমন পন্থা ছিল ব্যক্তিত্ব ও সমাজের পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যাপারে বিকৃত ধারণার প্রমাণস্বরূপ। মানুষের 'সারবস্তুজনিত নানা শক্তি' — প্রতিটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে হাজির নানা গুণাগুণ। যেহেতু এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ — শুধু সাদামাটা যোগফল, সমষ্টিগত মানবিক অস্তিত্ব,

তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে কোন ফারাকও থাকা উচিত নয়। আর এ কথা বলা হয়েছিল সে সময়ে, যখন ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে কোন ফারাক, নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়া মোটেই পরিলক্ষিত হত না।

নৃতাত্ত্বিক পন্থা একদিকে ছিল জবরদস্তির নানা অর্থনীতি-বহির্ভূত ধরন থেকে মানুষের মুক্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি : 'জন্মসূত্রে মানুষ স্বাধীন, — রুসো লিখেছেন, — তবে সর্বত্র সে শৃঙখলাবদ্ধ।'* 'স্বাধীনতা, সমাধিকার, ভ্রাতৃত্ব' — মহান ফরাসী বিপ্লবের এই ধ্বনি ছিল দার্শনিক নৃতত্ত্ববাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

কিন্তু অন্যদিকে, নৃতত্ত্ববাদ প্রত্যেক আলাদা ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থাদির সুগভীর রূপধারণকারী ফারাকের ভাবাদর্শগত আত্মসমর্থনের, পুঁজির সমাজে নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার পক্ষে কৈফিয়ৎ প্রদর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। নিজ সারবস্তুর 'অধিকারী' রূপে ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে নিহিত ছিল এই সারবস্তু 'বিলিয়ে দেবার' — স্বেচ্ছায় বা জবরদস্তিতে — যুক্তিসিদ্ধ সম্ভাবনা, মনুষ্য প্রকৃতিকে নিঃসঙ্গ করার সম্ভাবনা, ঠিক এর মতো, বাইবেলের যোসেফ যেমন প্রথম সন্তানকে মুসুর ডাল খাবার অধিকার প্রদান করেছিলেন। মানুষের প্রতি নৃতাত্ত্বিক পন্থায় ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে মিলের ব্যাপারেই শুধু আশাবাদী অনুমোদন ছিল না, ছিল তাদের ফাটলের তাত্ত্বিক আত্মসমর্থনও।

---

* জ. জ. রুসো। ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। মস্কো, নাউকা, ১৯৬৯, পৃঃ ১৫২ (রুশ সংস্করণ)।

ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক দার্শনিকগণও — ভলটেয়ার, দিদরো, রুসো, হেলভেশিয়াস, লামার্তি — ১৮শ শতাব্দীর মহান ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শী প্রেরণাদাতারা — মানুষের ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর এই বৈপরীত্যের চেতনালাভে অক্ষম হন। তবে শুধু 'কথার দ্বারাই' কোন যুগকে বিশ্বাস করা চলে না। ইতিহাসের খোদ গতিবিধি, কার্যক্ষেত্রে তাঁদের অনুগামীদের ক্রিয়াকলাপ — যাদের প্রচেষ্টা ছিল জ্ঞানদীপ্তির আদর্শকে জীবনে রূপদান — এই বৈপরীত্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, যা তাদের পক্ষে বিষাদজনক আকার ধারণ করেছিল। দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা চলে বিপ্লবের অন্যতম এক নেতা — 'ঘুষে অবশবর্তী' — ম্যাক্সিমিলিয়ান রোবস্‌পিয়ারের জীবন ও ক্রিয়াকলাপ।

১৭৯৪ সাল নাগাদ ফরাসী প্রজাতন্ত্র — সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিপদ দূর করে, অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ছত্রভঙ্গ করে, সামন্ততন্ত্রের নানা জের অপসারণ করে — মনে হয়েছিল যেন স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বের রাজ প্রতিষ্ঠার দিকে নিবিড়ভাবে এগিয়ে এসেছিল। তবে ঠিক এই পর্যায়েই রোবস্‌পিয়ারের বক্তৃতায় দন্ডপ্রাপ্তির ও শোকের সুর দেখা দিতে শুরু করে ; তিনি উপলব্ধি করেন বিজয় যেন হাত ফস্‌কে চলে যাচ্ছে, আদর্শ ভেঙে চুরমার হচ্ছে। সমতার ব্যাপারে রুসোর আদর্শ জীবনে রূপায়নের দরুন সেইসব খুদে উৎপাদকের রামরাজ্য দেখা দেয় নি, যারা সন্তুষ্ট ছিল তাদের অল্প লাভে, বাস করত স্বাধীন ভাবে ও সমান অধিকারে, ঘনিষ্ঠের

অধিকারে হামলা চালাত না। মানুষের 'প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ' যারা পদদলিত করে, তাদের সবাইকে দুঃখ দিয়ে রোবস্‌পিয়ার ও তাঁর অনুগামীরা এ বিশ্বাস লাভ করেন যে, লোকজন কখনও আরও ভাল হবে না। বিপ্লব কর্তৃক হাল-চালান জমিতে এমন ফসল ফলেছিল যা এমনকি তার 'বপনকারীরাও' আশা করেন নি। 'সমতার' এই নতুন পরিস্থিতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠল চোরাবাজারি, চলল পুঁজি সঞ্চয়ন, দেখা দিল দুর্নীতি। বিপ্লবের সুউচ্চ নানা নীতি অনেকের পক্ষে শুধু বৈষয়িক সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যম হয়ে উঠল। যেমন, ফরাসী ধনকুবের উভরার নিজ ধনসম্পদের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে 'বিপ্লবের উপর নির্ভর করে', সঠিকার্থে, ছাপার ব্যাপারে বিপ্লবের চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে। এই বুঝে যে, দেশে রাজ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রবল বৃদ্ধির দরুন ছাপা জিনিসের চাহিদা বাড়বে, তিনি বিপ্লবের একেবারে শুরুতেই কাগজের বড় ভান্ডার মজুত করতে থাকেন। মানবজাতির নানা আদর্শের জন্য আন্তরিক লড়াই চালিয়ে বিপ্লবের নেতারা বুর্জোয়া শ্রেণীর ঝড়ো বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেন, যে-বুর্জোয়ার পক্ষে মুখ্য 'আদর্শ' হয়ে উঠেছিল মুনাফা, যার কোন সীমারেখা ছিল না, যার পাহাড় গড়ে উঠছিল মানুষের নানা 'প্রাকৃতিক অধিকারের' সাহায্যে।

ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের পক্ষে উঠতি বৃহৎ বুর্জোয়া এবং তার দ্বারা উদ্ভূত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সংগ্রাম ভবিষ্যতে পরিণত হয়েছিল মানুষের

মধ্যে নৈতিকতা ও অনৈতিকতার মধ্যে, ভাল ও মন্দের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রামে। তাঁদের পক্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক উপাদানসমূহ — এক অখন্ড সত্ত্বা। রোবস্‌পিয়ারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে-ওঠা দাঁতোঁর বিরুদ্ধে অভিযোগী বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি জীবনে তার অনৈতিক আচরণের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন ; বিপ্লবী সরকারের নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ রোখার প্রচেষ্টায় তিনি নৈতিক সদ্‌গুণ দ্বারা রূপায়িত 'সর্বোচ্চ অস্তিত্বের একনায়কতা' চালু করার এবং তদ্দ্বারাই ফরাসী জনগণের 'প্রাকৃতিক সদ্‌গুণাবলীকে' সক্রিয় করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে লেনিন যেমনটি লিখেছেন, 'সমতার ধারণা হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কর্তব্যসমূহের সবচেয়ে পরিপূর্ণ, পারম্পরিক ও চূড়ান্ত প্রকাশ।'* বুর্জোয়া সমাজের পটভূমিতে মানুষের 'স্বাভাবিক প্রকৃতির' বিমূর্ত অবস্থা ও আলাদা আলাদা ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থাদির মধ্যে সুগভীর খাদের অস্তিত্ব স্বয়ং জীবনই প্রতিপন্ন করেছে।

জ্ঞানদীপ্তির ভাবাদর্শে সন্দেহের দরুন পরবর্তী কালে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক সমস্যা মীমাংসার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য রকমফের দেখা দেয়। কখনও মনে হয়েছিল আলাদা

---

* লেনিন ভ. ই.। সংগৃহীত রচনাবলী, খঃ ১৫, পৃঃ ২২৬ (রুশ সংস্করণ)।

ব্যক্তি ও মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ‘নিঃসঙ্গতা’ আছে, আবার কখনও-বা উল্টো ; যথার্থ মানবিক সারবস্তু ও একক ব্যক্তির মধ্যে নীতিগতভাবে ‘নিঃসঙ্গতা নেই’, তা ‘অবিচ্ছেদ্য’, যার ফলে সে ‘অন্যদের’ সঙ্গে মেলামেশা করতে অক্ষম হয়। এমন ধারণারও উদ্ভব ঘটে, যেমন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি উপকরণসমূহের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগতে সমাজের নানা দাবিদাওয়ার সরাসরি ও প্রত্যক্ষ ‘স্থানান্তর’। সবচেয়ে বহুরূপী ও অপূর্ব মতবাদ দেখা দেয় ব্যক্তি বিশেষ ও ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব ও ‘মানুষের প্রকৃতি’, ব্যক্তিত্ব ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আলোচ্য ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যাদির ব্যাপারে আগ্রহ — প্রাক্-পুঁজিবাদী যুগে অবিদ্যমান প্রকৃত সামাজিক বৈপরীত্যসমূহের প্রতিফলন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, আদিম সমাজ প্রসঙ্গে আমরা বলতাম সামাজিক ও ব্যক্তিগত, সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মিলের কথা। পরস্পর-বিরোধী নানা সামাজিক গঠন-ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ঘটে ব্যক্তি বিশেষের বিচ্ছিন্নকরণ, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ পরিসরের সম্প্রসারণ, চলে ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া। পরিশেষে, পুঁজিবাদের আমলে, একক ব্যক্তি যখন জবরদস্তির অর্থনীতি-বহির্ভূত নানা ধরনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে, তখন পূর্ণাধিকারে বলা চলে ‘ব্যক্তি বিশেষ-ব্যক্তিত্ব-মানুষ-সমাজের’ পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল ব্যবস্থা উদ্ভবের কথা। এই সম্পর্ক অতীব পরস্পর-বিরোধী ধরনের।

বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিত্বের অবস্থার বৈশিষ্ট্য পুঞ্জীভূত 'নিঃসঙ্গতা' ধারণার মধ্যে। এই ধারণার অর্থ উন্মোচনেই আমরা এখন নজর দেব।

২। প্রাপ্তি এবং হস্তচ্যুতি

বৈচিত্র্যময় সব ধরনের নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল একটি সাধারণ ধর্ম : মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফল রূপান্তরিত হয় এক স্বাধীন, মানুষের উপর অনির্ভরশীল শক্তিতে, যা তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এমনকি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, মানুষের সব আশাকে যা 'নিরাশার' পর্যায়ে নিয়ে আসে। যেহেতু যেকোন ধরনের ক্রিয়াকলাপ কোন না কোন ভাবে মানুষ কর্তৃক অনুভূত হয়, সেহেতু মানুষের কর্মফলের তফাৎ করার প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করার দরুন সৃষ্টি হয় নানা বিকৃত, অলীক চরিত্র, যাকে অভিহিত করা হয় **নিঃসঙ্গতালব্ধ চেতনা** রূপে।

নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার নানা কারণ বোঝার জন্য আসুন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমের প্রতি শ্রমিকের সম্পর্কের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। শ্রমিক নানা ধরনের জিনিস উৎপাদন করে, তবে সে তা ব্যবহার করতে পারে না : শ্রমের প্রতি সে ঢেলে দেয় সব শক্তি, নিজের সব ক্ষমতা, নিজের গোটা জীবন, বস্তুতপক্ষে সে যেগুলির অধিকারী নয়, সেগুলি বরং তার দ্বারা তৈরি নানা জিনিসের 'আকার নেয়', তার দ্বারে ফিরে আসে নানা পণ্যের আকারে। সুতরাং

শ্রমের মূল্য রয়েছে শুধু বেতনের কল্যাণেই, যার দ্বারা নানা পণ্য কেনা যায় ; শ্রম হল অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, ইত্যাদির চাহিদাপূরণের মাধ্যম। কার্ল মার্কর্স যেমনটি লিখেছেন, '...শ্রমিক শুধু শ্রমের বাইরেই নিজেকে নিজের বলে অনুভব করে, আর শ্রম প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন রূপে অনুভব করে। নিজের কাছে সে থাকে তখনই, যখন সে কাজ করে না ; আর যখন সে কর্মরত, তখন সে আর নিজের কাছে থাকে না।'*

কাজ, শ্রম রূপান্তরিত হয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, অতিপ্রিয় কাজে কাটানো নানা ঘণ্টার মধ্যকার বিমর্ষ বিরতিতে। তবে সেই একই শ্রম — শ্রমিকরা যাকে বোঝে এক অনিবার্য অনিষ্ট রূপে — মানুষের চাহিদার বৈশিষ্ট্যের প্রকাশস্বরূপ! প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এ রচনার প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, শ্রমই বলতে গেলে মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তা হল বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতির সব সম্পদের উৎস। তাই শ্রম আপনা থেকে তফাৎ প্রক্রিয়ার উৎস নয়, বরং ব্যক্তিগত মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম, সেই শ্রম, যার ফল আত্মসাৎ করা হয় তার উৎপাদকের বদলে অন্যদের দ্বারা — তাই হল তার উৎস। সে কারণে শ্রমের নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়া একই সঙ্গে হল মানুষের 'আত্মনিঃসঙ্গতা', ব্যক্তি বিশেষ থেকে মানবিক সারবস্তুকে তফাৎ করা : সৃজনকর্মে, জগতের চেতনালাভে ও

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪২, পৃঃ ৯০ (রুশ সংস্করণ)।

পুনর্গঠনে মানুষের মূল, সারবস্তুজনিত চাহিদাই শ্রম পূরণ করে না, তা বরং সঙ্কীর্ণ পরিসরের তথাকথিত 'আশু' চাহিদা পূরণের মাধ্যমের কাজ করে, যেসব চাহিদা মানুষের অন্যান্য চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশবিক চরিত্র লাভ করে।

ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগৎ যেসব উপাদানের জটিল সমাহার দ্বারা গঠিত, তা ধ্বংস করার ফলেও 'আত্মনিঃসঙ্গতা' দেখা দেয়। যুক্তিশক্তিকে মানুষের একমাত্র যোগ্য ক্ষমতা রূপে বিবেচনা করা হয়, আর ভালোবাসা ও হিংসা, মর্মপীড়া, দুঃখ, আনন্দের অনুভূতিকে গণ্য করা হয় এক বিষাদজনক ফালতু রূপে, অতীতের জের রূপে মানুষ যার অধিকারী এবং ইপ্সিত লক্ষ্যার্জনে মানুষকে যা বাধা দেয়। এবং উল্টো ব্যাপার ; যুক্তি, দয়া, সৌন্দর্য মানুষের সেই অভিশাপ হয়ে ওঠে, যা তাকে যুক্তিহীন জগতে ডুবে যাওয়ার পথে বাধাসৃষ্টি করে। তবে জবরদস্তি বাতিল হওয়া, নিঃসঙ্গ আত্মিক জগৎ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বদলা নেয়। আধুনিক আইরিশ লেখক ইউজিন ও'নীলের 'সর্পিল কামনা' (Desire under the Elms) নাটকে প্রধান নায়ক-নায়িকা আদিম কামনা-বাসনার অধিকারী — জমির মালিক হবার বাসনা এবং একে অন্যের প্রতি পাশবিক টান। তবে হঠাৎই তাদের মধ্যে জেগে ওঠে যথার্থ প্রেম, যথার্থ নৈতিক নানা অনুভূতি, যেগুলি তাদের নিয়ে যায় আশা ভঙ্গের দিকে। পুরাকালের ট্র্যাজেডির চিরাচরিত বিষয়বস্তু — অদৃষ্টের সঙ্গে, অন্ধ, তমসাচ্ছন্ন

শক্তির সঙ্গে নায়কের সংঘর্ষ — এখানে বুঝি-বা 'উল্টোমুখি'। যুক্তিহীন পাশবিক কামনা নয়, বরং যথার্থ মানবিক অনুভূতিই নায়ক-নায়িকার যমদূত হয়ে উঠছে।

প্রথম দৃষ্টিতে এর বিপরীত ধরনের এক পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে, কিছুটা অ-সাধারণ আকারে যার রূপ দিয়েছেন বুলগেরীয় লেখক পাভেল ভেজিনভ তাঁর 'সাদা টিকটিকি' কাহিনীতে। পরিব্যক্তি বা হঠাৎ দেহকোষ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রেরিত কোন এক 'সুপারম্যান' প্রেম ও হিংসার ক্ষমতা, ভয়, রাগ ও অন্যান্য 'পার্থিব' অনুভূতি থেকে বঞ্চিত, তার মধ্যে প্রাধান্য রয়েছে যুক্তিজনিত ভিত্তির সুসম্পূর্ণ অবস্থা। তবে জীবন যেমন দেখিয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সে হয়ে উঠেছে প্রাক্-আদিমানুষ' এবং মারা পড়ে তার পক্ষে এইসব অজ্ঞাত, অজানা, কিন্তু মানুষের পক্ষে অবিচ্ছেদ্য অনুভূতির চাপে।

মানুষ নিজের মতো থাকা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ, যেহেতু শ্রমের সামাজিক চরিত্র বিকৃত, তার ব্যক্তিগত মালিকানার আকারে লুক্কায়িত, নিঃসঙ্গতা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্নতার এক ধরণও হয়ে ওঠে।

মানুষ প্রকৃতি থেকে নিঃসঙ্গ যেমন তার বাইরে, তেমনই নিজের 'ভিতরে', যেহেতু মানুষ হল জৈবিক-সামাজিক সত্তা। প্রকৃতির নানা বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রকৃতির নানা নিয়মের, প্রকৃতি ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়ার নিয়মাবলীর সারবস্তুতে অনুপ্রবেশ —

এও হল মানুষের (সেই মানুষের, যেমনটি সে হতে পারে) 'বংশগত' সারবস্তুর অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রকৃতি থেকে নিঃসঙ্গ হওয়ার প্রক্রিয়া — এ হল মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ার সুসমৃদ্ধ গোটা রূপরেখার বদলে প্রকৃতিকে শুধু উৎপাদনের হাতিয়ার রূপে, অথবা নিজ জৈবিক সত্তা বজায় রাখার উপকরণ রূপে বিবেচনা করা। তবে অচিরেই মানুষের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি এবং তার অন্তরের প্রকৃতিও তার প্রতি এমন আচরণের বদলা নিতে শুরু করে। এর প্রকাশ ঘটে যেমন প্রাকৃতিক উৎস ফতুর হওয়ার, তেমনই জমির সুফলা অবস্থা কমার মাধ্যমে, মানুষ যেসব অসুখে ও মনঃকষ্টে ভোগে, তার মাধ্যমে।

এই নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার বুঝি-বা দুই চরম প্রান্ত হল শ্রমিক এবং বুর্জোয়া : শ্রমিকের পক্ষে শ্রম হল তার 'ব্যক্তিগত' জীবনের জন্য উপকরণ মাত্র ; পুঁজিপতির পক্ষে উৎপাদন প্রক্রিয়ার — যাকে বিবেচনা করা হয় মুনাফা লাভের প্রক্রিয়া রূপে — আত্মপ্রকাশ ঘটে খোদ লক্ষ্য রূপে, সময় সময় 'ব্যক্তিগত' জীবন পরিণত হয় কারবারি সাফল্যের হাতিয়ারে। দুই চরম প্রান্তের মিল ঘটে। যেমন 'জীবনকর্তা', তেমনই 'ভাগ্যের সৎপুত্র' একই রথের হাতে বন্দি। উৎপাদনী সম্পর্কের প্রতি উভয়ের সম্পর্কেরই ক্ষতি ঘটেছে, উভয়েই শ্রমের প্রতি এক অখণ্ড আচরণ করতে অক্ষম। শ্রম মানুষের এক সৃষ্টিকর্ম রূপে, তার আত্মিক জগৎ বিস্তারের এক মঞ্চ রূপে পুঁজিবাদী

উৎপাদনের দালালদের কাছে সমহারে আগ্রহহীন। উল্লিখিত দুই মতাবস্থান — পুঁজির সমাজে তফাৎ দেখা দেবার নানা আকারের জটিল বর্ণচ্ছটায় দুই প্রান্তবিন্দু।

ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়া — এ শুধু নিজের নানা ক্ষমতা বিকাশই অসম্ভব করে না। এই প্রক্রিয়ার আবশ্যিক সমাপ্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে তার উপলব্ধির নানা নিঃসঙ্গ ধরন। সেগুলি বিদ্যমান অবজেকটিভ অবস্থাকে পাকাপোক্ত করে অসহায় অবস্থা রূপে অথবা তা থেকে মায়াবী পরিত্রাণের পথ দেখায়। নিজের থেকে বস্তু ও প্রকৃতিকে আলাদা করে, নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে প্রাচীর তুলে, নিজ আত্মিক জগৎকে নিঃস্ব করে, তাকে অতি সরল দাবিদাওয়ার সমষ্টির উদ্দেশে পরিচালিত করে, অনুভূতি ও যুক্তি, চাহিদা ও ক্ষমতা, প্রতিফলন ও কর্মের সামঞ্জস্যকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেসব ফিরে পেতে, সে নিজেই যেসব বাধাসৃষ্টি করেছে, সেগুলি অতিক্রম করতে প্রচেষ্ট, তবে — বিকৃত আকারে। **অধিকারের** ও ধর্মীয়, **উপাসনার** আকারে, অন্যের তথা তার নিজের মতোই 'স্বার্থপর ব্যক্তির' উপর **অত্যাচারের** আকারে, প্রকৃতির উপর, স্বয়ং নিজের উপর অত্যাচার চালিয়ে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, শুধু 'ব্যক্তিত্ব ও পুঁজিবাদ' সমস্যার প্রতি নজরদানকালেই আমরা নিঃসঙ্গতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি কেন? পুঁজিবাদের আগে কি

নিঃসঙ্গতার অস্তিত্ব ছিল, ইতিহাসের বিচারে অধিকতর প্রগতিশীল ধরনের তথা কমিউনিস্ট সমাজে কি তার অস্তিত্ব সম্ভব?

প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে মানুষের জীবনযাত্রার কথা বলার সময় পুরাকালের বিশ্ববীক্ষার অন্যতম এক ভাবাদর্শীয় মূলস্তম্ভ রূপে আমরা বিবেচনা করেছিলাম অদৃষ্টের ধারণাকে — অন্ধ তমসাচ্ছন্ন এক শক্তিকে, যা মানুষের সব পরিকল্পনা ধ্বংস করে, সব আশা ভঙ্গ করে। এই রূপের মধ্যে কি মানুষের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন শক্তির উপস্থিতি অনুভূত হয় না? হয় বৈকি, তবে প্রাচীন গ্রীসবাসী অদৃষ্টের ব্যাপারে শুধু আতঙ্কগ্রস্তই নয়, সে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। অদৃষ্ট ধারণার পাশাপাশি রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার, মানুষের পরাক্রমের ধারণা।

মধ্যযুগীয় সমাজে শাসনকর্তা — সামাজিক সোপানের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত এবং নিজ সম্পূর্ণতার বিচারে পরম গুণাগুণ সমষ্টির অধিকারী — ছিল ধর্মীয় উপাসনার বস্তু। স্বৈরতন্ত্রও নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার এক ধরন। তবে মধ্যযুগীয় চেতনা ও ভাবাদর্শ বোধের পক্ষে এও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার মতে মানুষ হল 'সৃষ্টির বিজয়মাল্য'...।

বর্ণিত বিষয়বস্তু থেকে মোট তিনটি সিদ্ধান্ত করা চলে। প্রথম। নিঃসঙ্গতা প্রাক্-পুঁজিবাদী গঠন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের জীবনযাত্রার এক সার্বজনীন আকার রূপে তখনও ছিল না। দ্বিতীয়। অতীতের কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে লোকে নিঃসঙ্গ আকার ছাড়া

আর অন্য কোনভাবে পরিচিত হতে পারত না। মানুষ বুঝি-বা 'আয়নায়' (প্রকৃতির, শিল্পকলার, রাজনীতির, অর্থনীতির) নিজেকে দেখছে এবং তাতে নিজের প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছে, তা চর্চা করছে, তাতে অবাক হচ্ছে, তাতে ভয় পাচ্ছে, তবে তখনও বুঝে উঠতে পারছে না, কী এটা — একি তার নিজেরই প্রতিফলন। উৎসুক পশুর মতো সে ধীরে ধীরে আয়নার পিছনে উঁকি দেয়, এই বোঝার প্রচেষ্টায়, কে এই মহাপরাক্রমশালী তার পিছনে লুকানো, কীভাবে এইসব অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যকথায়, সংস্কৃতির দর্পণ অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে ব্যক্তিপূজার বস্তুর আকারলাভ করে।

এবং পরিশেষে, তৃতীয়। প্রাক্-পুঁজিবাদের আগেকার সমস্ত গঠন-কাঠামো ছিল ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার শুভকাল : আদিম সমাজের 'আকস্মিক' ব্যক্তি থেকে সামন্ততন্ত্রের 'সম্প্রদায়জনিত' ব্যক্তিতে আগমন এবং পরিশেষে সেই ব্যক্তিত্বে হাজির হওয়া, যে ছিল সক্রিয়, কর্ম-তৎপর, আত্মসচেতন এক ব্যক্তি, সমাজে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন অবস্থানের, 'স্বাধীন ইচ্ছার', জটিল আত্মিক জগতের, ব্যক্তিগত বিশ্ববীক্ষার অধিকারী। বুর্জোয়া সম্পর্ক কায়েম হবার কল্যাণে ব্যক্তিত্ব নিজেকে জাহির করতে পেরেছিল। আত্মমর্যাদা, নিজের নানা অধিকারকে শ্রদ্ধা জানানোর দাবি জানিয়েছিল, নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল। তবে পুঁজিবাদী সমাজে লোকজনের মধ্যে সব সম্পর্কই গড়ে ওঠে জিনিসপত্রের ভিত্তিতে, **বস্তুভিত্তিক** মনোভাব প্রাধান্য লাভ করে। কার

সামনে ব্যক্তিত্বের আত্মমর্যাদা রক্ষা করা দরকার? কার সঙ্গে সংগ্রাম করবে? দোষী কে? কী কর্তব্য? এই হল সেইসব প্রশ্ন, যেগুলি নিয়ে বহুকাল মনীষীরা মাথা ঘামিয়েছিলেন। **ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক** সম্পর্কের পটভূমিতে গড়ে ওঠা চিন্তাধারার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল যে, নিজের দুর্দশা ও সমাজের দুর্দশার জন্য দায়ী নির্দিষ্ট অপরাধীকে অতি অবশ্যই খোঁজা দরকার। পুঁজিবাদের আমলে কারবারিকে কখনই ব্যক্তিগতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না, সে নানা আইনীয় মাত্রা লঙ্ঘন নাও করতে পারে, হতে পারে যে সে আদর্শ সাংসারিক, গরিবদের হিতে নিয়মিত দান, ইত্যাদি করে। শিল্প বিপ্লবের ঊষালগ্নে হস্তশিল্পের শ্রমিকরা, দেউলিয়া-হওয়া কৃষকরা অপরাধী (তাদের যেমন মনে হয়েছিল) খুঁজে পেয়েছিল — যন্ত্র। লুড্ডাবাদীরা (ইংরেজি Luddites থেকে, নেডা লুড্ডা নামক শ্রমিকের অনুগামী যন্ত্র-ভাঙার-দল) যন্ত্রের প্রতি তেমন আচরণ প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল, যেমনটি করা হত প্রকৃত নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি — তাদের দুর্দশার জন্য অপরাধীর প্রতি, অথবা, দার্শনিক ভাষায় বললে বস্তুর **ব্যক্তিরূপ** দিয়েছিল।

একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটছিল কোন এক উল্টো ব্যাপার। মানুষের অধঃপতন ঘটেছিল বস্তুর স্তর পর্যন্ত, যা কেনা-বেচা চলত, অর্থাৎ বস্তু যেন পণ্য। গোটা সমাজকে বিবেচনা করা হতে লাগল বিশাল এক বাণিজ্য দপ্তর রূপে, মানুষ বুঝি-বা

পণ্য-মালিক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক — ঠিক যেন কেনা-বেচার সম্পর্ক। পুঁজিবাদী শোষণের কাজও বুঝি-বা শুরু হচ্ছিল কেনা-বেচার ন্যায়সঙ্গত কাজ রূপে। কিন্তু শ্রমিক পণ্যের আকারে নিজ শ্রম-শক্তি বেচে নিজের মধ্যে সম্মিলন ঘটায় যেমন পণ্য-মালিকের, তেমনই খোদ পণ্যের। পণ্যের 'পরিভোগ', শ্রমিকের খোদ জীবন, তার 'অবিচ্ছেদ্য নানা অধিকার' পরিভোগের আকার নেয়। সুতরাং খোদ পণ্য উৎপাদন — তফাৎ প্রক্রিয়ার মূল নয়, বরং পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন, যা খোদ মানুষকে পণ্যে রূপান্তরিত করে।

তবে পুঁজিবাদের আমলে ব্যক্তিত্বের পক্ষে 'বাণিজ্যের জিনিস,' আর কারবারির পক্ষে 'কেনার জিনিস' আছে : পুঁজিবাদের আগেকার কোন সমাজেই পুঁজিবাদের আমলের মতো এসবে এমন প্রবল চাহিদা ছিল না, যেমন, সাংগঠনিক, শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমের,উৎপাদনে নানা যান্ত্রিক সাফল্যের সদ্ব্যবহারের, প্রতিভা, অনুমান ক্ষমতা, সৃজনী উদ্যোগ ও উদ্ভাবন ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের।

যথেষ্ট পরস্পর-বিরোধী এক পরিস্থিতি যে গড়ে উঠছে, তা লক্ষ্য করা কঠিন কাজ নয়। একদিকে, গতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী পুঁজিবাদের প্রয়োজন হচ্ছে সেইসব মানবিক গুণের, যেগুলির অধিকারী ব্যক্তিত্ব, এবং তদ্দ্বারাই তার বিকাশে সে সহায়তা করছে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যক্তিত্বের কাছে সেই সবকিছু তৎক্ষণাৎ

'কেড়ে নিচেছ', যাকিছুর উৎপত্তিতে সে সাহায্য করেছিল : স্বাধীনতা, সৃজন ক্ষমতা, নানা নৈতিক মূল্যবোধ, নান্দনিক আদর্শ, ব্যক্তিত্বের জীবনযাত্রার এক বিকৃত আকার দেয়। ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠে ক্রমশ বেশি গভীর এক খাদ আর তার সঙ্গে — তা অতিক্রম করার বহুরূপী নানা প্রচেষ্টা।

সুতরাং পুঁজিবাদ হল নিঃসঙ্গতার সমাজ। নিঃসঙ্গতা ও আত্মনিঃসঙ্গতার কিছু কিছু উপাদান প্রাক্-পুঁজিবাদী নানা গঠন-ব্যবস্থাতেও উপস্থিত ছিল, তবে পুঁজিবাদের আমলে তা সার্বজনীন আকার লাভ করেছে।

এবার তাদের জন্যে, যারা আন্তরিকভাবে কমিউনিজমের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে যে, ভবিষ্যৎ হল কমিউনিজমের পক্ষে, তাদের জীবনের অন্যতম এক কঠিন ও 'ব্যথাতুর' সমস্যা প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলব। কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থার প্রথম পর্ব সমাজতন্ত্রের আমলে কি নিঃসঙ্গতার অস্তিত্ব আছে? বহুকাল ধরে এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা একযোগে বলে এসেছি 'না'! সমাজতন্ত্রের আমলে নিঃসঙ্গতার উপস্থিতিকে না-মানার ভিত্তি রূপে কাজ করেছে সর্বাগ্রে এই উক্তিদান যে, সমাজতন্ত্রের আমলে আধিপত্যকারী হল সামাজিক ধরনের মালিকানা। এবং বস্তুতই, সামাজিক মালিকানার আধিপত্যের আমলে নিঃসঙ্গতা তার ভিত্তি খোয়ায় : শ্রমের ফল শ্রমিকের জীবন থেকে আলাদা (নিঃসঙ্গ)

হয় না, শ্রম নিজের জন্য শ্রমের আকার ধারণ করে, সর্বশক্তিমান আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ছেড়ে রাষ্ট্র রূপান্তরিত হয় সার্বজনীন স্বার্থাদির ধারক ও বাহকে। তাহলে কোত্থেকে দেখা দেয় এমন ঘন ঘন দৃষ্টান্ত, যেমন, রাষ্ট্রীয় — অর্থাৎ কিনা — নিজের বৈষয়িক মঙ্গলের প্রতি বেহিসাবী সম্পর্ক, কোত্থেকে আসে নিজের পেশাগত দায়দায়িত্বের প্রতি এমন অবজ্ঞা আর যার ফল — বহু কলকারখানার জিনিসপত্রের অতি নিম্ন মান? পরিশেষে, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতির সর্বাধুনিক সাফল্যাদি উৎপাদন ক্ষেত্রে চালু করার ব্যাপারে কোত্থেকে দেখা দেয় এমন প্রবল বিরুদ্ধাচারণ? আর প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের খোঁজে এক রাষ্ট্রীয় দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ধর্ণা দিয়ে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস খুইয়ে লোকে কি রাষ্ট্রকে এক হৃদয়হীন আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র রূপে দেখতে শুরু করে না? পরিশেষে তা, যাকে আমরা ব্যক্তিপূজা রূপে অভিহিত করি (সাধারণ শ্রমজীবীর মর্যাদার প্রতি তেমন ব্যক্তির অবজ্ঞা সহ), চের্নোবিলের দুর্ঘটনা, যা প্রদর্শন করেছিল, কীভাবে মানুষের ধীশক্তির ফল তারই স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে...।

আলোচ্য ঘটনাবলীর বিভিন্ন মূল্যায়ন করা যেতে পারে। একটা পথ — সোভিয়েত দেশের জীবনের সব নেতিবাচক দিককে অতীতের পুনরাবির্ভাবের, জেরের, পুঁজিবাদের 'জন্মসূত্রে তিলের' পর্যায়ভুক্ত করা। অন্যটা — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের খোদ

বাস্তবিক জীবনের মধ্যেই আলোচ্য ঘটনাবলীর নানা কারণ অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেয়। সামাজিক মালিকানা কায়েম করার, রাষ্ট্রকে অধিকাংশ মেহনতির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে, পরিকল্পনা-ভিত্তিক অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতা অতিক্রম করার পক্ষে **অবজেকটিভ সম্ভাবনার** দ্বার উন্মুক্ত করে। সমাজতন্ত্রের আমলে নিঃসঙ্গতা সেই সর্বনাশা অনিবার্যতা নয়, যা সঙ্গীস্বরূপ থাকে মানব জীবন ও কর্মের সব ধরনের পাশাপাশি। তবে নিঃসঙ্গতা যাতে সত্যি সত্যিই পুরোপুরি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়, তার জন্য প্রয়োজন হল সামাজিক মালিকানা শুধু যেন আইনীয় কাজকর্মেই বজায় না থাকে; সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মালিকের অনুভূতি লাভ করা উচিত এবং তা অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর নমনীয় ব্যবস্থার সাহায্যে, রাষ্ট্রীয় জীবনের সব প্রশ্ন আলোচনায় তার প্রকৃত যোগদান করা উচিত, আমলার জোরজুলুমের ওপর তার মানসম্মানে ও মর্যাদা নির্ভর করা উচিত নয়, সামাজিক মালিকানাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তর করার পথলাভকারী লোকেদের উদ্যোগের হাতে তার পকেটের মার খাওয়া উচিত নয়।

অন্যকথায়, কয়েক দশক ধরে উল্লিখিত নিঃসঙ্গতার এইসব লক্ষণ সমাজতন্ত্রের খোদ সারবস্তু থেকে উদ্ভূত নয়, খুব সম্ভবত সেগুলি হল এইসব আইনের বৈঠিক, অতি সরল, অ-দ্বান্দ্বিক বোধ ও ব্যবহারের

ফল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে প্রণীত সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে আজকের বাস্তবিক সমাজতন্ত্র মোটেই সব ব্যাপারে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। সমাজতন্ত্রের বাস্তবিক রূপদানকে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ করার, আর তত্ত্বকে আরও পরিপূর্ণ, সঠিকভাবে বাস্তবে রূপদানের প্রচেষ্টার মধ্যেই বস্তুত পক্ষে নিহিত আছে সোভিয়েত সমাজের জীবনের সব দিকের পুনর্গঠনের ভিত্তি। 'আরও বেশি সমাজতন্ত্র!' — এই হল আমাদের দিনের ধ্বনি।

ভুলভ্রান্তির খোলাখুলি স্বীকৃতি, অর্জিত সবকিছুর ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ক্ষমতা — এতেই নিহিত আছে কার্যক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতার নানা লক্ষণের ষোলআনা বিলুপ্তির সম্ভাবনাকে রূপান্তরিত করার ভিত্তি। কার্ল মার্কস লিখেছেন, নানা প্রলেতারীয় বিপ্লব 'নিত্য আত্মসমালোচনা করে, হয়তো-বা নিজ অগ্রগতিতে কাজ রুদ্ধ হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, তাতে প্রত্যাবর্তন করে যাতে আবার তা নতুন করে শুরু করা যায়, আধা-কাজ, দুর্বল নানা দিক ও নিজের প্রথমের নানা প্রচেষ্টার অযোগ্যতার উপহাস করে নির্মম ভিত্তি সহকারে'।*

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৮, পৃঃ ১২৮ (রুশ সংস্করণ)।

৩। আছে, হওয়া, মনে হওয়া

পুঁজিবাদী সমাজে নিঃসঙ্গতার নানা প্রক্রিয়া — অতি অদ্ভুত, প্রথম দৃষ্টিতে, অসঙ্গতিসম্পন্ন নানা আকারে চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে — জীবনের তাৎপর্যের ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের ধারণার উপরেও, তার নানা লক্ষ্য, আদর্শ, আত্মসম্পর্ক ও পারিপার্শ্বিক জগতের উপরও রেখাপাত করে। ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে সরাসরি মিলের ব্যাপারে পুরনো, 'অতি সরল' নৃতাত্ত্বিক ধারণা ভেঙে চুরমার হয়, তার বদলে আসে ব্যক্তিগত ও সামাজিক, ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে সুগভীর হওয়া খাদের ধারণা। ব্যক্তি বিশেষ শুধু সমাজেই এবং তারই কল্যাণে চিন্তা করা, কথা বলা, মেলামেশা করা, দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতা লাভ করে ; সে এমনকি তার বাইরের আকৃতি, এমনকি জৈবিক চাহিদাপূরণের নানা ধরনের জন্যও নানা সামাজিক মাত্রা, আচারপ্রথা ও ঐতিহ্যের কাছে কৃতজ্ঞ আদি উদ্ভবের 'অধিকারের জন্য' সমাজের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে অস্বীকার করে।

পরিভোগী-মানুষের ভাবমূর্তি — এ হল নিঃসঙ্গ চেতনা দ্বারা নিজেকে উপলব্ধি করার অন্যতম চালু এক রকমফের। এই ভাবমূর্তির গভীর এক অবজেকটিভ ভিত্তি রয়েছে। *পুঁজিবাদী সমাজ সাফল্যের* সঙ্গে কাজ করতে পারে শুধু তখনই, যখন উৎপাদনে অংশগ্রাহীদের মনে তারা যে সমাজে বাস ও কাজ

করে, তার সম্বন্ধে, খোদ নিজেদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নানা ধারণা (হোক না তা বিকৃত) গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাফল্যজনক ক্রিয়ার জন্য অত্যাবশ্যক হল পুঁজিবাদের ব্যাপারে এ বিশ্বাস যে, তা হল সমান সুযোগ-সুবিধার সমাজ, যেখানে কারবারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সাফল্য অর্জন করতে পারে ; মুনাফা লাভের প্রচেষ্টাকে নিজের অন্য সব প্রচেষ্টার উপরে স্থান দেওয়ার, তাকে জীবনের পরম লক্ষ্যে পরিণত করার পটুত্ব থাকা চাই। তবে সে ক্ষেত্রে সবকিছুই — যাকেই ঐতিহ্য অনুসারে সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ রূপে (নাগরিক শৌর্য্য, মানবিক মর্যাদা, উপকার, সুউচ্চ নান্দনিক আচরণ, পাণ্ডিত্য, ইত্যাদি) স্বীকার করা হয়েছিল — পরিণত হয় আর্থিক সাফল্যের পেছনে ভাগার শুধু এক অবলম্বনে। মুনাফার রথের প্রবল টানে বন্দী হয়ে মানুষ তার গতিবিধি বাড়ানোর জন্য সমস্ত উপায়-উপকরণের সদ্ব্যবহার করে। মুন্ধতা, পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম রুচি তার কাছে শুধু এক চাবিকাঠি, যা মুনাফার ইপ্সিত রাজত্বের দ্বার খুলতে সাহায্য করবে।

একদিকে, সব সাংস্কৃতিক ঘটনার ব্যাপারে অবহিত থাকা চাই, বড় পরিসরের জ্ঞানের অধিকারী, সাহিত্যিক সম্পদ রপ্ত করা চাই ; কিন্তু অন্যদিকে — এসবের প্রয়োজন নান্দনিক উপভোগ, চেতনা, সৃজনকর্মের চাহিদাপূরণের জন্য নয়, বরং ব্যবহারিক লক্ষ্যার্জনে। এইভাবেই সুউচ্চ নানা আত্মিক মূল্যবোধ

প্রায়শই মুনাফা লোটার পেছনে ভাগার শুধু উপকরণে পরিণত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতার কার্যপ্রণালী বিশেষ উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে: বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তি পুরোপুরি নিজেকে অধীন করে অজানা স্বাধীনতার, লক্ষ্যের সৃজনী বিকাশ হয় মুনাফার পেছনে ভাগার বশবর্তী, আর নিজের যথার্থ মানবিক সারবস্তুকে সে তার লক্ষ্য অর্জনের সাদামাটা উপকরণে পরিণত করে। 'বস্তুর জগতের **মূল্যবৃদ্ধির** সঙ্গে সরাসরি সঙ্গতি রক্ষা করে মানুষের জগতের **মূল্যহীনতাও** বাড়ে।'* নিজের নানা 'অবিচ্ছেদ্য' গুণের প্রতি মানুষ পরিভোগীর অনুরূপ আচরণ করে।

তবে 'পরিভোগ' বলতে আমরা কী বুঝি? — নির্দিষ্ট এক চাহিদাপূরণ, আলোচ্য ক্ষেত্রে, মুনাফা বৃদ্ধির, কর্মজীবনে সাফল্যের দাবিপূরণ। এই চাহিদাপূরণ যার দ্বারা সম্ভব হয় সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যক ক্ষেত্র হল পরিভোগ। এক আবদ্ধ চক্র। পরিভোগের জন্য উৎপাদন, উৎপাদনের জন্য পরিভোগ। আধুনিক ইতালিয়ান লেখক জুসেপ্পে দ্য' আগাথা'র 'ও.কে আমেরিকা' নামের উপদেশমূলক উপন্যাসে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোন এক 'মহান দেশের' কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেখানে যত বেশি সম্ভব জিনিসপত্র যোগাড় করাকে এক ধর্মীয় আচার রূপে বিবেচনা করা

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪২, পৃঃ ৮৭-৮৮ (রুশ সংস্করণ)।

হয়েছে। তাও আবার কেনা জিনিসের মোড়ক খোলাও চলে না : কেননা নির্ধারিত কাজের জন্য কেনা জিনিস ব্যবহার করার ফলে পুনরায় উৎপাদিত জিনিসপত্রের কাটতি রুদ্ধ হবে, উৎপাদন থেমে যাবে। দেখা দেয় পরিভোগের ধর্ম। জিনিসপত্র কেনার প্রক্রিয়া নতুন এক অদৃশ্য দেবতা — মুনাফার দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত। সুতরাং 'পরিভোগও' আলোচ্য ক্ষেত্রে এক বিশেষ, 'প্রতীকী' ধরনের। জিনিস কেনা হয়েছে — অর্থাৎ 'পরিভোগ' করা হয়েছে। কেনা-বেচা প্রক্রিয়ার পর তার হাল কী হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদনের কাছে তা অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে কোন লোকের নয়, বরং উৎপাদনের নানা অবজেকটিভ দাবিপূরণ হয়। তাই পরিভোগ সাদামাটা জিনিস লাভের, 'অধিকারের' আকার লাভ করে।

শুধু আলাদা কোন জিনিসের (বস্তুর) অধিকারী হওয়াই নয়। কেননা সব বস্তুই হল মানুষের দক্ষতা, নিপুণতা ও প্রতিভার রূপায়ণ, তাই বস্তুর অধিকারী হওয়া দ্বারা শুরু হয় মানুষের দক্ষতার অধিকারী হওয়ার তাৎপর্য অর্জন করা। নিঃসঙ্গ চেতনার যুক্তি হল এমন : মানুষের মধ্যে হাজির নিপুণতা, চেতনা ক্ষমতা থেকে তাকে আলাদা করে সমাজ বুঝি-বা সেসব পণ্যের আকারে তাকে ফিরিয়ে দেয়। তাই ব্যক্তি বিশেষ যত বেশি সংখ্যক জিনিসপত্রের অধিকারী হতে সমর্থ হয়, তার সামাজিক কদর, মানসম্মান, মর্যাদাও হয় তত বেশি। এখান থেকেই

আসে বস্তুর পিছনে ঘোড়দৌড়, তথাকথিত ‘বস্তুবাদ’। মানুষের অধিকারভুক্ত নানা জিনিসই তার সামাজিক কদরের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। তবে বইপত্র, রঙ-তুলি, বাদ্যযন্ত্রের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কখনই সৌন্দর্য উপভোগের, অধিকন্তু তা সৃষ্টির দক্ষতা অর্জন করে না। কেনা-বেচার দ্বারা মানুষ কখনই আলোচ্য জিনিসে রূপায়িত মানুষের পক্ষে সম্মানজনক গুণাগুণের অধিকারী হতে পারে না।

বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের আদি পর্বগুলিতে জিনিসের পিছনে ঘোড়দৌড় সঞ্চয় করার আকার লাভ করেছিল। তবে সে সময়েই দেখা গেছিল যে, ‘বস্তুর উপর ক্ষমতা-স্থাপন’ হল লোকেদের উপর ক্ষমতা-স্থাপন। একক ব্যক্তির হাতে জিনিসপত্র, অর্থ সঞ্চয়ের দরুন সে হয়েছিল সর্বশক্তিমান। বালজাকের অন্যতম এক নায়ক সুদখোর হোবেকের উক্তি : ‘মানুষের বিবেক কেনার, সর্বশক্তিমান মন্ত্রীদের পরিচালনের পক্ষে আমি যথেষ্ট ধনী...। এই কি শাসন-ক্ষমতা নয়? ইচ্ছে হলে আমি সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা নারীদের অধিকারী এবং কোমলতম সোহাগ খরিদ করতে পারি। এই কি উপভোগ নয়? সোনা — এই হল আজকের গোটা সমাজের আত্মিক সারবস্তু।’*

পুঁজিবাদ বিকাশের এ পর্যায়ে নিঃসঙ্গতা কোন

---

* বালজাক ও.। রচনাবলী, খঃ ১, মস্কো, ১৯৬০, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩ (রুশ সংস্করণ)।

এক স্বার্থপর ব্যক্তি বিশেষ রূপে ব্যক্তিত্ব সমাজের বিপরীত ধর্মী আকার ধারণ করেছিল। এই ব্যক্তি তার অবস্থান পাকাপোক্ত করেছিল নানা জিনিসের মালিক হবার সাহায্যে, এই মালিকানার সাহায্যে সে তার 'আমি'র গণ্ডি মোহময়ভাবে বাড়িয়েছিল, সমাজের সঙ্গে, তার নানা নিয়মকানুন, বিধিনিষেধের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করতে শুরু করে, এবং এর সমাপ্তি ঘটে সমাজের উপর নিজের নানা শর্ত জবরদস্তিভাবে আরোপের প্রচেষ্টা দ্বারা। পরবর্তীকালে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের মডেলের রূপবদল হয়েছিল।

সুতরাং নিঃসঙ্গ চেতনার প্রকাশ রূপে 'বস্তুবাদ' শুধু বস্তুর পিছনে ঘোড়দৌড়ই নয়, এ হল খোয়ানো স্বাধীনতা, মানবতাবোধের পিছনে ঘোড়দৌড়। পরিভোগীর চেতনায় কোন বস্তু মূল্যবান হয়ে ওঠে তার প্রত্যক্ষ পরিভোগী মূল্য দ্বারাই নয়; তা মানুষের নানা সুউচ্চ মূল্যবোধের ধারক-বাহক। তবে বস্তুর নানা দৃষ্টিগোচর গুণাগুণ ও তার নানা 'অদৃশ্য' সামাজিক গুণাগুণের মধ্যে যোগাযোগ শর্তসাপেক্ষ। বাস্তবে বস্তু মানসম্মান, ধনসম্পদ, কুলীন বংশ, সুউচ্চ সংস্কৃতির শুধু **পরিচয়-চিহ্নের** কাজ করতে পারে। তবে নিঃসঙ্গ চেতনা সাদামাটা এইসব শর্তাধীন যোগাযোগকে রহস্যময়, অতি অস্বাভাবিক, অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রূপে বিবেচনা করতে শুরু করে। বস্তু পরিণত হয় মানুষের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে, উপাসনার লক্ষ্যবস্তুতে। বস্তুর প্রতি মানুষের এমন আচরণে

পৌরাণিক চেতনার নানা উপাদান লক্ষ্য করা কঠিন কাজ নয়, যার উৎস রয়েছে সেই সুদূর অতীতে। সমাজের সঙ্গে 'বস্তুবাদী' চেতনার ধারক-বাহকের সম্পর্কের রঙ-বেরঙের গোটা এক পরশ বিদ্যমান : 'ছোট' মানুষের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা, তার সঙ্গে এক ধরনের গোপন চুক্তিতে আসা থেকে শুরু করে খোলাখুলি বিদ্রোহ, তার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন, সমাজের ওপর নিজের নানা শর্ত জবরদস্তি আরোপের প্রচেষ্টা পর্যন্ত। ব্যক্তিত্ব ও সমাজকে উপলব্ধি করা হয় কখনও-বা এক ধরনের শত্রুভাবাপন্ন, আবার কখনও-বা আপসের অবস্থায় থাকা, কিন্তু **বিপরীত** ধরনের দুই দিক রূপে, যাদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তুর জগৎ দ্বারা।

১৯শ শতাব্দীর রুশ লেখক গোগলের 'ওভারকোট' কাহিনী এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদাহরণ, যাতে আছে সমাজের সব বিধিনিষেধ শান্তশিষ্টভাবে মেনে নেওয়া থেকে শুরু, পরিশেষে খোলাখুলি বিদ্রোহের দৃশ্য। গোবেচারা এক আমলা, যার সব স্বপ্ন ও চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নতুন এক ওভারকোট যোগাড় করাকে ঘিরে — হঠাৎ তা তার হাতছাড়া হল। ওভারকোট হারানোর ফলে সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারে তার সব আশা ভেঙে চুরমার হল, খোদ জীবনের তাৎপর্যই হারিয়ে গেল, আর তার মৃত্যু হল। তবে তার মৃত্যুর পর অদৃশ্য এক উপাখ্যান দেখা দিল : শান্তশিষ্ট ছোট

আমলা রূপ বদলিয়ে হল ভয়ঙ্কর এক প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোক, সমাজের কাছে যে তার দ্বারা করা ক্ষতি পূরণের দাবি জানাল।

বস্তুবাদ, পণ্যজনিত নিয়তিবাদের মতো ধরনের নিঃসঙ্গ চেতনার পাশাপাশি অন্য এক ধরনের নিঃসঙ্গ চেতনাও দেখা দেয় — ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে কর্মতৎপর পন্থা, ব্যক্তিত্বের 'বাজার-সর্বস্য' ভাবমূর্তি। বস্তুবাদের চিরাচরিত মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তিকে নানা বস্তু দ্বারা সুরক্ষিত ঘেরটোপের মধ্যে থাকা এক ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি রূপে এঁকে থাকলে, বাজার-সর্বস্য ভাবমূর্তি ব্যক্তি বিশেষের অধিকারের বাকি সব গুণকে তথা চারিত্রিক নানা বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, এমনকি নিজের মনের নানা অনুভূতিকেও পণ্যে রূপান্তরিত করে। 'সবকিছুই বেচার জন্য!' — 'বাজার-সর্বস্য' চেতনার এই হল স্লোগান। সদা পরিবর্তনশীল বাজার-তালিকার যেকোন পরিস্থিতিতে 'নিজের চাহিদা' বজায় রাখা, আলোচ্য মুহূর্তে তোর যেমনটি হওয়া উচিত, সে রকম হওয়া — এই প্রচেষ্টা মানুষের সদৃশ্য হওয়ার অনুভূতি খোয়ায়। 'হওয়া' ও 'মনে হওয়ার' মধ্যে, যথার্থ ব্যক্তিত্ব সত্তা ও তার সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য তার ভূমিকা হারায়। মানুষ আর কোন ভূমিকা পালন করে না, সে শুধু আলোচ্য প্রতি মুহূর্তে তা হয়ে ওঠে, সমাজ যাকে দেখতে চায়, সমাজে যার প্রয়োজন আছে। আমেরিকান মনঃস্তাত্ত্বিক আর লিফটনের সূক্ষ্ম লক্ষ্য অনুসারে, এ হল ধরা-ছোঁয়ার বাইরের 'কেঁচো-মানুষ'।

অদূর অতীতে নানা বস্তুর অধিকারী হওয়ার অনুভূতি ব্যক্তিত্বকে কেন আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল, 'সদৃশ্য হওয়ার অনুভূতি' জোরদার করেছিল, সমাজ থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বাধীন থাকার শক্তি যুগিয়েছিল ? অদূর অতীতে 'হওয়ার' — অর্থাৎ আত্মসত্তার, স্বনির্ভর, স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অর্থ ছিল 'আছে', আর যত সম্ভব বেশি (জিনিস, ইত্যাদি)। তবে সুবিশাল নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যের আমলে আলাদা প্রতি খুদে মালিক যার অধিকারী, তা তাদের স্বনির্ভর ও স্বাধীন থাকার গ্যারান্টি দেয় না। আলাদা আলাদা খুদে উৎপাদকের যা 'আছে', একচেটিয়াদের দ্বারা তা গ্রাস করা একই সময়ে তাদের স্বনির্ভরতার মোহ ভঙ্গ করে। এখন থেকে কিছু 'হওয়ার' জন্য, তাদের এই 'রূপধারন' করা উচিত, আলোচ্য বস্তু তাদের থেকে যার দাবি জানায়, সুবিশাল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যন্ত্রে তারা এক সদা পরিবর্তনশীল কর্মচক্রে পরিণত হয়। অধিকারী হওয়ার, বস্তুবাদের খোদ যুক্তির — যার আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বনির্ভর ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি রূপে, যা হাজির হয়েছে যুক্তিযুক্ত ও ঐতিহাসিক গণ্ডির দ্বারে — দরুন অসংখ্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তিত্বের মিশ্রন ঘটে, নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়।

আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার সুরেন্দ্র ভার্মা তাঁর 'পঞ্চমুখী মানুষ' নাটকে এই প্রক্রিয়াকেই সঘন নাটকীয় রূপক আকারে ব্যক্ত করেছেন : মঞ্চে একই সময়ে হাজির কয়েকজন 'মুখোশধারী', যারা

নায়ক মনমোহনের নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের তথা কর্মচারী, প্রেমিক, ইত্যাদির প্রকাশস্বরূপ। তারা তৎপর, সক্রিয় জীবনযাপন করে, তাদের আর রচয়িতার — প্রধান নায়কের কোন দরকার নেই, সে বরং তাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

'বস্তুসর্বস্য' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমরা তা বিবেচনা করেছি বুর্জোয়া সমাজে নিঃসঙ্গ চেতনার টিপিক্যাল প্রকাশ রূপে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ভোগ্যপণ্যজনিত মনোভাব প্রকাশ নিরীক্ষণ করা চলে। প্রথমেই বলা দরকার যে, সৌন্দর্যের প্রতি অতি সরল প্রচেষ্টা থেকে, যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্দশা ও বিনাশের পর সেই 'উত্তম জীবনের' যা সময় সময় জিনিস যোগাড়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছিল — চাহিদা মেটাবার ব্যাপারে গোটা এক পুরুষের আকাঙখা থেকে, এমনকি ভাবীকালের সম্ভাব্য দুর্দশা থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখার খাতিরে জিনিসপত্র যোগাড় করে 'সঞ্চিত রাখার' ব্যাপারে কোন এক সঙ্কীর্ণ-মনার প্রচেষ্টা থেকে বস্তুবাদের স্বকীয় 'যুক্তিকে' আলাদা করা দরকার। এসব ক্ষেত্রে কখনও লোকেদের উপর বস্তুর কর্তৃত্ব করার কথা বলা চলে না, খুব সম্ভবত, এ হল প্রয়োজন বোধের কর্তৃত্ব, প্রয়োজনের ব্যাপারে ভীতি। বস্তুবাদের প্রকাশ ঘটে শুধু আশু দাবিদাওয়া মেটার **পর**।

সমাজতন্ত্রের আমলে ভোগ্যপণ্যের মনোবৃত্তি অস্তিত্বের কারণ বহুবিধ। সর্বাগ্রে, এর পক্ষে উর্বরা জমিন হল পণ্য-অর্থ সম্পর্কের খোদ অস্তিত্ব। পরিকল্পনা-

ভিত্তিক অর্থনীতির পরিস্থিতিতে জটিল এক পরিচালন কর্মচারী-ব্যবস্থার উপস্থিতি — সুবিদিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আমলার অবস্থান পাকাপোক্ত করার পক্ষে ভিত্তিস্বরূপ, যার কাছে 'রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য রূপান্তরিত হয় তার ব্যক্তিগত লক্ষ্যে, **পদলাভের পিছনে দোড়দৌড়ে, পদোন্নতির লক্ষ্যে**।'* এইভাবেই ভোগ্যপণ্যের মনোবৃত্তি সুবিদিত পরিস্থিতিতে সেই ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করতে পারে, যার অবস্থিতি পণ্য-অর্থ সম্পর্কের গণ্ডির বাইরে।

তবে ভোগ্যপণ্য মনোবৃত্তির সুগভীর ভিত্তি — ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করেছে। তাই এই সর্বপ্রথম বস্তুবাদ, বস্তুর কর্তৃত্ব অতিক্রম করার অবজেকটিভ নানা পূর্বশর্ত দেখা দেয়। সমাজতন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোগ্যপণ্য মনোবৃত্তির বিনাশ ঘটায় না, খুব সম্ভবত তার আমলে নানা রকমের মূল্যবোধজনিত প্রবণতার মধ্যে **বোঝাপড়ার সম্ভাবনা** দেখা দেয়, যা ইতিমধ্যেই বস্তুর মধ্যে নিহিত নানা গোপন 'সুপার ন্যাচারাল' গুণাগুণ বঞ্চিত করতে সাহায্য করে।

সেই ১৯২৭ সালে লিখিত সোভিয়েত লেখক ইউ. কে. ওলেশা'র 'ঈর্ষা' উপন্যাসে নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঠিক এই অন্তরের তর্কমূলক ব্যাপারটিই উন্মোচিত হয়েছে, যা ব্যক্তিরূপ লাভ করেছে

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ১, পৃঃ ১৯৫ (রুশ সংস্করণ)।

একে অন্যকে ভালোবাসা ও ঈর্ষা-করা দুই ভাইয়ের চরিত্রে। তাদের একজন — আন্দ্রেই, নতুন, যন্ত্রীকৃত সামাজিক উৎপাদনের, নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির, নতুন যৌথ ধরনের ব্যক্তিত্বের সমর্থক। অন্যজন, ইভান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মনোবৃত্তির ধারক-বাহক, যা তার কাছে মূর্তরূপ লাভ করেছে বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণের মাধ্যমে। নিজ রান্নাঘরের উনুন ও আগুন, বালিশ ও জীবনযাত্রার সবকিছু খুটিনাটি খুইয়ে আমরা নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বঞ্চিত হতে পারি, 'আমরা প্রত্যেকে নিজের বালিশে শুতে চাই'। বালিশ হল 'আমাদের কুলচিহ্ন', 'আমাদের ধ্বজা'। বস্তুর জগৎ থেকে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবিচ্ছেদ্য, তাকে আলাদা করা যায় না, সে যেমনটি বলে, মানুষকে নানা বস্তু থেকে বঞ্চিত করে, আমরা তাকে তার প্রাণ থেকে বঞ্চিত করি।

এই দুই প্রবণতার সংগ্রাম প্রত্যেক মানুষের মনে আজও চলছে, এর গতিবিধির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে সোভিয়েত সমাজে ঘটমান জীবনের সব দিকের পুনর্নির্মাণের গতিহার। তবে এও চাক্ষুষ যে, সোভিয়েত সমাজে পরিভোগীর বিরুদ্ধে মাথা তোলা উচিত কোন হাবা-গোবা নিঃস্বার্থ লোকের নয়, যে কিনা বস্তুর প্রতি সব রকমের আগ্রহ বঞ্চিত, বস্তুর জগৎকে ভয় পায়। কেননা বস্তু ভীতি — এ হল অধিকারের অনুভূতির ভিত্তিতে গড়া বস্তুবাদের ঠিক উল্টো দিক। এমন লোক বস্তুর প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবাপন্ন এ কারণে যে,

তাতে অধিকারের জিনিস বিনা অন্য আর কিছুই সে তাতে দেখে না।

বস্তুর প্রতি এমন আচরণ, যথা, তা হল অসংখ্য মানবিক প্রচেষ্টার ফল, মানুষের চিন্তা, দক্ষতার রূপায়ণ, নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র — এ হল সেই ধরনের আচরণ, যার কল্যাণে মানুষ শুধু নিজের অদ্বিতীয় সত্তাকে, 'নিজেকে রক্ষা' করেছে তাই নয়, বরং নিজের নানা সম্ভাবনা উন্মোচন, সৃজনী দক্ষতা প্রকাশ করতে, কল্পনার বিকাশ ঘটাতে পেরেছে। দার্শনিক ভাষায় বললে, বস্তুর প্রতি সম্পর্ক হওয়া উচিত **বস্তু-স্বীকার** ও **বস্তু-অস্বীকার** করার এক একক আকার

৪। অপরিচিত

পরিভোগী-মানুষ তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে নানান বস্তু, ঐতিহ্য, মাত্রা ও আদর্শের স্বকীয় এক বেড়াজাল দ্বারা ঘিরতে সচেষ্ট, কেঁচো-মানুষ — নিঃসঙ্গ চেতনার একমাত্র ভাবমূর্তি নয়। মানুষ সম্বন্ধে অন্য এক ধারনাও বহুল প্রচলিত, যেমন, সে হল দেউলিয়া-হওয়া, সমাজের কাছে, তার চারিপাশের আত্মীয়-স্বজনের কাছে, খোদ নিজের কাছে অপরিচিত। তার পক্ষে সমাজের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়া সম্ভব নয়। 'এ দুনিয়ায় আমাদের প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, — এ কথা আমরা পড়ি সমারসেট মমের এক উপন্যাসে জনৈক অপরিচিতের স্বকীয় ধরনের

জীবন লক্ষ্য রূপে, — ...আমাদের হৃদয়ের রক্তের অন্যান্যদের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করার জন্য আমরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা চালাই, তবে তারা জানে না কীভাবে সেসব গ্রহণ করবে, তাই আমরা নিঃসঙ্গভাবে জীবনে ঘুরে ফিরি, নিজেদের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে একেবারে পাশাপাশি, কিন্তু তাদের সঙ্গে একত্রে নয় — তাদের না বুঝে আর তারা আমাদের না বুঝে।'*

পশ্চিমে আধুনিক মানুষের চেতনায় এমন মনোভাবের প্রসার ঘটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ব্যবসা একচেটিয়া হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবাধ কারবার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়া, ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনায় হতাশ হওয়ার দরুন দেখা দেয় 'যোগদান না করার নন্দন তত্ত্ব', সরকারী ভাবাদর্শ দ্বারা চালু নানা আচরণ বিধি। মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় বাধাদান। বিদ্যমান বুর্জোয়া সমাজে 'জীবন গড়া' এবং একই সঙ্গে নিজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশের, স্বাধীন জীবন অবস্থান টিকিয়ে রাখায় সক্ষম হওয়া — অসম্ভব ব্যাপার। ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানী আ. মোলের মতানুসারে, মানুষের জীবনের সব দিককে নির্দিষ্ট ছকের মতো করা এবং একই সময়ে বহুরূপী সামাজিক ছকগুলির 'সংমিশ্রন', সেগুলির বিশৃঙ্খল অবস্থা, 'রঙ-বেরঙের' চিত্রের দরুন আধুনিক সমাজে ব্যক্তিত্ব স্বাধীন নির্বাচনের

---

* স. মম। নির্বাচিত রচনাবলী, দুই খন্ডে, খঃ ১, ১৯৮৫, পৃঃ ১৪৯-১৫৫ (রুশ সংস্করণ)।

সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভিত্তি অস্বীকারের, সমাজের সবকিছু থেকেই মানুষের 'মহান প্রত্যাখ্যানের' প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্তটি করা হয় ঠিক এর থেকেই। নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার পরম রূপদানের ফল এমন হয়েছে যে, সমাজকে ব্যক্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক রূপে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে।

তবে ব্যক্তিত্ব ও সমাজের এমন পরম পরস্পর-বিরোধী অবস্থান, ব্যক্তিত্বকে পরম আত্মমূল্যবান রূপে ঘোষণা করা প্রকৃত পক্ষে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে ও ভোগ্যপণ্যজনিত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ছিল না, বরং তা ছিল নিঃসঙ্গতার আরও এক ধরন। যেকোন বস্তুকে উপকরণ রূপে ব্যবহার করা চলে, তবে ব্যক্তিত্ব সর্বদা হল খোদ লক্ষ্য, তা কখনই উপকরণ হতে পারে না, এই হল ব্যক্তিত্বের আত্মমূল্যজনিত ভাবাদর্শের মূলকথা। আলোচ্য ক্ষেত্রে বস্তু হয়ে ওঠে সেই সবকিছুই, যা ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া যেকোন বাস্তবিকতাই। এ ক্ষেত্রে যেমন স্বীকৃত নানা সামাজিক মূল্যবোধ, তেমনই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈষয়িক ভাণ্ডার — সবকিছুই হল 'বস্তু' ব্যবহার করার লক্ষ্যবস্তু। তবে মানুষ দ্বারা সৃষ্ট সবকিছুতেই, 'বস্তুর জগতে' রয়েছে মনুষ্য আশা-আকাঙ্খা, দক্ষতার ছাপ, এ হল জ্ঞান, নিপুণতা, ইচ্ছাশক্তির ঘনীভূত এক পিণ্ড, তাতে রূপলাভ করেছে, বস্তু-আকার লাভ করেছে মানবিক সারবস্তু। তাই যা 'ব্যক্তি' নয়,

সে সবকিছুর প্রতিই ভোগসর্বস্য-ব্যবহারজনিত আচরণ — বস্তুতপক্ষে এ হল স্বয়ং মানুষের সামাজিক প্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

কিরগিজিয়ার লেখক চিঙ্গিজ আইতমাতভের 'যুপকাষ্ঠ' উপন্যাসে প্রকৃতির প্রতীক এক নেকড়ে বাঘিনীকে — যে তার শিশু বালককে নিয়ে গিয়েছিল — তাড়া করে আচমকায় তাকে হত্যা করে। আমাদের কাছে বুনো ও শত্রুভাবাপন্ন মনে হওয়া প্রকৃতি বিনষ্ট করে আমরা খোদ নিজেদের, নিজ ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করি, তবে তা আমরা বুঝি, অনেক, অনেক কাল পরে — এই বুঝি-বা লেখক আমাদের বলতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত মতাবস্থান সমর্থকদের মতানুযায়ী মানুষের কোন্ কোন্ 'নিঃসঙ্গহীন' গুণ রয়েছে, যেগুলি কিনা তার রক্ষা করা ও সমাজের দমনমূলক প্রভাবের বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখা দরকার? যেহেতু যেমন ভাষা, তেমনই সুষম চেতনালাভের ক্ষমতা, তেমনই নৈতিকতা ও ঐতিহ্য — এ সবই সামাজিক বিকাশের ফল। মার্কুজের মতানুসারে, সর্বজনস্বীকৃত সামাজিক আদর্শ অনুসরণ করে ব্যক্তিত্ব রূপে মানুষ নিজেকে ধ্বংস করে, 'একরূপী' মানুষে পরিণত হয়। সমাজ — এ হল 'নানা নিঃসঙ্গ ও বিভিন্ন অবয়ব ধারণকারী নানা নামহীন শক্তির সামগ্রিক যোগফল।'* সমাজের

* H.Marcuse. One Dimensional Man. Studies in The Sociology of Advanced Industrial Society. Beacon Press, Boston, 1964, P.12

'দমনমূলক' প্রভাব থেকে অবশেষে মুক্তিলাভ করে মানুষের মনে হয় কিছু কিছু 'আশু' দাবিদাওয়া রয়ে যায়, যেগুলি সুদীর্ঘ কাল ধরে দলিত-মথিত হয়েছিল, 'সমাজের' এক স্বকীয় ধরনের 'সেন্সারের', 'যুক্তির সেন্সারের' মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক এই যুক্তিই সমাজের সেইসব দাবিদাওয়া ধরতে সক্ষম, যেগুলি উত্থাপিত হয়েছে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কাছে, সবার জন্য যেগুলি সাধারণ। যথার্থ, অবিচ্ছেদ্য 'মানবিক গুণাবলীকে' কখনই সুষম আকারে পেশ করা যায় না, ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সেগুলি মিলেমিশে একাকার, তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, আর সেগুলি কোনমতেই মানুষের সামাজিক সত্তার সঙ্গে জড়িত নয়। সুতরাং দেখছি যে, নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার পরম রুপদানের দরুন প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক আদিরূপকেই অস্বীকার করা হয়।

এমন 'ষোলঅনা অসম্মতিবাদের' (total conformism) সমর্থকদের মতে মানুষের প্রচেষ্টা কী হওয়া উচিত? সেই সমাজের রূপটি কেমন হওয়া উচিত, যেখানে মানুষ সাধারণ নানা বিধি-নিষেধ, ঐতিহ্য, নিয়মকানুনের চাপের কবলে পড়বে না? সর্বাগ্রে নিজেকে বদলানো, জগতের প্রতি নিজের চেতনাকে সৃজনমূলক ও সমালোচনামূলক ধরনের তৈরি করা দরকার। প্রথম দৃষ্টিতে এমন শিক্ষামূলক পন্থা এবং মানুষ সম্বন্ধে ঐতিহ্যমূলক নৃতাত্ত্বিক বোধের মধ্যে খুব একটা ফারাক চোখে পড়ে না। অতীতের দার্শনিকদের কাছেও মানুষ সৃষ্টি শুরু হয়েছিল চেতনার বিশেষ প্রস্তুতি দ্বারা, স্বীকৃত নামযশের ব্যাপারে,

সর্বজনস্বীকৃত সত্যের ব্যাপারে, বিদ্যমান নানা ঐতিহ্য ও আচার-প্রথার যুক্তিসিদ্ধতার ব্যাপারে 'বিশ্বজনীন সন্দেহ' দ্বারা। ১৭-১৮শ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের উক্তি অনুযায়ী, সত্যের পথ উন্মোচনের জন্য প্রয়োজন হল মানুষের চেতনায় বাসা-বাঁধা 'নানা ভূতকে', অন্ধ বিশ্বাসকে, চিন্তাধারার জাড্যতাকে, অভ্যস্ত শব্দ-ব্যবহারকে খতম করা।

তবে ১৮শ শতাব্দীর দার্শনিকদের কাছে 'বিশ্বজনীন সন্দেহের' কর্মপদ্ধতি এর জন্য দরকার হয়ে থাকলে — যাতে করে 'যুক্তির পরিষ্কার আলোক-উজ্জ্বল' এক পথ উন্মুক্ত করা যায়, যা স্রষ্টা-মানুষের ও জগৎ পুনর্গঠনকারীর পথে আলো দেখাবে — আধুনিক পশ্চিমের চিন্তাবীরদের কাছে ব্যক্তিত্ব গঠন কর্মসূচির বিধ্বংসী অংশটিই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ম. দিউফ্রেন্নার মতে, আচরণ-বিধির সুকঠোর নিয়ম-ভাঙা কোন এক গণ-উৎসব-ক্রীড়ায় মানুষকে আকর্ষণ করার ফলে, নানা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নিঃসঙ্গ মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানুষের পুর্নজন্ম ঘটতে পারে, জগতের সঙ্গে তার নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। নানা সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে, নিজের ব্যাপারে আচরণ-বিধির বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এমন 'নবজন্ম-লাভ-করা মানুষের' সমাজের রদবদল ঘটানো উচিত।

সমাজের সঙ্গে নতুন মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাপারে 'অসম্মতিবাদের' সমর্থকদের ধারণাটি কেমন? এটা চাক্ষুষ যে, সুকঠোর শৃঙ্খলার অনুমানকারী সুদীর্ঘ ও কঠিন বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সংগ্রামীদের

সাংগঠনিকতা, কাজকর্মের সুস্পষ্ট এক কর্মসূচির উপস্থিতি কখনও এক 'মুক্ত' নতুন ব্যক্তিত্ব গড়তে পারে না। ফরাসী লেখক পি. লেনে তাঁর প্রাবন্ধিক-কাহিনী 'অবিপ্লব' — এ লিখেছেন, সব রকমের যৌথ-সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিত্ব দ্বারা অর্জিত অপূর্বতাকে পুনরায় ধ্বংস করবে। শ্রমিকরা বলে শুধু যৌথভাবে, নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে, এই রচনার প্রধান নায়কের মতে, 'এ কণ্ঠ একজন কোন শ্রমিকের নয় ; এমনকি কিছু সংখ্যক কোন শ্রমিকেরও নয়, বরং শ্রমিকদের 'সাধারণ' কণ্ঠ। তাই এমন জমাট, 'গুরুভার' উক্তির রয়েছে সাধারণের ব্যাপারে এক দমনমূলক ক্রিয়া, যা ব্যক্তি বিশেষের অপূর্বতাকে পদদলিত করে।* এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' অন্য কোনকিছুর সঙ্গে বিন্দুমাত্রও মিল থাকা, এমনকি 'খোদ নিজের' সঙ্গেও মিল থাকা উচিত নয়। তাই সমাজের সঙ্গে বিশৃঙখল সংগ্রাম, দিউফ্রেন্না যেমনটি লিখেছেন, আর তার সঙ্গে সুসংগঠিত সংগ্রামকে অস্বীকার করা, তেমনই তার বশবর্তী হওয়া — এই হল সমাজের সঙ্গে নতুন 'মুক্ত', বহুবিধ-অভিপ্রায়ী ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্ক ; এক ধরনের 'সার্বিক অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ' : শ্রমিক প্রতিরোধ গড়ে মালিকের বিরুদ্ধে, ছাত্র — শিক্ষকের, চার্চকর্মী — বিশপের, সৈনিক — অফিসারের,

---

* দ্রষ্টব্য : লেনে পি.। অবিপ্লব। — তিন ফরাসী কাহিনী। মস্কো, চিরায়ত সাহিত্য, ১৯৭৫, পৃঃ ১৯৮।

অপরাধী — বিচারকের বিরুদ্ধে, অভ্যস্ত ঐতিহ্যমূলক নানা সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়, কর্মপদ্ধতি বিকল হয় এবং দেখা দেয় অভূতপূর্ব ব্যাপার-স্যাপার।

পুরনো সমাজের ভিত্তিস্বরূপ সামাজিক জুলুমবাজি, কর্তব্যবোধের বদলে আসা উচিত 'তৃপ্তিলাভের নীতি'। ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যকার ফাটল অতিক্রম করা এখানে ঘটে ব্যক্তিত্ব অনুসৃত নানা নিয়মকানুন, ঐতিহ্য, বস্তুর জগতের সাহায্যে সমাজের প্রতি ব্যক্তিত্বের অভ্যস্ত হওয়ার মূল্য দিয়ে নয়, আর এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব তার এই 'স্বার্থপরী' নীতিও বজায় রাখে : 'নেকড়ের পেটভর্তি, ভেড়ারাও আস্ত'। বরং উল্টো ; সমাজের নিজস্ব প্রকৃতি বদলানো দরকার, এবং তা ব্যক্তিত্বের সেইসব নতুন দাবিদাওয়ার প্রতি অভ্যস্ত হয়ে, যেগুলি যুক্তির, নৈতিকতার নানা মাত্রার, নান্দনিক নিয়মকানুনের চমৎকার বিছানায় — অর্থাৎ কিনা 'সার্বজনীন' রূপে স্থানলাভ করতে পারে না।

এবার আসুন বিচার করি, পরিভোগী — মানুষ ও অসম্মত-মানুষের মতাবস্থানে সত্যি সত্যিই কি অনেক অমিল। এর মিল-অমিল বোঝা অস্ট্রীয় মনঃস্তাত্ত্বিক সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মতধারার প্রতি দৃষ্টিদানে আমাদের সাহায্য করবে, যাঁর প্রতি ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে যেমন সম্মতিবাদ, তেমন অসম্মতিবাদ পন্থার সমর্থকরাও 'উদাসীন নন'।

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সুগভীর ভিত্তিটি তৈরি কিছু কিছু সুপ্ত জৈবিক কামনা দ্বারা, যেগুলি

অবশ্য সর্বোতভাবে চাপা থাকে মানুষের একান্নবর্তী অস্তিত্বের দরুন। 'সব সংস্কৃতিরই ভিত্তি হল শ্রমের ব্যাপারে জুলুমবাজি এবং নানা কামনা থেকে বিরত থাকা।'* মানবজাতির টিকে থাকার জন্য এই কামনা চাপা অত্যাবশ্যক, তবে মানুষের পক্ষে তা সহজ নয়। নানান আগ্রাসী, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের অপরাধের, স্নায়ু-চাঞ্চল্যের রূপলাভ করে নানা সুপ্ত কামনা নিত্য আত্মপ্রকাশ ঘটায়। প্রথম দৃষ্টিতে দুই পরস্পর — বিরোধী অবস্থানের পারস্পরিক-সম্পর্কের 'গোপন রহস্যটি' উদ্‌ঘাটিত হয় ফ্রয়েডের নিম্নলিখিত উক্তির প্রতি নজর দিলে: তিনি লিখেছেন, 'প্রথম প্রথম এ মনে হলে যে, সংস্কৃতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য হল জীবনের সমৃদ্ধিসাধনের জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিজয়লাভ... তাহলে আজকাল... চূড়ান্ত হল এ প্রশ্ন, লোকেদের পক্ষে সেই আত্মবলির গুরুভার কি কোন এক হারে কমানো সম্ভব হবে, যার মূলকথা হল নিজেদের নানা কামনা থেকে বিরত থাকা, লোকেদের কি সেইসব আত্মবলির সঙ্গে আপস করানো যাবে, যেগুলি তাদের অতি অবশ্যই করতে হয়, আর এইসব আত্মবলির জন্য কীভাবেই-বা তাদের পুরস্কারে ভূষিত করা যায়?'**

'পরিভোগী-মানুষের' ভাবমূর্তি বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের এমন এক পর্যায়ের প্রতিফলন ঘটিয়ে

---

* এস. ফ্রয়েড। এক মোহের ভবিষ্যৎ। মস্কো, ১৯৩০, পৃঃ ১২ (রুশ সংস্করণ)।

** ঐ, পৃঃ ১০।

থাকলে, যখন, ফ্রয়েডের উক্তি ব্যবহার করলে, সবচেয়ে জরুরী মনে হয়েছিল জীবনের নানা সমৃদ্ধি অর্জনকে, তাহলে 'অপরিচিতের' ভাবমূর্তি — যে কিনা সমাজের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেছে, যে সমাজের দাবিদাওয়া পালনে অনিচ্ছুক — প্রতিফলন ঘটায় সেই পর্যায়ের, যখন নিজের নানা কামনা থেকে বিরত থাকার আত্মবলিকে 'প্রচন্ড গুরুভার' বলে মনে হয়েছিল। 'অসম্মতিবাদের' পক্ষপাতীরা 'পুরস্কার-প্রদানের' নানা মায়াবী উপকরণের প্রস্তাব দেয়, যেগুলি মানুষকে আত্মবলির গুরুভার সইতে সাহায্য করবে সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীনস্থ হওয়া দ্বারা।

সুতরাং, এমন মতাবস্থান থেকে মানুষের প্রকৃতি অসামাজিক, ব্যক্তিত্ব ও সমাজের মধ্যে ফারাক — অনিবার্য, আর এই ফারাক অতিক্রম করার সব প্রচেষ্টা — আত্মসন্তুষ্টির প্রতারণা মাত্র, এক ধরনের সামাজিক পুরাণ, যার কথা মানুষ শেষ-পর্যন্ত বিশ্বাস করতে সক্ষম নিজের নানা শত্রুতামূলক ঝোঁকের কল্যাণে। এবার আসুন দেখা যাক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের একতার কী কী মায়াবী প্রস্তাব 'আধুনিক পুরাণ' পেশ করছে।

৫। যুক্তিশক্তির স্বপ্ন

এমন একতার অন্যতম এক পদ্ধতি — মানুষের মধ্যে 'যৌথ চেতনাহীনতার' জাগরণ ঘটানো।

সবচেয়ে পারম্পরিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বুঝি-বা এক অপূর্ব উপায়ে হঠাৎ চরম যৌথবাদে, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের পুরোপুরি মিলে রূপান্তরিত হতে শুরু করে, যে-ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রতিরূপ এমনকি আদিম গোষ্ঠী সমাজেও খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর।

একেবারে গোড়ায় মানুষের মধ্যে একতার প্রচেষ্টা উপস্থিতির কল্পকথা অতি জরুরী ছিল সেই ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে, যে সমাজ থেকে 'মুক্তিলাভ' করছে, তবে বৈপ্লবিক প্রতিবাদের নানা সামাজিক-সংগঠনজনিত আকারের ভয়ে ভীত, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সচেষ্ট, অথচ সুদীর্ঘ কাল ধরে একাকী অবস্থা সইতে ও সক্রিয় সৃজনী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা গড়ে-ওঠা শূণ্যস্থান ভরে তুলতে অক্ষম। বুর্জোয়া সমাজে নানা ব্যক্তি বিশেষের সমন্বয়সাধনের নতুন নতুন ধরন দেখা দেওয়া — এমন 'মুক্তির' আইনসঙ্গত ফল। দস্তয়েভ্স্কির 'ভূতপ্রেত' উপন্যাসের এক নায়ক যেমনটি বলেছেন : 'অসীম মুক্তি দিয়ে শুরু করে আমার সমাপ্তি ঘটে অসীম স্বেচ্ছাচার দ্বারা।'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও 'যৌথপ্রথার' এক ধরনের সম্মিলন, বিদ্যমান নানা বিধিনিষেধ ভঙ্গের প্রতি প্রবল নৈরাজ্যবাদী আকর্ষণ ও সেগুলি বিনা থাকার ব্যাপারে ভীতি — নিত্য এ ছিল পেটি-বুর্জোয়া চেতনার বৈশিষ্ট্য। মার্কসের উক্তি অনুযায়ী, মানুষ মুক্ত 'এটা বা সেটা এড়ানোর নেতিবাচক শক্তির দরুন নয়, বরং নিজের যথার্থ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশের ইতিবাচক শক্তির

দরুন।'* তবে সমাজকে এড়িয়ে নিজেকে প্রকাশ করা নয়, বরং সে সবকিছুর সদ্ব্যবহার করে, সমাজ মানুষকে যা দিয়েছে, মানবজাতির ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল ধরে যাকিছুই তা মানুষকে দিয়েছে — যুক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, আবেগ ও স্মৃতি, নানা অভ্যাস, ঐতিহ্য, আচারপ্রথা, অধিকার ও কর্তব্য। সব রকমের সক্রিয়-পুনর্গঠনমূলক কাজের জন্য প্রয়োজন হয় নানা সুস্থায়ী লক্ষ্যের, নানা মাধ্যমের সুষম নির্বাচনের, তা নির্ভর করে অবজেকটিভ অবস্থার নানা নিয়মকানুন জানার উপর। অন্যথায় সামাজিক জীবনযাত্রার সমস্ত সুষম ধরন মুক্ত মানুষ এক স্বাধীন অবস্থা গ্রহণের, পারিপার্শ্বিক জগতের ব্যাপারে নিজস্ব এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রণয়নের, নিজের মতামত প্রকাশের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়।

নিজের উপর থেকে যুক্তিশক্তির, নান্দনিক বিধি-নিষেধের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে মানুষ যেখানে সহজে ও সুখে বসবাস করবে, তেমনই এক ধরনের সমাজের প্রস্তাব এককালে দিয়েছিলেন কানাডার দার্শনিক এম. ম্যাকলিউয়েন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাস-করা যৌথপ্রথার সুপ্রাচীন অনুভূতির প্রতি আবেদন জানিয়ে ম্যাকলিউয়েন না ব্যাপক ক্রীড়াকর্ম, না মানুষকে মুক্ত-করা শিল্পকলার শক্তি — কোনকিছুর উপরই আশা রাখেন নি। মানুষ ও সমাজের মধ্যে,

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ২, পৃঃ ১৪৫ (রুশ সংস্করণ)।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও রীতিমাফিক দুনিয়ার মধ্যকার খাদের বিলোপ ঘটবে... 'আপনা আপনি', যান্ত্রিক প্রগতির দুর্বার গতিপ্রবাহের কল্যাণে। এমন সমাজের সৃষ্টি — সেই মানুষ, যার জীবনে আশ্চর্য-করা আধুনিক প্রযুক্তি শুধু যে দুনিয়ার সঙ্গে তার মেলামেশার অভ্যস্ত নানা পদ্ধতিরই স্থানদখল করে তাই নয়, এমনকি চিন্তাভাবনার জন্য অতি অল্পও সময় না রেখে তা তার আত্মিক জীবনকে পুরো দখল করে, এ কোন সঙ্কীর্ণ-মনা স্বার্থপর, ভিনদেশী, 'সমাজচ্যুত' লোক নয়, যে কিনা স্বেচ্ছায় নিজেকে লুকিয়েছে, নিজের 'আত্মিক মঠে' স্থান নিয়েছে। এমন লোকের জীবনে কখনও কোন 'বিশেষ', সমাজের পক্ষে বিপরীত-ধর্মী দাবিদাওয়া দেখা দিতে পারে না, যেহেতু 'ইলেকট্রনিক বিপ্লবের' যুগে ঠিক সমাজই নানা ব্যাপক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবস্থার সাহায্যে অনুভূতি প্রবণতার সারবস্তুকে পুরোপুরি নির্ধারণ করে। তা সৃষ্টি করে গোটা এক জগৎ, যাতে মানুষ বাস করে, যার বাইরে জীবনের নানা বৈপরীত্য, অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু, গরিবি, সামাজিক নিপীড়ন, বৈপ্লবিক সংগ্রাম সহ অবজেকটিভ বাস্তবতাকে দেখা অসম্ভব। নিজের ব্যক্তিগত 'আমির (অহং)' জন্য স্বার্থপর : ভীতি থেকে মনঃপীড়াজনিত চিন্তাভাবনা থেকে সমাজ মানুষকে নিস্কৃতি দেয়। নিজের নানা কর্মের জন্য ব্যক্তি বিশেষের উপর থেকে 'দায়িত্বের বোঝা' 'ইলেকট্রনিক সমাজ' হটায়, সে তাকে ফিরিয়ে দেবে তার বংশজনিত কর্তৃপক্ষের

বশবর্তী হওয়া সহ মানবজাতের 'বাল্যকাল'।

আমেরিকান কল্পকাহিনী-লেখক আর. ব্রাডবেরি তাঁর '৪৫১° ফারেনহাইট' কাহিনীতে বুঝি-বা তেমন এক সমাজেরই মডেল হাজির করেছেন, কানাডার সেই দার্শনিক যাকে আদর্শ রূপে মনে করেন, এবং তা বিকাশের যুক্তির পরিণাম কী হবে তা দেখিয়েছেন। যে-সমাজে চিন্তা করার ক্ষমতাকে অনির্ভরযোগ্যতার সমার্থক রূপে গণ্য করা হয়, যেখানে মানুষ বাড়িতেও বাস করে এক বিশেষ জগতে, আধুনিক যন্ত্রপাতির অবাক-করা ফলের বেড়াজালে, যে-সমাজে টিভির সাহায্যে শহরের সব বাসিন্দাকে পুলিশে পরিণত করা যায় — সে সমাজ নিজে থেকেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাতে এমন কোন শক্তি নেই, যা সামরিক প্রচারের বিরুদ্ধাচারণ করতে সক্ষম, মানবজাতিকে যা যুদ্ধের জালে জড়িত করে, যে-যুদ্ধ আর টিভির পর্দাতেই চলে না, বরং চলে জীবনে।

এটা চাক্ষুষ হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে মানুষের মিল থাকে না, যাকে বরং কৃত্রিমভাবে গড়া এক 'জীবনযাত্রার পরিবেশের' সঙ্গে, প্রকৃত নানা সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংঘর্ষকালে একতার মোহ ভেঙে চুরমার হয়।

আধুনিক পশ্চিমা সমাজের প্রয়োজন শুধু নিষ্ক্রিয় সামাজিক অবস্থান গ্রহণকারী 'কোঁচো-মানুষেরই', 'লো-কেটরমানুষেরই' নয়। তার প্রয়োজন সেইসব লোকেরও, 'উপর-মহলে যাবার' জন্য যারা নিরলসভাবে প্রচেষ্ট,

আর সেইসব ছেলে-ছোকরার, যারা আধুনিক সামরিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে; সমাজের দরকার সেইসব লোকের, তার নানা আদর্শে যারা বিশ্বাসী এবং সেগুলির বাস্তবায়নে যারা নাছোড়বান্দা প্রচেষ্টায় সক্ষম। পশ্চিমের সমাজের অবজেকটিভভাবে বিদ্যমান নানা দাবিদাওয়া অনুসারে সমাজের সঙ্গে মানুষের একতার আরও এক তথা **নয়ারক্ষণশীল** রকমফের দেখা দেয়।

নয়ারক্ষণশীলতার অন্যতম এক ভাবাদর্শী আর. স্ক্রাটন, এভাবে তাঁর মূল ভাবধারাকে ব্যক্ত করেছেন: 'এ হল এমন এক গঠন-ব্যবস্থার স্বীকৃতিদান, যা আংশিকের সামনে সাধারণকে, ব্যক্তিগতের সামনে সামাজিককে, আইনের সামনে বিশেষ সুযোগকে প্রাধান্য দেয়।'* এই তত্ত্বের পরিসরে সমাজের সঙ্গে মানুষের একতা অর্জিত হওয়া উচিত 'শান্ত' বিপ্লব দ্বারা — ব্যক্তিত্বের চেতনায় আমূল রদবদল দ্বারা, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতির সব সাফল্য সুদৃঢ় হওয়ার দ্বারা, বংশগত জৈবিক প্রভাবের কর্মপদ্ধতি দ্বারা। ব্যাপক নানা যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা প্রকৃত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নিরাবয়ব কোন দর্শক-মানুষ নয়, বরং সক্রিয়, নাছোড়বান্দা, বিশ্বাসে ভরপুর ব্যক্তি বিশেষ, সমাজে তার দ্বারা দখল-করা নিজের 'ছোট্ট খুপরির' ব্যাপারে যার সুস্পষ্ট ধারণা আছে, এবং

* Scruton R. 'The Meaning of Conservatism', Penguin Books, 1980, p.189.

যা ছেড়ে সে বেরোতে সচেষ্ট নয় — এই হল নয়ারক্ষণশীলতার আদর্শ। প্রত্যেককে তার জায়গা-দেখানো এক 'সংগঠিত' সমাজ, যে-সমাজে সমতার আদর্শ অজানা এবং যা সমস্ত সামাজিক তারতম্য পাকাপোক্ত করতে ও 'প্রত্যেককে — নিজস্ব' সবকিছু দিতে প্রচেষ্ট, যে-সমাজে আছে মানুষের যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত প্রগতির ব্যাপারে বিশ্বাস এবং একই সময়ে বাধ্যতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম সমালোচনাবাদের ব্যাপারে ভীতি — এই দুইয়ের স্বকীয় ধরনের এক সম্মিলন। এখান থেকেই দেখা দেয় দুই অসংযোজনীয়কে — যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিবহির্ভূতকে — সংযুক্ত করার, নাগরিক আত্মচেতনার অনুভূতি জাগরণের এবং একই সময়ে — মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণ সংযুক্তির নৈতিকতা, পূর্বপুরুষদের ধর্মে বিশ্বাস জাগানোর প্রচেষ্টা। 'সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা নতুন নতুন বাস্তবায়ন সম্ভাবনা লাভ করেছিল — শাসনক্ষমতা ও বিজ্ঞানের সম্মিলন, চার্চ ও রাষ্ট্রের জোট, বিজ্ঞান ও ধর্মের সংশ্লেষণ। এর আগে আর কখনই প্ল্যাটো-কল্পিত শহর তার ঐতিহাসিক প্রতিরূপের এতো কাছাকাছি আসে নি।'*

পশ্চিমের সমাজ-বিজ্ঞানীরা অযথাই এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না, যেমন, ঐতিহ্যময়-স্তরভিত্তিক

* Mumford L. Utopia : The City and the Machine. Daedalus, Cambridge, (Mass.), 1965, Vol. 94, №1, p.280 .

নৈতিকতার পুনর্জন্ম, এক 'নতুন ভূদাস সমাজ' গড়া, সামন্ততন্ত্রের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার পদ্ধতিসমূহ প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ। যেহেতু ব্যক্তিত্বের কাছে 'সক্রিয়ভাবে' নতজানু ভঙ্গির বশবর্তী হওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়, যে-ব্যক্তিত্ব আজ বহুকাল হল সমাজের থেকে নিজের আপেক্ষিক স্বাধিকার অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে, সমালোচনামূলক চিন্তা করতে, সার্বজনীন সংস্কৃতির গোটা সম্পদ-ভাণ্ডার রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কালপঞ্জীর গরমিল, এই ধরনের ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাহীনতা, মধ্যযুগীয় 'স্তরভিত্তিক ব্যক্তির' সঙ্গে আধুনিক ধরনের ব্যক্তিত্বকে কাছাকাছি আনার খোদ প্রচেষ্টার অযৌক্তিকতা ফরাসী লেখক আর. — ভ. পাইয়েসের 'অভিযোগী' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। চরম পরিস্থিতিতে খুব বড় বহুজাতিক কোম্পানির উঁচু মহলের কর্মীদের সম্পর্কে আরও প্রকটভাবে মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদ, সামাজিক সোপান-প্রথার নির্মমতা সহ তার উল্লাস প্রকাশিত হতে থাকে। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের দরুন পৃথিবীর মাটি থেকে সেই কোম্পানির ভবনটি উধাও হয় এবং তার কথা লোকজনের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যায়। লেখক এখানে সেই সমাজের অনিবার্য ধ্বংসের চিন্তা উত্থাপন করেছেন, যেখানে সৃজনী ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে প্রেরণা অনুপস্থিত, যেখানে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতির নানা সাফল্য মানবিক সারবস্তু লাভ করতে অক্ষম।

আধুনিক পশ্চিমা জগতের ব্যক্তিত্বের 'নিঃসঙ্গ

সত্তার’ নানা মডেলের কথা আমরা এখানে আলোচনা করলাম। সেসবের মূলে রয়েছে ‘ব্যক্তি বিশেষ — ব্যক্তিত্ব — সমাজ’, এই পারস্পরিক যোগাযোগের জটিল ব্যবস্থা লঙ্ঘন। ব্যক্তিত্বকে হয় চরিত্রের ব্যক্তিগত নানা বৈশিষ্ট্যের (বাইরের দিক থেকে অদ্বিতীয়, তবে আকস্মিক বৈশিষ্ট্য) সদৃশ রূপে গণ্য করা হয়, নয় সাধারণ নানা মাত্রা, ধারণা, নিয়মের সাদামাটা এক ‘প্রচারযন্ত্র’ রূপে বিবেচনা করা হয়, যা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ, নিজস্ব, অন্যদের থেকে পার্থক্য সহ মতাবস্থানের অধিকার বঞ্চিত।

সমাজের থেকে ব্যক্তিত্বের যেমন বিচ্ছিন্নতা, তেমনই তার সঙ্গে ইতিমধ্যে বিকশিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার পুরোপুরি মিল — এ হল সেই ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গ সত্তার প্রকাশ, যা হল একক ও সাধারণের একতাস্বরূপ। হাজার হাজার সুতো দ্বারা তা সমাজের সঙ্গে জড়িত এবং একই সময়ে তা এক নিজস্ব, অদ্বিতীয়, ‘অসাধারণ প্রকাশ ভঙ্গিমার’ অধিকারী।

ব্যক্তিত্বের মধ্যে কীভাবে ও কী কী আকারে একক ও সাধারণের, জাতীয় ও সার্বজনীনের, ঐতিহাসিক ও ‘অমরের’ সমন্বয়সাধন ঘটে, তা বোঝার জন্য ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগতের প্রতি, এর মূল উপাদানসমূহ — বিশ্ববীক্ষা ও আবেগ, কল্পনা শক্তি ও স্মৃতি, ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার।

ব্যক্তিত্বের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অপ্রত্যক্ষ মাধ্যমস্বরূপ তার আত্মিক জগতের মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করার আগে বরং এই প্রশ্নের ব্যাপারে একটু ভাবা

যাক, প্রাচ্যে বসবাসকারী এবং পশ্চিমী দুনিয়ার অধিকারভুক্ত ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগতের নানা সাধারণ উপাদানের কথা বলা কি কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত?

৬। অমিলের মিল প্রসঙ্গে

পশ্চিমের অনেক তাত্ত্বিকের মতে, আধুনিক মানুষের 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' চেতনা সহ তার সমস্ত বিষাদজনক ঘাত-প্রতিঘাতের অস্তিত্ব, অপর, অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতির ব্যক্তিত্বের জীবনে নেই। এই মতাবস্থানের সারকথাটি রূপক আকারে ব্যক্ত হয়েছিল ইংরেজ লেখক ও কবি আর. কিপলিঙ্গ দ্বারা: 'পাশ্চাত্য হল পাশ্চাত্য, প্রাচ্য হল প্রাচ্য, আর তাদের মিল ঘটা সম্ভব নয়।' 'প্রাচ্য' (একে বোঝা হয় এক অন্য ধরনের জীবনযাত্রা, অন্য সংস্কৃতি, অন্য ব্যক্তিত্বের প্রতীক রূপে) বাস করে নিজস্ব নানা আইনানুসারে, তার রয়েছে সময়ের নিজস্ব হিসাব, নিজস্ব নানা আত্মিক মূল্যবোধ, মেলামেশার নিজস্ব ধরন। তাই ব্যক্তিত্বও এ জগতে একেবারে বিশেষ ধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ...'আমাদের আত্মিক জীবন-ব্যবস্থার খোদ ভিত্তিই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের' — বলেছেন জাপানের আধুনিক এক লেখক, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ইয়াসুনারি কাভাবাতা।*

---

* ইয়াসুনারি কাভাবাতা। জাপানের জন্ম-সৌন্দর্য। মস্কো, প্রগতি, ১৯৭১, পৃঃ ৩৯৮ (রুশ সংস্করণ)।

প্রাচ্যের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে এ কারণে যে, ঠিক প্রাচ্যই, প্রাচ্য জাতীয় ব্যক্তিত্বই পশ্চিমের নানা তাত্ত্বিক ও শিল্পীর চেতনায় স্থানলাভ করেছে 'নিঃসঙ্গ সমাজের' প্রকৃত বিদ্যমান বিকল্প রূপে। ঠিক সেখানেই আমরা খুঁজে পাই এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে সুষম একতায় অবস্থান করছে সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য, যুক্তি ও অনুভূতি, পশ্চিমের মানুষের 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' চেতনায় যেগুলি শত্রুভাবাপন্ন। অসংখ্য আত্মিক 'প্রাচ্য উপাসনা' (জার্মান লেখক হেরমান হেস তাঁর ছোট উপন্যাসের এই নামই দিয়েছিলেন) দ্বারাই গঠিত হয় আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত জ. সেলিঞ্জার ও হ. হেস, স. মম ও র. বাখের রচনাবলী, জি. পি. সার্তর, ক. ইউঙ্গ, এ. ফ্রম, প্রমুখের তাত্ত্বিক কাজকর্ম স্মরণ করাই যথেষ্ট হয়। ফ্রম প্রকৃতির প্রতি দু'জনের সম্পর্ক তুলনা করেছেন। একজন হলেন পশ্চিমের চিন্তাবীর, 'সত্যের অনুসন্ধানে যিনি জীবন্ত সবকিছুকে মেরে ফেলেছেন', এবং অন্যজন জাপানী কবি 'বাসিও' যাঁর ইচ্ছা সুন্দরের শুধু চিন্তা করা, তাকে বিনষ্ট না করে, অতি অবশ্যই সুন্দরের পক্ষে।*

সুতরাং সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ থেকে পার্থক্য স্বরূপ চিন্তাশীল মতাবস্থান জীবের মৃত্যু ডেকে আনে।

---

* দ্রষ্টব্য : এ. ফ্রম। থাকা অথবা হওয়া। মস্কো, প্রগতি, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৬ (রুশ সংস্করণ)।

‘মৃতপ্রায়’ জগতের অখণ্ডতা রক্ষার ঔষধস্বরূপ সত্যকে উপলব্ধি করার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পদ্ধতির বদলে **স্বজ্ঞা** (ইন্দ্রিয় অনুভূতি) ভিত্তিক ‘প্রাচ্যের ব্যক্তিত্বের’ উপর ব্যাপারেও ‘পাশ্চাত্য’ কম আকর্ষণ অনুভব করে না। ‘দুই তালুর করতালি ধ্বনির কথা আমরা জানি। তবে এক তালুর করতালি ধ্বনিটি কেমন?’ — প্রাচ্যদেশের ঠিক এই হেঁয়ালির মধ্যেই — আমেরিকার লেখক জ. সেলিঙ্গার তাঁর ‘ন’টি গল্প’ গ্রন্থে সেটিকে সূত্রলিপি রূপে নির্বাচন করেছেন — নিহিত আছে যুক্তি দ্বারা ঘটনাবলীর সারকথা অনুপলব্ধির প্রতি আঙ্গুলি প্রদর্শন; এক তালুর করতালি ধ্বনির মতোই মানুষের যুক্তি ও অনুভূতির পক্ষে সহজলভ্য সবকিছুই যে অলীক — তার প্রতি আঙ্গুলি প্রদর্শন।

‘সৌন্দর্যের পথ’ ‘প্রাচ্যের মানুষের’ কাছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পথ হয়ে ওঠে। ‘...প্রাচ্যদেশের লোকজনের কাছে শত সহস্র বছর ধরে একটি মাত্রই সৌন্দর্য বিদ্যমান, আর কবি ও গুণগ্রাহীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন সুরে তারই জয়গান গাইছেন’।*

‘প্রাচ্যের মানুষের’ আরও এক বৈশিষ্ট্য : ইউরোপবাসীর থেকে পার্থক্যস্বরূপ সে নতুনের পেছনে ঘোড়দৌড়ে ব্যস্ত নয়, **অতীত** তার কাছে — অত্যন্ত মূল্যবান। ‘নতুন নতুন পথানুসন্ধানের বদলে প্রাচ্যের মানুষের

---

* দ্‌জিউনিতিরো তানিদ্‌জাকি। সিগেমত মা। মস্কো, নাউকা, ১৯৮৪, পৃঃ ২৭৮ (রুশ সংস্করণ)।

লক্ষ্য ছিল সুপ্রাচীন কালের লোকেদের আত্মিক অবস্থা উপলব্ধি করা'।*

বিচারবুদ্ধির উপর ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে, যুক্তির উপর আবেগকে, কর্মের উপর চিন্তা করাকে প্রাধান্যদান ; আত্মিক জীবনে সৌন্দর্যের মুখ্য ভূমিকা, বস্তুর জগতের বদলে নিজের অন্তর্জগতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা ; নতুনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা নয়, বরং অতীত কালের উন্নতিবিধানের পুনর্জন্ম — এই হল প্রাচ্যদেশীয় ধরনের মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আধুনিক মানুষের কাছে যা এতই আকর্ষণীয়।

তবে জওহরলাল নেহরুর — 'প্রাচ্যের মানুষের' স্বার্থাদি অবজ্ঞার ব্যাপারে যাঁকে কোনমতেই দোষী বলে সন্দেহ করা চলে না — 'ভারত আবিষ্কার' রচনায় আমরা প্রাচ্য জাতীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অনেক বেশি সমালোচনামূলক সম্পর্ক খুঁজে পাই। প্রাচ্যের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে' যেমন শিল্পকলার সুউন্নত সৃষ্টিকর্মের উৎসকে, তেমনই সুউচ্চ নানা নান্দনিক আদর্শকে নিরীক্ষণ করে নেহরু তারই পাশাপাশি দেখিয়েছেন যে, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' ধীরে ধীরে 'মুক্তির পক্ষে' প্রকৃত 'জেলখানায়', 'দুর্বলতার হেতুতে' পরিণত হয়েছে, ভারতীয় জনগণের সৃজনী উদ্যম খতমে সহায়তাদান করেছে।** এই অখণ্ডতা রূপে সমাজের

---

* ঐ, পৃঃ ২৭৫।

** দ্রষ্টব্য : ভারত আবিষ্কার। মস্কো, চিরায়ত সাহিত্য, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৩।

ধারণা, সমাজের প্রতি কর্তব্যের, জাতীয় সংহতির ধারণা আজকাল ভারতের কাছে এতই প্রয়োজনীয় যে, নেহরু লিখছেন, সম্ভবত তা হল 'আধুনিক যুগের এক ফল এবং প্রাচীনকালের কোন সমাজেই তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।'*

সুনির্দিষ্ট এক সামাজিক গোষ্ঠীর, জাতের পরিসরে নানা বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে প্রত্যেক মানুষের জীবন নির্ধারিত হয়। সংহতি বোধ দেখা দেয় শুধুমাত্র আপনজনদের ক্ষেত্রে। তবে 'আপনজনদের' মধ্যেও অসংখ্য সোপানজনিত সম্পর্কের খোঁজ মেলে। প্রাচ্য সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার সচিত্র উদাহরণ এই আরব প্রবচন : 'আমি আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আমি ও আমার ভাই খুড়তুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে, আমি, আমার ভাই ও খুড়তুতো ভাই ভিনদেশীদের বিরুদ্ধে।'

প্রাচ্যের বিশেষ ভাবাদর্শের ধারক-বাহক চিন্তাবীররা আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য মানুষের জীবনযাত্রার সমস্ত বৈপরীত্য উপলব্ধি করেন ; এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা আর এমন কি সুষমাহীনতার ব্যাপার। যেমন, উপরে উল্লিখিত জাপানী লেখক দ. তানিদজাকির 'মেহেন্দি' গল্পে 'সৌন্দর্যের পথ' কখনই সত্য ও মঙ্গলের সঙ্গে সুষমতার উদ্দেশে পথ নয়। সৌন্দর্যের পথ — এ হল হিংস্রতার পথ। জীবন-না-জানা এক কিশোরী মেয়ের পিঠে

---

* ঐ, পৃঃ ৭৩।

নিজ পা বিস্তার করা প্রকাণ্ড এক মাকড়সার আকারে মেহেন্দির অপূর্ব সৌন্দর্য খোদ তাকেই হিংস্রতার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে, আর যেই এই মেহেন্দির সংস্পর্শে আসে, সেই মৃত্যুর কবলে পড়ে। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের আদর্শের প্রভেদটিই আরও উজ্জ্বলভাবে দেখানো হয়েছে অন্য এক জাপানী লেখক আকুতাগাভা রিউনাসকের 'নরক যন্ত্রণা' গল্পে। এক শিল্পী তাঁর গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সৌন্দর্যের সেবায়। 'প্রকৃতির' তথা আগুনে মৃত্যুমুখী নিজের মেয়ের সামনে তিনি গুরুর প্রশংসা লাভ করছেন। তবে নৈতিকতার অনুভূতি আর হিংস্র-সৌন্দর্যের বোঝা সহ্য করতে পারে না এবং সেই শিল্পী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন। সৌন্দর্যের পথ সব সময় সঠিক পথ নয়। প্রাচ্যের ঐতিহ্যময় মূল্যবোধ এভাবেই সন্দেহের কবলগ্রস্ত হয়।

পাশ্চাত্যে অন্য ধরনের জীবনযাত্রার, জগতের প্রতি অন্য ধরনের সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণের অস্তিত্ব থেকে থাকলে, প্রাচ্যেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্পদ অধিকারের ব্যাপারে আকর্ষণ কম নেই। জওহরলাল নেহরুর বন্ধু ও সতীর্থ আবদুল কালাম আজাদের উক্তি অনুযায়ী, ভাবীকালের মানবজাতির পক্ষে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ' অতীব গুরুত্বপূর্ণ।* তা প্রাচ্যের পক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ নিয়তিবাদ এড়াতে, সৃজন ক্ষমতার ব্যাপারে মানুষকে

* ভারত আবিষ্কার, পৃঃ ৪৫২।

উৎসাহদানে সাহায্য করবে।

তবে এই ধরনের সংশ্লেষণের' পক্ষপাতিদের সঙ্গে সব ব্যাপারে একমত হওয়া কঠিন ব্যাপার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের চিন্তাধারার মিল-অমিল, অনুভূতি কাঠামো বিশ্লেষণ করে আবদুল কালাম আজাদ বস্তুত এ দেখিয়েছেন যে, আমরা যাকে প্রাচ্য বিশ্ববীক্ষার পর্যায়ে ফেলি, তার অনেককিছুই বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন কালে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতেও হাজির ছিল। যেমন, Pantheoism (প্রকৃতি ও ঈশ্বর একাত্মতবাদ), অণুজগৎ ও বড় জগতের মধ্যে যোগাযোগ, এ চিন্তা যে, মানুষের মধ্যে রয়েছে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড — ইউরোপীয় দর্শনেও উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, মানুষের 'ঐশ্বরিক অবয়ব' প্রাচ্যের আকারে না হলেও অন্যান্য আকারে — এ ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় দর্শনের অন্যতম এক মূল ধারণা। মাধ্যম নয় বরং লক্ষ্যরূপে মানুষের প্রতি, তার আত্মিক বিকাশের প্রতি সম্পর্ক ইউরোপীয় মানবতাবাদের পক্ষেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। যদিও ষোলআনা এক ধরনের দুই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অস্তিত্ব নেই, যদিও একই ধরনের নানা প্রশ্নকে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে 'ভিন্ন ভিন্ন ধরনে পেশ করা হয়েছিল, তাও কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসের মধ্যে অসংখ্য একই ধরনের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা চলে। আদিম যুগের 'গোষ্ঠীপ্রথার' ব্যক্তির, 'সম্প্রদায় প্রথার' ব্যক্তির নানা বৈশিষ্ট্যে — যার কথা বলা হয়েছে বর্তমান রচনার প্রথম অংশে — স্মরণ

করা হলে, দুই সংস্কৃতির সন্ধিস্থলের সংখ্যা অনেক বাড়বে।

এও ভোলা উচিত নয় যে, প্রাচ্যের আত্মার আধুনিক মতপ্রকাশকারীরা বহুলাংশে নির্ভর করেন পাশ্চাত্যের আত্মিক সংস্কৃতির উপর। আকুতাগাভার সৃজনকর্মে ইউরোপীয় দর্শন, বিশেষত, রোমাণ্টিকবাদ, অস্তিত্ববাদ যে প্রভাব ফেলেছে, তা সুবিদিত। তলস্তয় ও গান্ধীর আত্মিক ঘনিষ্ঠতাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বেড়াজাল অতিক্রম করার এক চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত।

অবশ্যই, আমাদের কাল পর্যন্ত বিদ্যমান প্রাচ্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আত্মিক জীবনের স্বকীয়তা এবং সেই ধরনের মানুষের প্রাকপুঁজিবাদী গঠন-ব্যবস্থার পক্ষে যে ছিল বৈশিষ্ট্যস্বরূপ — এক ধারায় মিলিত উপাদানের দরুন প্রাচ্য মানুষের বিশ্ববীক্ষা, আবেগধর্মিতা, জীবনযাত্রার নানা বিশেষত্বের কথা বলা যায়।

তবে দুই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির এক ধরনের সংশ্লেষণের ফলে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়ার বিলোপ ঘটানো মনে হয় সম্ভব নয়। খুব সম্ভবত 'পুরনো দেবতাদের' জীবনে দেখা দেবে 'নতুন দুর্দশা'। প্রাচ্য জাতীয় ব্যক্তিত্ব এক নতুন সংশ্লেষণে পাশ্চাত্যের মানুষের উদ্যমের সঙ্গে মিলিত হয় না, বরং আত্মধ্বংস ঘটে, রূপকাকারে যেমনটি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপাখ্যান-ধর্মী 'পুরনো দেবতাদের নতুন দুর্দশা' রচনায়। প্রাচ্য সংস্কৃতির আত্মার প্রতীক

'পুরনো দেবতারা' কাজকর্ম ছেড়েছেন, নতুন প্রজন্মের প্রচেষ্টায় পুরাকাহিনীতে পরিণত হয়েছেন : 'সুখের কথা যে, আমাদের মতো কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী দেখা দিয়েছে, অন্যথায় যেমন আকাশে, তেমনই মাটিতে আপনাদের পক্ষে জায়গা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হতো।' সংশ্লেষণ নয়, বরং এক নতুন ধরনের নিঃসঙ্গতা, ব্যক্তিত্বের জাতীয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নিঃসঙ্গতা, যার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পাতায় পাতায়, সাহিত্যিক রচনাবলীর পাতায় পাতায় — বুর্জোয়া বিকাশের প্রেক্ষাপটে 'ঐতিহ্যমূলক' সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য এই অপেক্ষা করছে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির আর শুধুমাত্র দেশ ও ঐতিহাসিক কালের বিচারে আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যমান নানান উপাদানের সম্মিলনই নয়, বরং নতুন নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি গড়া, আর তা নিঃসঙ্গতা প্রক্রিয়া বিলুপ্তির জন্য, এক নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখা দেবার জন্য, যে ব্যক্তিত্ব স্বার্থপরতা ও ঈর্ষা, জিনিসপত্র পাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বঞ্চিত, ব্যাপক সামাজিক সৃজনকর্মে যে অনতিক্রমণীয় চাহিদার অগ্নিপরীক্ষায় হয়েছে উত্তীর্ণ — এই হল সেই পথ, যে পথে আজ চলছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

৩। আমাদের অন্তরেই রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

১। বিশ্ববীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব

প্রত্যেক লোককেই মনে হয় জীবনের অর্থ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে। এ হল 'চিরকালের' প্রশ্ন যা প্রত্যেককে চিন্তামগ্ন করেছে, তা তিনি রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা থেকে যত দূরেই থাকুন না কেন। এ প্রশ্নের উত্তর বহুলাংশে নির্ধারণ করে সেই জগতের প্রতি ব্যক্তিত্বের অবস্থান, যেখানে সে বাস ও মেহনত করে, সেই নীতি, যা অনুসারে সে কাজকর্ম করে। জীবনের অর্থ সংক্রান্ত প্রশ্ন মীমাংসা কালে লোকে সর্বদা এক নির্বাচনের মুখোমুখি হয়। নানা রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়ানো পথ-বাছাইকারী এক নাইটের রূপকথাসম ভাবমূর্তি — বিশ্ববীক্ষাজনিত নির্বাচনের অন্যতম এক প্রতীক। নিজস্ব জীবন-পথ নির্বাচন

করতে হয়েছিল ব্রুনো ও গালিলেইকে, জুলিয়াস সিজার ও নেপোলিয়নকে, লুমুম্বা ও চে গেভারাকে। পথ-বাছাই মোটেই সহজ কাজ নয়। প্রায়ই এর জন্য দরকার হয় নাগরিক শৌর্যের, অটলতার ও মনোবলের।

যে বিশ্ববীক্ষার নামে লোকেরা জীবন বলি দিয়েছে, সংগ্রাম ও বিজয়লাভ করেছে, তা বলতে কী বোঝায়? 'বিশ্ববীক্ষা' এক বহু অর্থজনিত ধারণা। আমরা বলি বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী ও শ্রমিকের বিশ্ববীক্ষার কথা, সাধারণ, দার্শনিক, ধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার কথা। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববীক্ষা নির্ণয় করেছেন: বিশ্ব অনুভূতি (বিশ্ববোধ), বিশ্বসংঘাত, বিশ্বচেতনা।

'সাধারণ' বিশ্ববীক্ষা বলে কিছু নেই। এর অধিকারী হল সুনির্দিষ্ট লোকজন, যাদের বাস সুনির্দিষ্ট দেশে, সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালে। মানুষের কর্মজীবন থেকে বিশ্ববীক্ষা অবিচ্ছেদ্য। তা সদা নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণার কঠোর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিতে হলে, তা এই রকম শোনায়: বিশ্ববীক্ষা — এ হল জগতের প্রতি মানুষের, তাতে তার নিজস্ব স্থানের প্রতি নানা দৃষ্টিভঙ্গির এক ব্যবস্থা; লোকেদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, নৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক নানা বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের সমষ্টি। বিশ্ববীক্ষা — এ হল ব্যক্তিত্বের হৃদকেন্দ্র, মূলকেন্দ্র, যাতে রূপলাভ করে তার নানা নীতি ও কর্মতৎপরতা, নানা ভাবাদর্শ ও জীবন-লক্ষ্য। বিশ্ববীক্ষা বহুলাংশে নির্ধারণ করে ব্যক্তিত্বের জীবন। বিশ্ববীক্ষা — তা মোটেই প্যারিপার্শ্বিক

জগতের ব্যাপারে সব দৃষ্টিভঙ্গি নয়, শুধু বরং সেগুলির চরম সাধারণীকরণ।

কাজকর্মে প্রত্যেক মানুষ একে অন্যের থেকে ভিন্ন, জগতে নিজেকে ও নিজের কর্মকে উপলব্ধি করে ভিন্ন ভাবে। কর্মজীবনে মানুষের জগৎ বুঝি-বা দুই অংশে 'বিভক্ত হয়' : 'আমি' এবং 'না-আমি', তাও আবার মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলে, তাকে পুনর্গঠিত করে নিজেও বদলায়। এ প্রক্রিয়ায় দেখা দেয় কর্তা-কর্ম (Subject-object) সম্পর্ক, উদ্ভূত হয় বিশ্ববীক্ষাজনিত দাবিদাওয়া, বিশ্ববীক্ষার মূল প্রশ্ন, খোদ বিশ্ববীক্ষা।

বিশ্ববীক্ষার কর্ম (লক্ষ্যবস্তু) — মানুষের চারিপাশের সবকিছু, প্রকৃতি ও সমাজ, সামগ্রিকভাবে গোটা জগৎ।

বিশ্ববীক্ষার **কর্তা** রূপে প্রকৃতপক্ষে আত্মপ্রকাশ করে ব্যক্তিত্ব অথবা কোন সামাজিক গ্রুপ।

বিশ্ববীক্ষার **বিষয়বস্তু** — প্রকৃতি জগৎ ও মানুষের জগতের, অথবা, প্রাচীন গ্রীসবাসীরা যেমনটি বলতেন, মহাজগৎ ও অনুজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক, অথবা, আমরা তথা বিংশ শতাব্দীর লোকেরা যেমনটি বলি, এ হল জগৎ ও মানুষ সংক্রান্ত মতধারা।

বিশ্ববীক্ষাজনিত মূল প্রশ্ন — জগতের প্রতি মানুষের সম্পর্কের প্রশ্ন, জগৎ যেখানে মানুষের কাছে হাজির আপনা-আপনি নয়, বরং তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। এর অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের সত্তার মূল রূপে জগতের উৎপত্তি, সারবস্তু ও ভাবীকালের প্রশ্ন, মানুষের অস্তিত্বের তাৎপর্যের, জগৎ সম্বন্ধে চেতনালাভ

ও আত্মচেতনার প্রশ্ন, সত্য ও পথ-হারানোর, সামাজিক ন্যায়, ভাল ও মন্দ, ইত্যাদির প্রশ্ন।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার রূপটি কেমন এবং দৈনন্দিনের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্কটিই-বা কেমন? দৈনন্দিন বিশ্ববীক্ষা (জগৎ-অনুভূতি, জগৎ-উপলব্ধি) জড়িত হল মানুষের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন হার উপলব্ধি করার সঙ্গে। তা দেখা দেয় মানুষের প্রায়োগিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এ হল তার নানা বিশ্বাস, ধারনা, আবেগ, এবং তৎসহ জগৎ সম্বন্ধে আপনা-আপনি উদ্ভূত মতামত। দৈনন্দিন বিশ্ববীক্ষায় মানুষ পরিচালিত হয় আজকের দিনের নানা দাবিদাওয়া ও স্বার্থ দ্বারা, কাজ করে উপলব্ধ নানা নীতি ছাড়াই, নিজের সামনে জীবনের তাৎপর্যসম্পন্ন কোন লক্ষ্য স্থাপন করে না, কোন ভাবাদর্শের প্রতিও নজর দেয় না।

প্রত্যেক মানুষ বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার (বিশ্ববোধের) অধিকারী নয়। এর জন্য দরকার হয় জ্ঞানের, সাধারণ সংস্কৃতির ও পান্ডিত্যের, নিজের নানা আদর্শ ও লক্ষ্য যে সঠিক, সে ব্যাপারে বিশ্বাস। বিশ্ববীক্ষা ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হলে, বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা — 'কেন্দ্রবিন্দুর কেন্দ্রবিন্দু'। বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা হল বিশ্বের প্রতি নানা দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক ব্যবস্থা এবং বিশ্বে মানুষের অবস্থান, প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তাধারা বিকাশের অধিকতর সাধারণ নিয়মাবলী।

বিশ্ববীক্ষা গঠনে বিশেষ ভূমিকাসম্পন্ন হল দর্শন। বিশ্ববীক্ষায় দর্শন কেন বিশেষ ভূমিকার অধিকারী? দর্শন নিবিড়তমভাবে জড়িত সামাজিক জীবনের নানান

ব্যাপারের সঙ্গে। তা প্রভাব ফেলে রাজনীতিক সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের উপর, নানা ধর্মীয় আন্দোলন ও সাহিত্য সৃষ্টির উপর, যুগ ও আলাদা ব্যক্তির উপর নিজের ছাপ ফেলে, তাকে অভিহিত করা হয় 'মানুষের আত্মিক ভাবমূর্তি' রূপে, বিশ্বভবনের তাত্ত্বিক ভিত্তির ও তাতে মানুষের স্থান প্রশ্নের মীমাংসা ঘটিয়ে দর্শন বিশ্ববোধ রূপে বিশ্ববীক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তিটি তৈরি করে। দর্শন হল বিশ্ববীক্ষার বিজ্ঞান, যেহেতু বিশ্বের, তার শেষ ও অশেষের, তাতে মানুষের স্থানের, বিশ্বকে উপলব্ধি করার প্রশ্ন হল দর্শনের মূল প্রশ্ন।

সজোরে উল্লেখ করা দরকার যে, সুনির্দিষ্ট নানা ঐতিহাসিক যুগে নীতিগত বিশ্ববীক্ষাজনিত গুরুত্ব অর্জন করেছিল সেইসব প্রশ্ন, যেগুলি মীমাংসার উপর নির্ভর করে বিশ্বচিত্রের ব্যাপারে ধারণা বদলেছিল। ১৬-১৭শ শতাব্দীতে তা বলতে ছিল সৌর জগতের গঠন সংক্রান্ত কোপারনিকাসের শিক্ষা, ১৯শ শতাব্দীতে — প্রজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এবং মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ২০শ শতাব্দীতে — অনু-জগৎ আবিষ্কার এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব। জ্ঞান বিকাশের কল্যাণে বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারনা বাড়ে ও গভীর রূপধারন করে, তার বিশ্ববোধ বদলায় এবং তার ক্রিয়াকলাপে নতুন নতুন লক্ষ্যবস্তু যোগায়। তবে সুনির্দিষ্ট কোন বিজ্ঞানই আপনা থেকে বিশ্ববীক্ষা নয়, যদিও প্রতিটি বিজ্ঞানেরই বিকাশ ঘটে বিশ্ববীক্ষার সাহায্যে। সব যুগেই বিশ্ববীক্ষা

বিকাশে নির্ধারক রূপে ছিল এবং আজও রয়ে গেছে উৎপাদন প্রণালী ও সামাজিক সম্পর্ক — সমাজের অর্থনৈতিক ও আত্মিক জীবন।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিশ্ববীক্ষা সর্বদাই শ্রেণীজনিত চরিত্রের, যেহেতু প্রত্যেক মানুষ সেখানে সুনির্দিষ্ট এক শ্রেণীর প্রতিনিধি। বিশ্ববীক্ষায় সাধারণীকৃত আকারে প্রতিফলিত হয় ব্যক্তিত্বের সামাজিক সত্ত্বার নানা বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তার স্থান। দাসমালিক ও দাস, সামন্ত ও ভূমিদাস, বুর্জোয়া ও মেহনতি — এদের সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্বকে দেখে, এদের বিশ্ববীক্ষাও বিভিন্ন ধরনের।

ব্যক্তিত্বজনিত বিশ্ববীক্ষা — প্রকৃতি ও সমাজের প্রতি নিজ সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষের মানুষের উপলব্ধি পন্থা, তাতে নিজের স্থান চেতনালাভ পন্থা, তদুপরি বিশ্ববোধ বিশ্বঅনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে পারে। বিশ্ববীক্ষায় সর্বদা এক কর্তা (Subject) 'হাজির', তার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তার জীবন-অবস্থান হল তার নৈতিক মানদণ্ড ; নানা অনুভূতি ও মনঃকষ্ট।

আমরা আগেই বলেছি, বিশ্ববীক্ষা হতে পারে দৈনন্দিন (স্বতঃস্ফূর্ত, অতিসরল) এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিজনিত, চেতনামূলক, সুনির্দিষ্ট কিছু দার্শনিক নীতিতে আপ্লুত। তবে লোকে কোন বিশ্ববীক্ষা নিয়ে জন্মায় না, তার শিক্ষালাভ করে, গড়ে ওঠে। সামাজিক শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্ব যে আত্মিক সংস্কৃতি (দুনিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের সমষ্টি রপ্ত করে,

তা তার সামাজিক, এবং তদ্দ্বারাই ব্যক্তিগত আচরণ বিধিতে পরিণত হয়। মানুষের ঠিক এই আচরণ হেতু রূপেই তার জ্ঞান তার বিশ্বাসের আকার নেয়। এর কল্যাণেই জীবনে, লোকেদের চেতনামূলক ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সব দিকে বিশ্ববীক্ষা প্রবলতম সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্ববীক্ষা ব্যক্তিত্বের কোন নিষ্ক্রিয় সঙ্গী নয়, বরং মানুষের এক ধরনের আত্মিক গুরু, পথপ্রদর্শক। বিশ্ববীক্ষা সঠিক বিশ্ববোধ থেকে উদ্ভূত হলে তা বিশ্বের যুক্তিযুক্ত পুনর্গঠনের সুস্থায়ী ভিত্তির কাজ করে। বিশ্ববীক্ষা ভণ্ড হলে তা ব্যক্তিত্বের জীবনে হয় গুরুতর বাধাস্বরূপ।

জ্ঞান তখনই বিশ্ববীক্ষায় রূপান্তরিত হয়, যখন তা মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক, নৈতিক, নান্দনিক মতাবস্থান গঠন করে, অন্তরের বিশ্বাসের আকারলাভ করে, অর্থাৎ কিনা তার জীবনযাত্রার ভিত্তিতে পরিণত হয়। মার্কসের মতে, বিশ্বাস — '... এ হল সেইসব গাঁট, নিজ হৃদয় বিদীর্ণ করা বিনা যা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া চলে না, এ হল দৈত্যদানব, যাদের বিরুদ্ধে মানুষ বিজয়লাভ করতে পারে শুধুমাত্র তাদের বশবর্তী হয়ে।'*

নিজেদের নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী লোকজন যেকোন যাতনা সইতে, এমনকি মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম। তাদের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ১, পৃঃ ১১৮ (রুশ সংস্করণ)।

লুথারের এই স্লোগান: ‘এটা ধরে আছি আর ভিন্ন পারিও না!’ ব্যক্তিগত বিশ্বসের শক্তি — প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম জরুরী এক শর্ত।

বিশ্ববীক্ষার অতীব জরুরী উপাদানটি গঠিত হয় নানা **ভাবাদর্শ** তথা জীবনের বাঞ্ছিত ও চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলি দ্বারা। জগৎ সম্বন্ধে নানা ধারণার চরিত্র সুনির্দিষ্ট নানা লক্ষ্য স্থাপনে সাহায্য করে, যেসব লক্ষ্যের সাধারণীকরণ দ্বারাই গঠিত হয় জীবনের সাধারণ পরিকল্পনা, গড়ে ওঠে নানা ভাবাদর্শ, বিশ্ববীক্ষাকে যেগুলি চালিকা-শক্তি যোগায়। চেতনার সারবস্তু তখনই বিশ্ববীক্ষায় রূপান্তরিত হয়, যখন তা মানুষের নানা ধারণার সঠিকতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও নিযর প্রত্যয়ের, বিশ্বাসের চরিত্র ধারন করে।

সামগ্রিকভাবে মানুষ অথবা সমাজের ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টিকোণ থেকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মূল্যায়ণও যেকোন বিশ্ববীক্ষার অঙ্গভুর্ক্ত। আমরা বলছি ভাবাদর্শ, শিল্প রচনা, বস্তু ও কর্মের মূল্যের কথা। নানা বস্তু ঠিক সে পরিমাণ মূল্যের অধিকারী, যা সেগুলি মেটায় ব্যক্তিত্বের, সামাজিক গ্রুপ ও শ্রেণীর চাহিদার ক্ষেত্রে। অথবা জলের বা অন্নের মূল্য আছে কী? আপনা থেকে-নেই, তবে তৃষ্ণায় কাতর লোকের কাছে এক ঢোক জলের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই, অভুক্তের কাছে — এক টুক্‌রো রুটি। ‘অবরুদ্ধ’ লেনিনগ্রাদের বাসিন্দাদের কাছে রুটি ছিল জীবনের সমার্থক। ঘটনাবলীর চক্র বৈচিত্র্যময়, যেগুলি মানুষের পক্ষে মূল্যাবান হতে পারে।

মূল্য বলতে কী বোঝায়, লোকজনের ও তাদের কাজকর্মের, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ও জীবনের অবস্থানের মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়? প্রকৃতপক্ষে, মানুষের ক্রিয়াকলাপের নানা বস্তুর, সামাজিক সম্পর্কের এবং সেগুলির অন্তর্ভুক্ত নানা প্রাকৃতিক ঘটনার বহুরূপী অবস্থার প্রকাশ ঘটতে পারে মূল্যবান সম্পর্কের বিষয় (অবজেক্ট) রূপে 'বস্তুগত মূল্যবোধের' আকারে, অর্থাৎ কিনা ভাল ও মন্দ, সত্য অথবা মিথ্যা, সুন্দর অথবা অনাচার, ন্যায় অথবা অন্যায়ের আকারে মূল্যায়ন করা।

ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধ — ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর অতীব জরুরী উপাদান। প্রত্যেক মানুষের মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধ তার জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা, তার মর্মপীড়ার গোটা যোগফল দ্বারা বাঁধা। এক লোকের পক্ষে যা জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ, অন্যের পক্ষে তা জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যক্তিত্বের গড়ে-ওঠা, টিকে-থাকা মূল্যবোধজনিত নানা স্থিতিবোধ তার আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করে যার প্রকাশ ঘটে নানা দাবিদাওয়ার ও স্বার্থের সুনির্দিষ্ট ধারায়।

ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধজনিত নানা স্থিতিবোধের যোগফল এসব গুণাগুণ নির্ধারণ করে, যেমন, লক্ষ্যাভিমুখিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সুনির্দিষ্ট নানা নীতি ও ভাবাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা, এইসব ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য সংগ্রাম ক্ষমতা, লক্ষ্যার্জনে নাছোড়বান্দা মনোভাব। মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধগুলির বিকাশ —

ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতার লক্ষণ, তার সামাজিকতা মাপার সূচক। উল্টোদিকে মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধগুলির বিকাশহীনতা — ব্যক্তিত্বের শিশুত্ব, তার অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোয় বাইরের প্রেরণার আধিপত্যের লক্ষণ।

মানুষের নানা মূল্যবোধের জগৎ শুধু তার আবেগজনিত নানা প্রচেষ্টা, লক্ষ্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রই নয়। মূল্যবোধের প্রকৃতি বোঝার জন্য ব্যক্তিত্বের রোজকার জীবনের সঙ্গে, জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার যোগাযোগটি উন্মোচন করা দরকার। শুধুমাত্র নানা সামাজিক স্বার্থ প্রকাশ করে, নানা সামাজিক দাবিদাওয়া ও লক্ষ্য পূরণ করে, বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক গ্রুপ মূল্যের অধিকারী হয়ে ওঠে।

২। মানুষের মধ্যে আছে সবকিছু — সবকিছুই মানুষের জন্য

ব্যক্তিত্বের চাহিদা নিবিড়ভাবে জড়িত তার নানা আগ্রহ, মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও ভাবাদর্শের সঙ্গে। চাহিদা বলতে বোঝায় ব্যক্তি-মানুষের, দেহযন্ত্রের প্রাণজনিত ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অত্যাবশ্যক কোনকিছুর ব্যাপারে প্রয়োজন অথবা অভাব, চাহিদা হল সক্রিয়তার অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক। মানুষের চাহিদা আছে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ব্যাপারে, অবসর ও মেলামেশার ব্যাপারে। মানুষের সর্বদাই কিছু না কিছুর চাহিদা রয়েছে, চাহিদা তাকে সারা জীবন অনুসরণ করে।

মানুষের নানা চাহিদা — সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের ফল। পশুদের চাহিদা ও আচরণের ভিত্তি জৈবিক উপযোগিতা হলে (প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ), উপযোগ করার জন্যই পশুরা কাজ করে থাকলে, মানুষের উপযোগিতা নীতিগতভাবে ভিন্ন ধরনের, সে উপযোগ করে কাজ করার, সৃষ্টি করার জন্য, তার উপযোগ প্রণীত হয় লোকেদের মেলামেশায় এবং 'সামাজিক পরশ লাভ করে' যৌথ ধরনের সম্মিলিত জীবনে। মানুষের চাহিদায় প্রভাব ফেলে তার পরিবার, কাজ, বন্ধুবান্ধব, শ্রম ও আরাম নেওয়ার পরিবেশ, বেতন, শিক্ষা, বয়স, স্বাস্থ্য, নানা অভ্যাস — যেহেতু প্রয়োজন ও ইপ্সিতের ব্যাপারে প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ধারনা। মানুষ নিজের নানা চাহিদার মূল্যায়ন করে, সেগুলি পূরণের নানা পদ্ধতি, উপায়, সেগুলি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নির্বাচন করে, একের স্বার্থে অন্যগুলি বর্জন করে, অন্যান্য লোকের চাহিদাদির সঙ্গে নিজের চাহিদাগুলি তুলনা করে, সাধারণ চাহিদাদির স্বার্থে নিজের কিছু কিছু চাহিদা থেকে বিরত থাকে।

মানুষের নানা চাহিদার বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় মানুষের ক্রিয়াকলাপের, সর্বাগ্রে শ্রমের সামাজিক প্রকৃতি দ্বারা। সুনির্দিষ্ট এক ঐতিহাসিক ব্যবস্থা রূপে সমাজের উপরই শর্তাধীন থাকে হরেক রকমের চাহিদার গঠন ও বিকাশ, সেগুলি পূরণের সারবস্তু ও আকার। ব্যক্তিত্ব ও সমাজের চাহিদা সামগ্রিকভাবে নির্ভর করে আলোচ্য সমাজের বিকাশ স্তর, এবং

তৎসহ মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ ধরনের নানা শর্তের উপর।

মানুষের নানা চাহিদার কয়েকটি স্তরকে বিজ্ঞানীরা আলাদা করেছেন : ক) দৈহিক — অন্ন, হাঁটাচলা, বাসগৃহ, বিশ্রাম, নিরাপত্তার চাহিদা ; খ) শ্রম ও মেলামেশার ; গ) নানা পারদর্শিতা ও প্রতিভা বাস্তবায়নের ; ঘ) জগৎ উপলব্ধি করার ; ঙ) সুন্দরের, সামঞ্জস্য, ইত্যাদির ব্যাপারে।

সার্বজনীন চাহিদাদির মধ্যে — বৈষয়িকগুলি — সবচেয়ে জরুরী, এগুলির ভিত্তিতেই বিকাশলাভ করে আত্মিকগুলি : চেতনাজনিত, নান্দনিক, নৈতিকগুলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমের চাহিদাকে বলা হয় ব্যক্তিত্বের বৈষয়িক চাহিদা, আর সুন্দরের চাহিদাকে — আত্মিক। তবে শ্রমের চাহিদাকে কি শুধুই বৈষয়িক রূপে গণ্য করা চলে ? যেহেতু শ্রমের দ্বারা অতি জরুরী অন্ন যোগাড় করে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার উপায়ই খুঁজে পায় না, শুধু দৈহিকভাবেই বিকাশলাভ করে না, বরং সৃষ্টির ব্যাপারে, মেলামেশার ব্যাপারে, আত্মিক আত্মবিকাশের ব্যাপারে নিজ প্রচেষ্টা পূরণ করে। যেহেতু যে-শ্রমে মানুষের নানা পারদর্শিতার উন্মোচন ঘটে না, বিকশিত হয় না, তা তার কাছে কখনই চাহিদা, — আনন্দ ও উপভোগ হয়ে উঠবে না। একই সময়ে সুন্দরের চাহিদাকে মানুষ শুধু নির্মল আত্মিক ক্ষেত্রেই কাজে লাগায় না, সে পরিচালিত হয় সামঞ্জস্য ও সুন্দরের প্রতি প্রচেষ্টা দ্বারা। তাই ব্যক্তিত্বের নানা চাহিদাকে বৈষয়িক ও আত্মিক রূপে বিভক্ত করা

যথেষ্ট শর্তসাপেক্ষ। নানা চাহিদা নিয়ে মানুষ জন্মায় না, তা গড়ে ওঠে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকালে — শব্দটির ব্যাপকার্থে, যার অর্থ, মানুষের সংস্কৃতির তথা আত্মিক ও বৈষয়িক সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে মেলামেশা দ্বারা।

১৯শ শতাব্দীর ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকরা — দিদেরোঁ, হেলভেশিয়াস, হলবাখের মতে যুক্তিযুক্ত চাহিদা হল সবার মঙ্গল, সবার হিতের জন্য প্রচেষ্টা। যুক্তিযুক্ত চাহিদাদির মানদণ্ডটি তাঁরা নিরীক্ষণ করেছিলেন 'যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতার' নীতি অনুসারে ব্যক্তিত্বের আত্ম-সীমাবদ্ধতার মধ্যে। ল. ফয়েরবাখ তাঁদের সঙ্গে একমত ছিলেন। তবে যুক্তিযুক্ত চাহিদাদির মানদণ্ড বলতে কী বোঝায়? কেননা সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বদলায়। এককালে যা 'বিলাস' ছিল — আজ তা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। যুক্তিযুক্ত চাহিদাদির মানদণ্ড নির্ণীত হয়েছিল সার্বজনীন নৈতিকতা দ্বারা, যা তাকেই যুক্তিযুক্ত রূপে গণ্য করত, যা মানুষের ক্ষতি করে না, যাতে মুখ্য ছিল ন্যায়, সততা, পরিশ্রমীর মতো চাহিদাগুলি স্বীকার করা। তবে নানা চাহিদায় যুক্তিযুক্ততার নির্ণায়ক রূপে সার্বজনীন নৈতিকতার তাৎপর্যকে খুব বাড়ানো উচিত নয়, যেহেতু শ্রেণীজনিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ ও সামাজিক স্তরের অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানে পার্থক্য ও সামাজিক অসমতার দরুন তাদের চাহিদাগুলিও বিভিন্ন ধরনের।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত আগ্রহসমূহের সামঞ্জস্যমূলক সম্মিলন, বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী ও গ্রুপের চাহিদাদির পারস্পরিক-বিরোধিতা অতিক্রম করার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ এক পটভূমি গঠন করে। সমাজতন্ত্রের আমলে ব্যক্তিত্বের চাহিদাগুলির পূরণ ঘটে এই নীতি অনুসারে : সমাজ — মানুষকে, মানুষ-সমাজকে।

চাহিদা নিবিড়ভাবে জড়িত আগ্রহের সঙ্গে। ব্যক্তিত্ব দ্বারা উপলব্ধ চাহিদার নাম আগ্রহ। লাতিন শব্দ —interes — আগ্রহের অর্থ হল তাৎপর্যের অধিকারী। নিজের ও অন্যান্য লোকের কাজকর্মের সংজ্ঞা লোকে নির্ধারণ করে 'নিজস্ব' আগ্রহের অবস্থান থেকে।

আগ্রহ হতে পারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক। নিজস্ব আগ্রহ সাধারণত সীমিত, তবে এমন হয় যে, ব্যক্তিগত আগ্রহ সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করে, সমাজের সম্পদে পরিণত হয়। ডারউইন ও আইনস্টাইনের জীবনের প্রধান আগ্রহ ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিঠোফেন ও চাইকোভ্‌স্কির — সঙ্গীত, গইয়া ও ম্যাতিসের — শিল্পকলা, করবুজিয়ে ও নিমেইরের — স্থপতি, রোবস্‌পিয়ার ও চে গেভারার — বিপ্লব। তাঁদের জীবনের আগ্রহ সামাজিক আগ্রহে পরিণত হয়েছিল।

চাহিদা পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ করার দরকার হয়, তবে সেই কাজ অথবা কর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সুসম্পন্ন হয় না, যতক্ষণ না মানুষের চেতনায় ভাবী ক্রিয়া তথা লক্ষ্যের এক আদর্শ পরিকল্পনা, ছক, মডেল গড়ে ওঠে। লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়? যা এখনও নেই, অথচ যার জন্য মানুষ প্রচেষ্টা — সেই

কর্মের ইপ্সিত ফলের ব্যাপারে (ভাবমূর্তি, ধারনা, বোধ) মানুষের চেতনায় আদর্শ প্রত্যাশা। মানুষের লক্ষ্য সচেতনভাবে পরিচালিত হয় উদ্ভূত নানা চাহিদা পূরণের ব্যাপারে। শুধুমাত্র প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারাই ব্যক্তিত্ব তার লক্ষ্যার্জন — এবং, পরিশেষে, নিজের নানা চাহিদা পূরণ করে।

সময় সময় ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধ বলতে ব্যক্তিগত নানা লক্ষ্যার্জনের ব্যাপারে প্রচেষ্টাকে বোঝান হয়। তবে এইসব লক্ষ্য একেবারে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধজনিত নানা স্থিতিবোধের প্রকাশস্বরূপ হতে পারে — যেমন বৈষয়িক মঙ্গলের ব্যাপারে চাহিদা, তেমনই সৃজনকর্মের ব্যাপারে চাহিদা। আলোচ্য ক্ষেত্রে মিশ্রিত হয়েছে নির্দিষ্ট নানা নিজস্ব (অদূর) লক্ষ্য এবং জীবনের (সুদূর) লক্ষ্য, যেগুলির বাস্তবায়নই মানুষের গোটা জীবনের কাজ হয়ে ওঠা উচিত। সমাজের লক্ষ্যকে ব্যক্তিত্বের জীবনের লক্ষ্যে রূপান্তরিত করা — তার সুউচ্চ আত্মিক মানের পরিচায়ক। যেমন মহাত্মা গান্ধীর গোটা জীবন একই লক্ষ্যের — ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের — সেবা করেছে।

ব্যক্তিত্বের পক্ষে লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের মধ্যে রয়েছে মনোবল। মনোবল — মানুষ কর্তৃক তার কর্মের সচেতন ও লক্ষ্যাভিমুখী নিয়ন্ত্রণ, তার চেতনার সক্রিয়-কর্মমুখর দিক। ব্যক্তিত্বের পক্ষে মনোবলের প্রকাশ ঘটে কাজ করার ইচ্ছায়, কর্মধারা নির্বাচনে ও কাজ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, তবে ইচ্ছা ও তা অর্জনের মধ্যে রয়েছে এক দূরত্ব, যা

অতিক্রম করা দরকার। পরিকল্পিত কাজ পালন করে ব্যক্তিত্ব মনোবলকে কর্মে পরিণত করে। আমাদের দ্বারা পূর্বে উল্লিখিত আ. শ্‌ভাইটসার — নিজের জীবন যিনি উৎসর্গ করেছেন লোম্বারেনে (গাবন) এক হাসপাতাল তৈরির উদ্দেশে —সদ্‌কাজের আহ্বান না দিয়ে বরং তা করে নিজের জীবনকে ফলপ্রসূ করতে মনস্থ করেছেন। মানুষের শুধু লক্ষ্য থাকাই নয়, বরং তা অর্জন করতে পারাও জরুরী ব্যাপার, এ ছাড়া প্রকৃত লক্ষ্য মায়ায় পরিণত হতে পারে। সদ্‌কাজ করার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয় —তা করতে পারা চাই, ভাল লোক হওয়ার উচ্ছাই যথেষ্ট নয় — তা হয়ে উঠতে পারা চাই। জানা, চাওয়া ও পারা — ব্যক্তিত্বের পক্ষে এক কর্মধারায় মিলেমিশে একাকার হওয়া উচিত।

৩। প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী

ব্যক্তিত্বের সাধারণ-মানবিক ক্ষমতাগুলির মধ্যে জরুরীতম হল শ্রমের ক্ষমতা। মানুষ কর্তৃক প্রথমের শ্রম-হাতিয়ারগুলি তৈরি করা — সৃজনের এক মহানতম কাজ, যার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল মানুষের ক্ষমতা। মানুষের নানা ক্ষমতা নির্ধারিত হয় তার আদি, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত গুণাগুণ দ্বারা নয়, বরং অবজেকটিভ নানা সামাজিক চাহিদা ও সেইসব পরিস্থিতি দ্বারা, সমাজ যেগুলি সৃষ্টি করে সেগুলি বিকাশের জন্য।

মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়? ক্ষমতা — এ হল ব্যক্তি বিশেষের নানা ধর্ম, গুণাগুণ, দক্ষতা,

যেগুলির কল্যাণে সফলভাবে কাজকর্ম করা সম্ভব হয়। মানুষের কর্মজীবন যত বহুমুখী, তার ক্ষমতাও ততই বহুমুখী। মানুষ যখন বেকর্মা থাকে, তার ক্ষমতাও থাকে সুপ্ত অবস্থায়, কর্মকালে তার প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতি-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ঝোঁকগুলির সঙ্গে জড়িত, যেগুলি মানুষের বিকাশ ক্ষমতা নির্ধারণ করে। মানুষের ক্ষমতাগুলিকে এভাবে বিভক্ত করা হয় : **মানুষের সাধারণ** ক্ষমতা (বংশগত), যেমন, অনুভূতি, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, মেলামেশা, মেহনত, শিক্ষালাভ, ইত্যাদি করার ক্ষমতা। এবং **ব্যক্তিগত,** যেমন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ক্রীড়া, গণিত, ইত্যাদির ক্ষমতা। শ্রম, মেলামেশা, চিন্তাভাবনা, ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের ক্ষমতা গড়ে ওঠে তার সারা জীবন ধরে।

ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয় যেমন **অনুবর্তন** (reproductive) ও **ফলদায়ক** (productive, **সৃজনী**) রূপে। প্রথমটি জড়িত হল কোন কাজ আয়ত্ত রপ্ত ও ব্যস্তবায়িত করার সঙ্গে, এতে প্রকাশিত হয় কাজের পুনরাবৃত্তি, তার পুনরুৎপাদন, স্থায়িত্ব। ফলদায়ক-গঠনমূলক-ক্ষমতা হল সৃজনধর্মী, নীতিগতভাবে নতুনের সৃষ্টিতে যা সাহায্য করে।

যেকোন লোকই কী সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে, নাকি এ শুধু বেতিক্রমজনিত চরিত্রের ভাগ্য ? এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন যুগের বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। যেমন, প্রাচীন যুগের ধারনা অনুসারে, সৃজনের ক্ষমতা ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত ভাগ্য অথবা সেইসব লোকের গুণস্বরূপ,

যারা ছিল পাগল-করা কামনা-বাসনা, উন্মত্ততার বিশেষ শক্তির অধিকারী। দেদাল ও ইকারের উপাখ্যান সৃজনধর্মী ঝাপ্‌টা অগ্রগতির, ঝুঁকির, চিন্তাধারার ঝড়ো-গতি উড্ডয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করা সম্ভব এক প্রক্রিয়া রূপে ক্ষমতার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা জড়িত ডেমোক্রাটিস ও প্লেটোর নামের সঙ্গে। ডেমোক্রাটিস ক্ষমতাকে বিবেচনা করেছিলেন বাড়তি প্রাণশক্তির প্রকাশ রূপে, প্রেরণার অবস্থা রূপে। প্লেটো ক্ষমতাকে জড়িত করেছিলেন প্রকৃতির অনুকরণের সঙ্গে এবং মনে করতেন, সৃজনধর্মিতা উপস্থিত যুক্তিসিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে। প্লেটোর ঐতিহ্য বজায় রেখে হেগেল দেখিয়েছেন যে, সৃজনী ক্রিয়াকলাপের (ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাদির বাস্তবায়ন রূপে) মূলটি গঠিত হল বহু লোকের প্রজন্মের পর প্রজন্ম দ্বারা বিকশিত চিন্তাধারা দ্বারা। ভাববাদী-বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, সৃজনের কর্তা (subject) হল চেতনা — 'আত্মা', 'ধারণা', 'বিশ্ব চেতনা' অথবা আত্মচেতনা — 'স্বাধীন আমি', যে সৃষ্টি করে এই জগৎ-সংসার।

বস্তুবাদীরা মনে করতেন, ব্যক্তিত্বের সৃজন ক্ষমতা প্রদত্ত প্রকৃতি দ্বারা, অথবা হেলভেশিয়াসের মতে, নির্ধারিত হয় পরিবেশ ও শিক্ষা দ্বারা। ১৯শ শতাব্দীতে জনপ্রিয় ছিল ব্যক্তিত্বের পুরুষানুক্রমিক ক্ষমতার তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা মেতেছিলেন নানা পরিবারের কালপঞ্জী অনুসন্ধানে, খুঁজে ফিরতেন পুরুষানুক্রমিক প্রতিভা মঞ্জুরের চাবিকাঠি। ১৮৭৫ সালে ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক

ও মনস্তাত্ত্বিক এফ. হ্যালটন 'পুরুষানুক্রমিক প্রতিভা' নামে এক বই ছাপান, যাতে তিনি বহু শত মহান ব্যক্তির বংশগত যোগাযোগের ব্যাপার উল্লেখ করেছেন। তিনি তা করতে পেরেছেন গির্জার বইপত্র অধ্যয়ন করে, যাতে জন্ম তারিখ নথিভুক্ত হয়েছিল এবং জার্মান সংস্কৃতির প্রতিনিধিবৃন্দের বিভিন্ন পুরুষের আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছেন : কবি শিলের ও হিলডেরলিনের, দার্শনিক শেল্লিঙ ও হেগেলের। বাখ পরিবারের কয়েক পুরুষে একসারি সঙ্গীতজ্ঞের সন্ধান পাওয়া গেছিল, যাদের মধ্যে কয়েক'জন ছিলেন সুমহান। মোজার্ট, হাইডন পরিবারের নানা পুরুষেও একাধিক সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কার্ল মার্কস ও গ. হাইনে, পুশকিন ও তলস্তয়ের মধ্যে। পুরুষানুক্রমিক প্রতিভা সংক্রান্ত হ্যালটনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে একমত হয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক কোট্স, যিনি ব্যক্তিত্বের প্রতিভাকে উত্থাপন করেছেন তার সম্বন্ধে নানা বিশ্বকোষে প্রকাশ সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে হ্যালটনের মতো কোট্সও মনে করতেন, লোকেদের পুরুষানুক্রমিক প্রতিভার অধিকাংশই হল বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তবে পুরুষানুক্রমিক প্রতিভা তত্ত্বের সমালোচকরা এর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, যেগুলি ব্যক্তিত্বের পুরুষানুক্রমিকতা ও প্রতিভার মধ্যে যোগাযোগ অনুপস্থিতির ব্যাপারটি প্রমাণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সব লোকই সৃজন ক্ষমতার ভাগ্যের

অধিকারী, তবে তার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ভাবে। যেকোন পেশাগত ক্রিয়াকলাপেই সৃজনের নানা উপাদান হাজির। প্রতিভাধর মানুষ জন্মাতে পারে যেকোন পরিবারে — কৃষক, শ্রমিক, যেকোন জাতির মধ্যে থেকেই আসতে পারে।

সেই প্রাচীন যুগেই চিন্তাবীররা মানুষের ধীশক্তি বিকাশের সঙ্গে তার ক্ষমতার যোগাযোগের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল যেমন সৃজন ক্ষমতাকে জড়িত করেছিলেন ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য হবার, সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখতে পারার সঙ্গে। দেকার্ত তাঁর 'প্রাণের কামনাবাসনা' ব্যাখ্যা-গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের নানা গুণের মধ্যে প্রথম স্থানে বাসিয়েছিলেন আশ্চর্য হওয়াকে, আর তা এই মনে করে যে, সন্দেহ হল সত্যের জননী।

বর্তমানে মনস্তত্ত্ব চর্চা করে নানা ক্ষমতার সমাজবিজ্ঞান — সেগুলি বিকাশে প্রেরণাদায়ক শর্তাদির কর্মপ্রণালী, সাইবেরনেটিক্স সেগুলিকে দেখে সংবাদ-তথ্য প্রক্রিয়াদির এক ব্যবস্থায়, শিক্ষাবিজ্ঞান গবেষণা চালায় নানা ক্ষমতা গঠনের পদ্ধতিগুলির ব্যাপারে ; নন্দনতত্ত্বের আগ্রহ নানা ক্ষমতা বিকাশে নৈতিক প্রেরণাসমূহের প্রভাবের ব্যাপারে। দর্শন উন্মোচন ঘটায় ব্যক্তিত্বের নানা ক্ষমতা গঠনের পূর্বশর্ত ও সামাজিক শর্তাদির, দুনিয়ায় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকলাপের নানা নীতি পদ্ধতির ব্যাপারে জ্ঞান, পদ্ধতি-ভিত্তিক স্থিতিবোধ যোগায়।

মানুষের সৃজন ক্ষমতা — বহু গুণের সংমিশ্রণ কর্তব্য নিরীক্ষণ করার, অবাধ ও নমণীয় চিন্তাধারার,

মতামতের ব্যাপারে স্বাধীনতার, অনাবিল ধারনা যোগানোর ক্ষমতা, অনুরূপ চিন্তা ও তা সংশ্লেষণ, ইত্যাদির ক্ষমতা। ব্যক্তিত্বের সৃজন ক্ষমতাকে অনেক মনস্তাত্ত্বিক জড়িত করেন সজীব কল্পনার, উন্মুক্ত চিন্তাধারার, 'উন্মত্ত নানা ধারণা' সৃষ্টি করতে পারার দক্ষতার সঙ্গে।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে দেখার ক্ষমতা প্রতিভাধর ব্যক্তির অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক গুণ। ১৮শ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক এইচ. ওয়ালপোল (Horace Walpole) তাঁর 'সেরেনদ্বীপের তিন যুবরাজ' (সেরেনদ্বীপ — শ্রীলঙ্কার প্রাচীন নাম) গল্পে যুবরাজদের আশ্চর্যজনক নানা ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন: আবিষ্কারের আশা না করে তা করা, যা খোঁজা না হচ্ছে তা খুঁজে পাওয়া, ঠিক এ কারণেই আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক কেনান ব্যক্তিত্বের সৃজন ক্ষমতা রূপে অভিহিত করেছেন আকস্মিকের মধ্যে — যা খোঁজা হচ্ছে, তা, সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খুঁজে পাওয়া, আর তার সংজ্ঞা দিয়েছেন serendipiti ব্যক্তিত্বের সৃজন প্রতিভা রূপে অভিহিত করা হয় 'পার্শ্ববর্তী চিন্তাধারা', এমন সিদ্ধান্ত খুঁজে পাবার দক্ষতাকেও, যখন এমনসব তথ্য ব্যবহৃত হয়, যেগুলি অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়।

ব্যক্তিত্বের অন্যতম এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত সৃজন ক্ষমতা হল উপমা দ্বারা চিন্তা করার দক্ষতা। উপমা — এ হল অন্যান্য বস্তু, ব্যাপারের সঙ্গে কোন বস্তুর সদৃশ ধরনের নানা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের আনুমানিক

সিদ্ধান্ত গ্রহণ। উপমা দ্বারা মানুষ নানা বস্তুর মধ্যে সুপ্ত যোগাযোগ নির্ণয় করে। সুবিদিত যে, আর্কিমিডিস এক উপমা নিরীক্ষণ করেছিলেন বাথ-টবে জল-হটানো নিজের দেহ এবং এক গরুর মধ্যে, যার ওজন তার নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। অনুর গ্রহজনিত গঠন-কাঠামোর ব্যাপারে এ. রাথারফোর্ডের অনুমান গড়ে উঠেছিল সৌর জগতের ধারণার ব্যাপারে উপমার ভিত্তিতে: যেখানে অনু হল এক অতি ক্ষুদ্র সৌর জগৎ। সূর্য — অনুর কেন্দ্র, আর গ্রহ-উপগ্রহ — বিভিন্ন ইলেকট্রন, কেন্দ্রের চারিধারে যেগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে ডিম্বাকৃতি কক্ষপথ ধরে।

ব্যক্তিত্বের সৃজন-প্রতিভার আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-উপাদান — নানা আইডিয়া সৃষ্টির, তৈরির ক্ষমতা। আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক আ. অসবর্নের প্রস্তাব অনুযায়ী 'মস্তিষ্কের আক্রমণ', 'মস্তিষ্কের ঝড়ো-আক্রমণ' হল মানুষের সৃজন-ক্ষমতা সক্রিয় করার এক কর্মপদ্ধতিস্বরূপ। এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি একগুচ্ছ 'যুক্তিমালা' পেশ করেছেন, যা অনুসরণ করে চিন্তাধারা 'উন্মুক্ত করা' সহজ হয়। এগুলির মধ্যে পড়ে যেকোন মতামতের ব্যাপারে সমালোচনার ষোলআনা অনুপস্থিতি, 'দুরন্ত কল্পনার', যেকোন, একেবারে আশ্চর্যজনক উপমাদিরও পরিসর বৃদ্ধি, 'উন্মত্ত' নানা ধারণা উত্থাপন। উক্ত বিজ্ঞানীর এই আইডিয়ার কল্যাণে সুনির্দিষ্ট নানা কর্তব্য, সর্বাগ্রে যান্ত্রিক সৃজনের ক্ষেত্রে, সমাধানে যথেষ্ট হারে সহায়তাদান করা হয়েছিল।

সমস্যা উত্থাপনের, বৈজ্ঞানিক অনুমান পেশ

করার দক্ষতা দ্বারাও ব্যক্তিত্বের সৃজন-ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।

এর অর্থ অবশ্য কখনই এই নয় যে, ব্যক্তিত্বের সৃজনে প্রেরণা ও শ্রম দুই মেরুর মতো দূরত্বসম্পন্ন, অন্যায় তা দেখতে হত ব্যক্তিত্বের এইসব অবস্থার — যেমন, আবেগ, আনন্দ, চিন্তাধারার উড্ডয়ন, প্রেরণার মুহূর্ত — 'অতীন্দ্রিয়করণস্বরূপ', হতে পারত প্রতিভার কাছে আবেদন করার অনুরূপ। ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টা হল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রেরণাজনিত অবস্থার, সৃজন-শক্তির জোয়ার সৃষ্টি করা। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত জানা আছে, যখন প্রেরণার অপেক্ষায় বসে থাকা, তা জালে 'ধরা' হয় না, বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, যাতে তা দেখা দেয়। রুশ সুরকার চাইকোভ্‌স্কি লিখেছেন : 'গোটা রহস্যই এতে যে, আমি কাজ করেছি প্রতিদিন ও সুশৃঙ্ঘলভাবে। এ ব্যাপারে আমি লৌহকঠিন মনোবলের অধিকারী এবং যখন কাজ করতে খুব একটা ইচ্ছে করে না, তখন সর্বদা অপ্রবৃত্তি দমন করে কোনকিছুতে আসক্ত হতে নিজেকে বাধ্য করতে জানি।' ভাস্কর ও. রোদেন, শিল্পী দেগার মতেও, প্রেরণার উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কাজের দ্বারা তা সৃষ্টি করা দরকার। হাজারাধিক আবিষ্কারের জনক এডিসন বলেছেন, প্রতিভা হল এক শতাংশ প্রেরণা ও নিরানব্বই শতাংশ মাথার ঘাম। অযথাই প্রতিভার বৈশিষ্ট্যগুলি বলতে কর্ম-ক্ষমতা, একগুয়েমি, ধৈর্যকে বোঝান হয় না —

কেননা লোকে প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, প্রতিভাধর হয়ে ওঠে।

৪। '... মানবিক কোনকিছুই আমার কাছে অজানা নয়।'

আবেগ বিনা কি ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে? মানুষ শুধু কর্ম ও চিন্তা করার জন্যই বাস করে না, আনন্দ ও যাতনা, ভালবাসা ও ঘৃণা করার জন্যও বাস করে। মানুষের চেতনার আকুলতা, তার আবেগ-প্রবণতাকে দার্শনিক গ. লাইবনিৎস এই উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন: জ্যামিতি যদি আমাদের কামনা-বাসনা ও আগ্রহের বিপরীত-ধর্মী হত, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে তর্ক জুড়তাম ও তার প্রশ্নাদি লঙ্ঘন করতাম, আর তা ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও।*

'আবেগ' (লাতিন emovere থেকে) শব্দের অর্থ উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা বোধ করা। আবেগ — ব্যক্তিত্বের এক প্রত্যক্ষ, একান্তভাবেই ব্যক্তিগত মনাবস্থা। মানুষের আবেগজনিত ক্ষেত্রের রূপরেখাটি গঠিত হয় নানা আবেগ (সরল, প্রাথমিক) দ্বারা — খিদে, ব্যাথা, ভয়, তৃষ্ণা; অনুভূতি (সামাজিক

---

* লাইবনিৎস গ. ভ.। মানুষের যুক্তি সম্পর্কে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৬, পৃঃ ৮৮ (রুশ সংস্করণ)।

আবেগ) — ভালবাসা, ঘৃণা, লজ্জা, বিবেক, কর্তব্য, মানসম্মান ; কামনা-বাসনা (সুগভীর অনুভূতি), স্নায়বিক অবস্থা — ক্রোধ, হতাশা, আতঙ্ক। সব আবেগ ও অনুভূতি **প্রীতিকর** ও **অপ্রীতিকরে** বিভক্ত, যা সন্তুষ্টি, আনন্দ, মুচকি হাসি, হাসি ও অসন্তুষ্টির — দুঃখ, মনব্যথা, হতাশা, চোখের জলের উদ্রেক ঘটায়। সেই ১৬শ শতাব্দীতেই মানুষের পক্ষে ইতিবাচক আবেগের হিতকারিতার কথা উল্লেখ করেন ফরাসী চিকিৎসক আ. পারে, যাঁর মতে, ওষুধের দোকানে যাওয়ার চেয়ে সার্কাসে যাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

মানুষের যা পছন্দ, সে তার প্রতি প্রচেষ্ট আর অপ্রীতিকরকে সে এড়াতে চেষ্টা করে। প্রকৃত সংগ্রাহক চিত্র, মুদ্রা, ডাকটিকিট সংগ্রহ করে এ কারণে নয় যে, বহুমূল্যবান, বরং এ কারণে যে, সেই 'সংগ্রহ' প্রক্রিয়া থেকে সে সন্তুষ্টি লাভ করে। লোকে রহস্য উপন্যাস পড়ে। 'ভয়ঙ্কর সিনেমা' দেখে সুপ্রখর অনুভূতি লাভের জন্য, চিত্রের রসোপলব্ধি করে, গান-বাজনা শুনে তা উপভোগ করে, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে।

মানুষের আবেগজনিত জীবন অপূর্ব ও সীমাহীন। তা অসংখ্য অনুভূতি, মনভাব, আবেগজনিত অবস্থা দ্বারা গঠিত : অনুশোচনা আমাদের 'কুরে কুরে খায়', লজ্জায় আমরা 'মাটিতে মাথা খুঁজতে' প্রস্তুত, আতঙ্কে 'অসাড় হই', ভয়ে 'কঠিন পাথর' হয়ে যাই। ভালবাসা মানুষের মনে জাগায় আনন্দ

ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, নির্যাতিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। দান্তে ও পুশকিনকে, বায়রন ও শেক্সপিয়রকে, গ্যেটে ও পেত্রার্কাকে ভালবাসা অমর কবিতা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। অনুভূতির দরুন প্রায়ই একে অন্যের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কাহিনী বলেছেন প্লুটার্ক। লড়াই কালে এক সেনা রাজার জীবন বাঁচিয়েছিল, কিন্তু তার বিজ্ঞতার উপদেশকে উপেক্ষা করে সেখান থেকে ভাগার বদলে সে সেখানে রয়ে গেল এই আশায় যে রাজার কৃতজ্ঞতা লাভ করবে ; এর মূল্য তাকে জীবন দিয়ে দিতে হয়েছিল। অনুভূতির দরুন মানুষ মাঝেসাঝে অসাধারণ কাজকর্ম করে। যেমন, জাহাজ-ডুবির বলিদের প্রতি সমব্যথী, তাদের সাহায্য করতে অভিপ্রায়ী ফরাসী চিকিৎসক অ্যালেন বোমবারের মনে ইচ্ছা জেগেছিল, খাবারদাবার ছাড়া এক হাওয়া-ভরা নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবেন এ প্রমাণের আশায় যে, চরম পরিস্থিতিতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

মনভাব — ব্যক্তিত্বের আবেগজনিত পটভূমি, অপেক্ষাকৃত ছোট উত্তেজনামূলক অবস্থা, যা জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, অনুভূতি, ইত্যাদির প্রভাবাধীন। গভীর ও প্রবল অনুভূতি হল কামনা-বাসনা। মানুষ এ অনুভূতি অনুভব করে অন্য মানুষের, শিল্পকলার, বিজ্ঞানের, শ্রমের, ক্রীড়ার প্রতি। যেমন ধরুন *বিজয়লাভের প্রবল আকাঙ্খা,* যা রয়েছে সেনা ও রাজনৈতিক কর্মী, খেলোয়াড় ও বিজ্ঞানীদের মনে — এ হল প্রবল কামনা।

মানুষের বিশেষ অবস্থা — স্নায়বিক উত্তেজনা, মানুষের কাজকর্ম যখন বিচারবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাকে কাণ্ট তুলনা করেছেন বাঁধ-ভাঙা জলের সঙ্গে, আর কামনা কাজ করে সেই জলধারার মতো, যা ক্রমশ গভীর, আরও গভীর ভাবে আসনের নিচে বিস্তারিত হয়। সেই অ্যারিস্টটলও তাদের প্রতি সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যারা সিদ্ধান্ত নেয় রাগের বশে অথবা কোন রকমের স্নায়বিক উত্তেজনার প্রভাবে, যেহেতু, তাঁর মতে, তাতে সুফল হতে পারে না।

মাঝেসাঝে সজোরে বলা হয়, আমাদের এই 'প্রয়োগ-সর্বস্য' যুগে আবেগের কোন মূল্য নেই, প্রয়োজন হল কর্ম-চটপটে ও হিসাবী হওয়ার। তবে মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকদের মতে, আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া (আবেগের ব্যাপারে স্থূলবুদ্ধি) পুরোপুরি বঞ্চিত মানুষ মনস্তত্ত্বের বিচারে অসুস্থ। আবেগ হল মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ও ক্রমবিকশিত এক চাহিদা। এ প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের আবেগ-ভরা কোন কাজকর্ম তার থেকে অনেক বেশি সাফল্যজনক, যাতে সে সীমিত থাকে বিচারবুদ্ধির শীতল নানা যুক্তি দ্বারা। আবেগহীন লোকেরা সহানুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে না। আবেগজনিত 'বুভুক্ষা' — নিঃসঙ্গতার প্রতীক, অসহায় অবস্থা, প্রবল মনব্যথার কবলে প্রায়ই সেইসব লোকে পড়ে, আবেগজনিত মেলামেশা থেকে যারা বঞ্চিত — সুমেরু ও কুমেরুতে শীত-কাটানো লোকেরা, পরমাণুচালিত

জাহাজ, ডুবোজাহাজের কর্মীরা, মহাকাশচারীরা। বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে 'কাটাকাট্টা', রুটিন-মাফিক বলে ধারণার চল আছে, তবে এ হল ভ্রান্ত ধারণা। 'মানবিক আবেগ বিনা মানুষের **সত্যানুসন্ধান** কস্মিনকালেও ছিল না, নেই আর থাকতেও পারে না,'* — লেনিন উল্লেখ করেছেন।

সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্টি হয় নান্দনিক রুচি, তা ব্যক্তিত্বের সৃজনকর্মে প্রভাবশীল এক জাগরণ-ঘটানো হেতুর কাজ করে। 'বিজ্ঞানের কবিতা' দ্বারা জন্মায় উপভোগ করার, উৎকন্ঠা বোধের, পরমানন্দের, সামঞ্জস্য বোধের নান্দনিক অনুভূতি। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার পরিমাপহীনতা, বিশালত্ব, সীমাহীন বহুরূপী অবস্থা ও সৌন্দর্য দ্বারা — সব দিক থেকে যেগুলি তাতে দীপ্ত — প্রাণে মুক আশ্চর্য জাগায়, — কাণ্ট লিখেছেন। — তবে এই পূর্ণতর রূপের ধারণা আমাদের কল্পনার উদ্দীপনা ঘটালে, অন্যদিকে, এ চিন্তা করলে যুক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হয় যে, এই মহত্বের ধারা বইছে অমর ও সুসম্পূর্ণ শৃঙখলায় এক সাধারণ নিয়ম থেকে।'**

---

* লেনিন ভ. ই.। সংগৃহীত রচনাবলী, খঃ ২৫, পৃঃ ১১২ (রুশ সংস্করণ)।

** কাণ্ট ই.। রচনাবলী, ৬ খণ্ডে, খঃ ১, পৃঃ ২০১ (রুশ সংস্করণ)।

৫। সবার থেকে একান্তে

ব্যক্তিত্বের আরও এক আবেগজনিত অবস্থার প্রতি নজর দেওয়া যাক্ — সমব্যথী হওয়া। এর অর্থ — 'অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা', 'অন্তরে প্রবেশ করা', 'নবরূপ দান', 'সহনশীলতা'। 'সহমর্মিতা' — এর অর্থ অন্যের অবস্থায় প্রবেশ করা, দুনিয়াকে 'তার দৃষ্টিতে' দেখা, তার আশঙ্কা ও আনন্দের, ব্যথা ও হতাশার ভাগীদার হওয়া। অন্য ব্যক্তিত্বের রোজকার জীবনের ব্যথা-বেদনা সহ্য করা — তার দুনিয়া সহ্য করার সমতুল্য। আবেগের এক সেতু রচনা করে নিজস্ব 'আমি' নিজের জগতের সঙ্গে 'অপর আমির' সংস্পর্শের বিন্দুটি খুঁজে করে। আবেগজনিত সাড়া বিনা মানুষের জীবন দৈন্য, সে নিজেকে নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, সবার কাছেই অপ্রয়োজনীয় রূপে অনুভব করে। এমনি এমনিই বলা হয় না, ভাগ-করা আনন্দ — দ্বিগুণ আনন্দ, ভাগ-করা দুঃখ — অর্ধেক দুঃখ।

'অন্তরে প্রবেশ করা' বিনা খোকাখুকিদের খেলাও সম্ভব নয়, যাতে ছোটরা 'মা-মেয়ে খেলে', 'মহাকাশচারী হয়ে', 'যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে' নিজেদের বড় বলে 'মনে করে'। বিজ্ঞানীদের ক্রিয়াকলাপে সমব্যথী অবস্থানের ভূমিকা মহান, যাঁদের প্রচেষ্টা হল ভিতর থেকে গবেষণাজনিত পরিস্থিতিতে 'স্থানান্তরন', নিজেকে বুঝি-বা অনুরূপ ভেবে, যার সম্বন্ধে চেতনালাভ

করা দরকার, তা হয়ে উঠা।' লেখকরা নিজেদের নায়ক-নায়িকাদের বর্ণনা দিয়ে বুঝি-বা তাদের জীবনের মতোই বসবাস করেন, তাদেরই নানা অনুভূতি উপলব্ধি করেন যেমন, এম্মা বোভারির বিষ খাইয়ে হত্যার দৃশ্যে ফ্লবেয়র সেঁকোবিষের স্বাদ পান, নিজে বিষ খাওয়ার অনুভূতি লাভ করেন। সুবিদিত যে, ডুমা (বড়) তাঁর নানা চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তাদের সঙ্গে তর্ক করতেন, ভয় দেখাতেন, প্রশংসা করতেন, তাদের ক্ষুরধার আচরণ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতেন।

একই সময়ে প্রকৃত শিল্পকলা মানুষের মনে যথার্থ ঘটনাবলীর ছাপ জাগায়, অবশ্য যদি ব্যক্তিত্বের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা লেখক, শিল্পী ও অভিনেতা দ্বারা সৃষ্ট 'কাল্পনিকতার' সঙ্গে সমতালের হয়। মানুষের পক্ষে সাহিত্যিক বাস্তবতা সুনির্দিষ্ট অর্থে অবজেকটিভ বাস্তবতা হয়ে ওঠে। 'অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা' বিনা ব্যক্তিত্ব সুন্দরকে উপলব্ধি করতে, মানুষের চিরস্থায়ী মূল্যবোধগুলির, মানুষের অস্তিত্বের তাৎপর্যের, মানবিক সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারে না।

মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকৃতি জাতীয় বিষয়বস্তুর নিপুণ শিল্পী। তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রাদির প্রতিকৃতিমূলক স্কেচগুলি 'জীবন্ত' রূপে অনুভূত হয়। 'লুই *বোনাপার্টের* ১৮ই ব্রুমেয়ার' রচনায় মার্কস লুই বোনাপার্টের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকৃতি এঁকেছেন, নেপোলিয়নের মুখোশ

পরে যিনি নিজেকে প্রকৃত 'নেপোলিয়নের' মতোই বড় করতে চেয়েছেন। এঙ্গেলসের 'জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ' রচনায় আমরা দেখি দুই রাজনৈতিক নেতা তথা প্লিবিসাইট বিপ্লবী ট. মিউনৎসার ও 'বিউরগের সংস্কারবাদী' ম. লুথারের তুলনামূলক প্রতিকৃতি।

তবে ঐতিহাসিক অতীতের সঙ্গে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের মিল-ঘটানো ঘটে শুধু আংশিকভাবে, যেহেতু রচয়িতা — তাঁর যুগের সমকালীন ব্যক্তি, তাঁর কাজকর্ম নির্ধারিত হয় তাঁর জীবনের বাস্তবতা দ্বারা। সমব্যথায় 'সহনশীলতা, সহমর্মিতার' দরুন ব্যক্তিত্বের বুঝি-বা 'বিভাজন' ঘটে — তার প্রকাশ ঘটে যেমন ঐতিহাসিক অতীতের এক চরিত্র রূপে, তেমনই বর্তমানের কর্তা (subject) রূপে। তবে এ প্রক্রিয়ায় জরুরী হল ব্যক্তিত্ব অতীতের 'অন্তরে প্রবেশ করে' যেন তার মূল্যায়ন করতে পারে বর্তমানের অবস্থান গ্রহণ করে।

৬। স্মৃতির প্রস্তুত থাকা

স্মৃতি — এ হল মানুষ কর্তৃক ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা স্মরণ করা, মনে রাখা, চিনতে পারা ও পুনর্বিবৃত করা। স্মৃতি — সংবাদতথ্যের রক্ষা-ভাণ্ডার, গুদামঘর, তা তার শ্রেণীবিভাগ করে না, পুনর্বিবৃত করে। স্মৃতির ভিত্তিটি গঠিত যোগাযোগ ও সম্মিলন দ্বারা — জটিলতা, মিল, পার্থক্য। মানুষের স্মৃতি স্বল্পকালীন, তাকে প্রায়ই অভিহিত করা হয় দীর্ঘকালীন স্মৃতি। সবেমাত্র ঘটা নানা ঘটনা, ব্যাপার, দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ

সহজে স্মরণ করা যায়, সুদূর অতীতের ব্যাপারে — অতি কষ্টে। মানুষের স্মৃতি নির্বাচনে সক্ষম : প্রীতিকর ও আগ্রহজনক ব্যাপার আমরা মনে রাখি এবং অপ্রীতিকর — স্মৃতি থেকে ভাগাতে চেষ্টা করি। স্মৃতি হতে পারে অবয়ব ধর্মী — তা দৃষ্টিগোচর, শ্রুতিগোচর, চলনক্ষম ধারণা সৃষ্টি করে আর হতে পারে আবেগ ধর্মী, যা জড়িত মানুষ কর্তৃক নানা আবেগ ও অনুভূতির পুনঃসৃষ্টি ও চিনতে পারার সঙ্গে। অনুভূতির স্মৃতি, 'হৃদয়ের স্মৃতি' প্রায়শই যুক্তিনির্ভর স্মৃতির থেকে বেশি শক্তিশালী হয়।

প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের পেশাগত ক্রিয়াকলাপ তার স্মৃতিতে প্রভাব ফেলে : সঙ্গীতকারদের শ্রুতিগোচর স্মৃতি সুউচ্চ স্তরে পৌঁছায়, শিল্পীদের — দৃষ্টিগোচর, দার্শনিকদের — উক্তিজনিত-যুক্তিনির্ভর, ইতিহাসবিদদের — কালপঞ্জীজনিত, খাদ্য পরীক্ষকদের — আস্বাদজনিত, ঘ্রাণশক্তিজনিত, ইত্যাদি।

স্মৃতি আপেক্ষিকভাবে সুস্থায়ী এবং শুধুমাত্র তার ব্যবহারের কল্যাণেই 'সজীব' হয়ে ওঠে : মানুষের ক্ষেত্রে স্মৃতির নানা ভাবমূর্তির বুঝি-বা এক 'উল্টোমুখী' যোগাযোগ ঘটে — 'চিনতে পারার' তথা নতুন স্মৃতি আহরণ ক্ষমতার সঙ্গে সুবিদিত স্মৃতির। স্মৃতির কাজ — আগে গৃহীত স্মৃতির পুনরুৎপাদন, যাতে 'নানা ফাঁক', ভুলভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। স্মৃতির বৈশিষ্ট্য আপাত-বৈপরীত্য ব্যাপার — তার অভাব তাকে দৈন্য করে, আর প্রচুর, 'উপছে-পরা' স্মৃতি ব্যক্তিত্বের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটায়।

মানুষের পক্ষে স্মৃতিচারণ বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে ঘনিষ্ঠ করে। ১৯শ শতাব্দীর মনস্তাত্ত্বিক ইউ. জেমসের মতে, অতীতে যা সওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে এবং তার আগে আমরা যা প্রত্যক্ষভাবে ভাবি নি, সে সম্বন্ধে কিছু ভাবার ক্ষমতা। স্মৃতিচারণ অতীতের পুনঃসৃষ্টি ঘটায়। আমাদের নিয়ে যায় শুধু অতীত থেকে বর্তমানেই নয়, বরং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতেও।

স্মৃতিচারণ হতে পারে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর, আংশিক ও প্রণালীবদ্ধ। স্মৃতিচারণ ব্যক্তিত্বের পক্ষে মূল্যবান বস্তু হয়ে উঠতে পারে। লেভ তলস্তয় নিজের দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন, বাস্তবতা উপভোগের চেয়ে তিনি স্মৃতিচারণ কম উপভোগ করেন না, মাঝেসাঝে এমনকি বেশি করেন।

মানুষের জীবন এত স্বল্পমেয়াদি, অথচ কী করে সে এত বেশি জানতে ও মনে রাখতে সক্ষম হয়? ব্যক্তিত্বের অন্তর্জগৎ প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মে আগেকার চেয়ে অধিক সমৃদ্ধ ও বহুরূপী হয় কেন? এর ব্যাখ্যা করা যায় এর দ্বারা যে, মানুষ তার সামাজিক প্রকৃতির কল্যাণে সেই জন্মকাল থেকে অতীত ও বর্তমানের নানা প্রজন্ম অর্জিত বিভিন্ন অভ্যাস ও জ্ঞান স্মৃতির আয়ত্তে আনে ও রক্ষা করে, মানবজাতি প্রণীত সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। রুশ ইতিহাসবিদ ভ. ও. ক্লিউচেভ্স্কি লিখেছেন, হাজার বছর পরে মানুষ কেমন হবে তা তিনি জানেন না, তবে

উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত ও অর্জিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলে, সে সবকিছুই বিস্মৃত হবে, সবকিছুই করা ভুলে যাবে এবং সবকিছুই তাকে শুরু থেকে শুরু করার দরকার হবে।

৭। কল্পনার ভেল্কিবাজি

কল্পনা করার ক্ষমতা — মানুষের পক্ষে উপহারস্বরূপ। এ বিনা রোজকার জীবন, বিপ্লবী সংগ্রাম, সৃজনকর্ম সম্ভব নয়। এ উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মী বিজ্ঞানী, কবি ও দার্শনিক। মার্কস কল্পনাকে অভিহিত করেছেন এক মহান উপহার রূপে, যা মানবজাতি বিকাশে সাহায্য করেছে। এই কল্পনাই সৃষ্টি করেছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, মার্সেলিজ, ট্রিস্টান ও ইজোল্ডা সম্বন্ধে বিষাদজনক কাহিনী, অণুর বিভাজন, বিদ্যুৎ বাতি, যুবরাজ হ্যামলেটের কাহিনী, আপেক্ষিক তত্ত্ব। কল্পনা বিনা কোন কাজই সম্ভব নয়। কল্পনায় ব্যক্তিত্ব গোটা দুনিয়াকে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম। এই ক্ষমতা কীভাবে দেখা দেয় ?

মানুষের সৃজন-তৎপরতা সর্বাগ্রে দেখা দেয় ব্যবহারিক কাজকর্মে, জগৎ পুনর্গঠনের কাজে — মূলত শ্রমে। কল্পনা বিনা মানুষের শ্রম সম্ভব নয় — শ্রমের ফলাফলের 'কল্পনা না করে', কাজে হাত দেওয়া চলে না। শ্রম — মানুষের সৃজন

ক্ষমতার, তৎসহ কল্পনা শক্তিরও উৎস। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, গাছপালা, পাথর, ধাতুর প্রতি আদিম মানুষের ঠিক ততটাই আগ্রহ ছিল, যতটা তার দরকার ছিল তীরধনুক, কুড়ুল, লাঙ্গল তৈরির জন্য। কাজের বাস্তবে রূপদানের আগেই তার ফলাফলের ধারণায় গড়ে উঠেছিল মানুষের সৃজন-ক্ষমতা, সর্বাগ্রে কল্পনা শক্তি। শ্রমের বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরিই ছিল মানুষের সৃজন কর্মের প্রথম উদ্যোগ।

মানুষের কল্পনা সীমাহীন : কল্পনায় শিল্পী ছবি আঁকে, পরিচালক মঞ্চপট 'তৈরি করে', উদ্ভাবক ভবিষ্যতের যন্ত্র 'সৃষ্টি করে'। ক্রিয়াকলাপের কর্তব্য ও লক্ষ বাস্তবতার, তার বিকাশ প্রবণতার সঠিক প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকলে, কল্পনা গঠন করে সুষম নানা ভাবমূর্তি। কোন এক চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত ফলের ধারণা করে মানুষ কল্পনায় অনুসন্ধান-রতর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে। ক্রিয়াকলাপ চাহিদার আদর্শ বাস্তবায়ন ঘটায়, বাস্তবতা থেকে কল্পনার বিচ্যুতি ঘটলে, বাস্তবের পথে অলীক দ্বারা বাধাসৃষ্টি হলে, তা ভিত্তিহীন অলীক কল্পনার আকার নিতে পারে।

কল্পনার সম্ভাবনা সামাজিক দিক থেকে সীমিত। ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিটি পর্বে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করে। যেমন, জগতের অনুজনিত গঠন-কাঠামোর ব্যাপারে অনুমানের কথা বলা হয়েছিল পুরাকালে। তবে তার প্রমাণ দিতে

সমর্থ হয়েছিল শুধু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান। নানা চাহিদার আদর্শ প্রতিফলনের ভূমিকা নিয়ে মানুষের কল্পনা সৃষ্টি করে ঈপ্সিত ভবিষ্যতের ভাবমূর্তি, কাজকর্মের সুনির্দিষ্ট নানা লক্ষ্য।

কল্পনা ও অলীক কল্পনার পারস্পরিক সম্পর্কটি কেমন? এই ধারণাদ্বয় প্রায়ই সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়। একদলের মতে, অলীক কল্পনা হল মানুষের বাস্তবকে 'অস্বীকার করার' ক্ষমতা, অন্যদলের মতে — কল্পনার সর্বোচ্চ আকার, যার পার্থক্যস্বরূপ আছে ভাবমূর্তির উজ্জ্বলতা ও অসাধারণতা। তবে কর্ম প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে কল্পনা ও অলীক কল্পনা নিজেদের প্রকৃতির বিচারে এক ও অখন্ড। মানুষ যখন অলীক কল্পনায় মগ্ন, বিভিন্ন ভাবমূর্তির মধ্যে যোগাযোগ তখন অবাস্তব চরিত্র নিতে পারে, আর খোদ ভাবমূর্তিগুলির বাস্তবে কোন এক জাতীয় ধরন না থাকতে পারে। বাস্তব ছেড়ে 'পাখা মেলে' মানুষ কল্পনায় প্রচেষ্ট হয় সর্বাধিক সম্পূর্ণভাবে — যদিও পুনর্গঠিত আকারে — লক্ষ্যবস্তুকে রূপ দিতে এবং তা চেতনালাভের উদ্দেশ্যে। এমনকি সবচেয়ে বেশি মরীয়া অলীক কল্পকারও ইচ্ছাকৃতভাবে নানা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে না, বরং বাস্তবের নানা প্রকৃত উপাদান থেকে সেগুলির সংমিশ্রণ, সংশ্লেষণ ঘটায়। কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট নতুন ভাবমূর্তিগুলির তাৎপর্য নির্ধারণ করে উদ্ভাবন ও বাস্তবতা। উদ্ভাবনে বুঝি-বা দু'টি মুহূর্ত হাজির: ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক

মুহূর্তের মূলকথা হল এই যে, সম্ভাব্য ও মনগড়া নানা পরিস্থিতি থেকে নির্বাচন করা হয়, সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। নেতিবাচক — এ হল অগ্রহণীয় নানা পরিস্থিতি ও অবাস্তব ভাবমূর্তি সৃষ্টি করা।

আগ্রহের ব্যাপার যে, কল্পকাহিনীর লেখকরা মাঝেসাঝে এমনসব আবিষ্কারের প্রত্যাশা করেছিলেন, যেগুলি করা হয়েছিল বহু বছর বাদে। গোনা হয়েছে যে, জুলে ভার্নের বিভিন্ন উপন্যাসে শতাধিক কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার কথা বলা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ১০টি ভুল হয়েছিল, আর হার্বার্ট ওয়েলসের ৮৬টি ধারণার মধ্যে মাত্র ৯টি। এইচ. জি. ওয়েলস 'টাইম মেশিনে' ১৮৪৫ সালে সময়ের আপেক্ষিকতার চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন — তা আবিষ্কারের ১০ বছর আগেই। মহাকাশ-বিজ্ঞানের জনক রুশ বিজ্ঞানী কনস্তান্‌তিন ত্‌সিওলকভ্‌স্কি মনে করতেন, জুলে ভার্ন তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত' উপন্যাসে চন্দ্রযাত্রার কথা বলে মহাকাশ রকেট তৈরির সম্ভাবনার ব্যাপারে ভাবতে তাঁকে বাধ্য করেছিলেন।

মানুষের কল্পনা রূপকথা অথবা পুরাকাহিনী দ্বারা সৃষ্ট অলীক কল্পনার নানা ভাবমূর্তি তৈরিতে সক্ষম : দৈত্য-দানব, লিলিপুট, প্রকৃতি ধরণের চরিত্র সবার কাছেই সুবিদিত। লেখক ও শিল্পীর কল্পনা আর নৈপুণ্য আমাদের একের মধ্যে সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণকে, সুনির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে টিপিক্যাল লোকজনকে দেখার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যেমন, প্রাচীন গ্রীক শিল্পকলায় হারকিউলিস হল

শক্তির প্রতীক, পিনেলপি — বিশ্বস্ততার, পেড়সিয়স সাহসিকতার, নার্সিসাস — সৌন্দর্যের।

মানুষ আগে যেসব বস্তু অথবা ব্যাপার লক্ষ্য করে নি, মানুষ কর্তৃক সেগুলির ভাবমূর্তি রচনায় কল্পনার ভূমিকা মহান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদিম লোকেদের পাথরে খোদাই-কার্য, তাদের জীবনযাত্রার নানা জিনিস, তাদের ঘরবাড়ির অবশিষ্ট, ইত্যাদি ইতিহাসবিদ, লেখক, স্থপতিদের কল্পনার জাগরণ ঘটিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন পুনঃস্থাপনে সাহায্য করে। ঠিক সে কারণেই কল্পনা অত্যাবশ্যক নানা ইতিহাস বিজ্ঞানে — জীবাশ্ম বিজ্ঞানে, নৃতত্ত্ব বিদ্যায়, প্রত্নতত্ত্বে, যেখানে অতীতের পুনঃসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কল্পনা এমনসব বস্তুর ভাবমূর্তি গড়ে, যেগুলির অস্তিত্ব আছে, অথচ মানুষ কর্তৃক যেগুলি উপলব্ধি অথবা লক্ষ্য করা হয় না আমাদের অনুভূতি যন্ত্রাদির সীমাবদ্ধতার দরুন। যেমন ধরুন চাঁদের প্রতি মানুষের আগ্রহ বহুকালের, অথচ এই উপগ্রহের গঠন কাঠামোর ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের সব অনুমানের ভিত্তি ছিল শুধু তার দৃষ্টিগোচর দিকটির প্রতি পর্যবেক্ষন। আজ যখন আমেরিকান নভচারীরা চাঁদ ঘুরে এসেছেন এবং নানা স্পুটনিক থেকে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে, আমাদের অনুমান তখন বদলেছে প্রকৃত, বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে। জগৎ উপলব্ধিতে মানুষকে সাহায্য করে নানা যন্ত্র, যেগুলি আগে শুধু কল্পনা করা যেত, সেগুলি দেখার সুযোগ দিয়েছে।

অনুপলব্ধের প্রতি প্রচেষ্টা চালিয়ে সৃজন কর্মে কল্পনা চেতনার বেড়াজাল অতিক্রম করে। নতুনের সন্ধানে বিদ্যমান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যক্তিত্বকে সাহায্য করে তা সৃজনমূলক অনুসন্ধানে সংগঠকের ভূমিকাও নেয়।

কল্পনার 'ইউরেকাজনিত' কাজের প্রকাশ ঘটে চাক্ষুষ মডেল গড়ায়, প্রায়ই যাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক চেতনালাভে কল্পনা। মানুষ কল্পিত মডেল ব্যবহার করে গবেষণার বস্তুর জায়গায় তাকে বসিয়ে, মডেলে নির্ধারিত নানা গুণাগুণকে চর্চরিত বস্তুতে (প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক) নিয়ে এসে, আর তা সবই তাদের মিলের ভিত্তিতে, যার কল্যাণে নতুন নতুন জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। কোন ব্যাপারের মডেল তৈরি করে ব্যক্তিত্ব বুঝি-বা বিদ্যমান তত্ত্ব ও নতুনের মধ্যে 'সেতু স্থাপন করে'। বাস্তবে অস্তিত্ব নেই, অথচ দুনিয়ায় প্রটোটাইপ আছে, এমন বিমূর্ত নানা আদর্শ লক্ষ্যবস্তুর মডেলও মানুষ কল্পনায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। গালিলেই জাড্যতা নীতি আবিষ্কার করেন এই অনুমান করে যে, পুরোপুরি গোলাকার ভারি গোলকে গতি প্রদান করা হয়েছে পুরোপুরি মসৃন স্থলদেশের উপরিভাগে। আদর্শ রূপদান, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা যে, গতিশীল বস্তুকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে ঘর্ষণ মুক্ত করা হয়েছে, এবং এর কল্যাণেই তিনি বলবিদ্যার অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সূত্রীবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

ব্যক্তিত্বের কল্পনার আরও এক বৈশিষ্ট্য — মনে মনে চিন্তা করে পরীক্ষা করার ক্ষমতা। তা কাজে লাগাতেন গালিলেই ও নিউটন, এর সাহায্য নিতেন আইনস্টাইন ও বোর, হাইজেনবার্গ ও ত্‌সিওলকভ্‌স্কি। মনে মনে চিন্তা করে পরীক্ষা করাকে প্রায়ই বলা হয় কল্পনা, যেহেতু তাতে মানুষ প্রকৃত পরীক্ষা কাঠামোর পুনরুৎপাদন ঘটায় 'মস্তিষ্কে', কল্পনায়। মানুষের পক্ষে কল্পিত পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করে ঠিক তখনই, যখন প্রকৃত পরীক্ষা কঠিন হয় কোন না কোন অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, ইত্যাদি কারণে, যার কল্যাণে মানুষ সেই পরিস্থিতির গবেষণা চালাতে পারে, হাতে-কলমে যার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, যদিও নীতিগতভাবে তা সম্ভব। সত্যিকথা যে, মনে মনে করা পরীক্ষাকে প্রকৃত পরীক্ষায় যাচাই করার মতো সুযোগ মানুষের সর্বদা নেই, যেহেতু তার পরম রূপদান সম্ভব নয়।

৮। উদ্ভাবন ও বাস্তবতা

কল্পনার পক্ষে প্রধান হল ভবিষ্যতের প্রতি ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিপাত। অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করে ব্যক্তিত্ব কল্পনায় তাকে ভবিষ্যৎ উপলব্ধির কাজে লাগায়। বর্তমানের উপর নির্ভর করে সৃজনধর্মী ব্যক্তিত্ব তথা বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, শিল্পী বিকাশ প্রবণতাকে দূরদর্শন করে, তার পূর্বানুমান করে।

ভবিষ্যতের প্রতি উঁকি দিয়ে মানুষ বুঝি-বা তাতে বাস করে। সৃজনকর্মে কালের পরম্পরা হল নানা প্রজন্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইত্যাদির যোগাযোগ। সৃজনকর্মের নানা সামগ্রীতে অতীত 'নাগরিকত্ব' লাভ করে নানা স্থাপত্য-শৌর্যে, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের রত্নভাণ্ডারে, সাহিত্যে, মানবজাতির গোটা সংস্কৃতিতে। বিভিন্ন চিন্তাবীর, বিজ্ঞানী, শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এক আত্মিক কথোপকথন ঘটে। প্লেটোর মতে, আত্মিক কথোপকথন ঘটতে পারে খোদ নিজের সঙ্গে ও সমকালীন ব্যক্তিদের সঙ্গে, এবং তাদের সঙ্গে, যাদের থেকে আমাদের ব্যবধান কয়েক শতাব্দী ও লম্বা দূরত্বের।

ব্যক্তিত্বের কাজকর্মে যথেষ্ট স্থানাধিকারী হল স্বপ্ন, যার প্রকাশ ঘটে আকাঙ্খিত ভবিষ্যতের প্রকৃত অথবা বিমূর্ত সম্ভাবনা রূপে। '... মানুষ যদি স্বপ্ন করার ক্ষমতা থেকে পুরো বঞ্চিত হত..., সে যদি সময় সময় আগে না বাড়তে ও নিজ কল্পনা দ্বারা অখণ্ড ও সুসম্পূর্ণ সৌন্দর্যকে, তার হাতে সবেমাত্র গড়ে ওঠা সৃষ্টিকে অনুধ্যান না করতে পারত, — তাহলে আমি চূড়ান্তভাবে ধারণা করতে পারি না, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ও ক্লান্তিকর কাজকর্ম হাতে নিতে ও শেষ করতে মানুষকে কোন্ জাগরণজনিত কারণ বাধ্য করত,'— লিখেছেন রুশ সমালোচক দমিত্রি পিসারেভ।

কল্পনা বিনা মানুষ বাঁচতে পারে না, যেহেতু

ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে শুধু ধারণাই করে না — তার প্রতি সে প্রচেষ্ট, তার আসা করে, প্রচেষ্টা চালায় যে, তার স্বপ্ন সফল হবে না। স্বপ্ন সফল হওয়া ব্যক্তিত্বের চাহিদায়, তার জীবনের কর্মসূচিতে পরিণত হতে পারে। এখানে প্রথম সারিতে আত্মপ্রকাশ ঘটে তার স্বার্থাদির, মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধের গতিবিধি। স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে পারে কাজ করার জাগরণজনিত হেতু রূপে, নানা আদর্শ লাভের, ভাবাদর্শ অথবা সার্বজনীন লক্ষ্যের সেবা করার প্রচেষ্টা রূপে। যেমন, কিশোর বয়স থেকে নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাক্সিমিলিয়ান রোবস্‌পিয়ার স্বর্ণযুগ, সমতা ও ন্যায় সম্বন্ধে নিজ স্বপ্নের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সোৎসাহী, উদ্যমী, অদম্য শক্তিতে ভরপুর তিনি এই স্বপ্ন জীবনে রূপ দিতে প্রচেষ্ট ছিলেন এবং তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।

যুগের পর যুগ মানুষ স্বপ্ন দেখেছে উত্তম জীবনের, অভাব ও দুঃখ থেকে, শোষণ ও অধিকারহীন অবস্থা থেকে রেহাই পাবার। এইসব স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে 'পার্থিব স্বর্গের', 'সুখী পৃথিবীর' অনুসন্ধানে। এর স্বপ্ন দেখতেন লেখক হেসিওড ও প্লেটো, ভার্জিল ও ওভিদি, লুকরেৎসি ও সেনেকা। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আদর্শ ধারণা বর্ণিত হয়েছে টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া দ্বীপে', কাম্পানেলার 'সৌর নগরীতে', কাবের 'ইকারিয়া ভ্রমণে' বেল্লানির 'পিছনে দৃষ্টিপাতে'।

স্বপ্ন দেবার ক্ষমতা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলে, তার এক একান্ত উৎসাহদায়ক কারণও উধাও হয়, যার দ্বারা সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান আর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামের ইচ্ছেও উধাও হয়। তবে স্বপ্নের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়, ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার অনুমান করা চাই। ইতিহাসের কঠিন মোড়বদলের, সামাজিক ঝড়ের, বৈপ্লবিক ওলট-পালটের পর্বে নতুনের উদ্ভব মানুষের কাছে পুরনো — যেমন বৈষয়িক, তেমনই আত্মিক ক্ষেত্রে — অতিক্রম করার দাবি জানায়। তা সেই জনতার চেতনা সক্রিয় করার শর্তের কাজ করে, যারা আকর্ষিত হয়েছে বিপ্লবিক আন্দোলনে, সামাজিক বিকাশের দ্রুতগতি প্রক্রিয়ায়। ব্যক্তিত্বের চেতনা 'সাফাই করার' এই কাজে বিপুল ভূমিকা পালন করে কল্পনা তার বৈপ্লবিক — সমালোচনামূলক ক্রিয়ায় এবং পুরনো নানা মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করে। 'না'-এর 'সাফাই ঝড়' — ব্যক্তিত্বের সৃজনকর্মের অত্যাবশ্যক উপাদান, যেহেতু নানা ঐতিহ্য, গতানুগতিকতা, অভ্যাসের শক্তি ব্যক্তিত্বের পক্ষে 'বেড়াজাল' ও 'হাতকড়িতে' রূপান্তরিত হয়, আর সে সেগুলির বন্ধনমুক্ত না হলে নতুন সৃষ্টি করতে পারে না।

সৃজনকর্মের প্রকাশ রূপে ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা, তার মুক্তির হার নির্ধারিত হয় সে যে সামাজিক ব্যবস্থায় কাজকর্ম করে, তার বিকাশ স্তর দ্বারা এবং সে যে সামাজিক আন্দোলনের অংশগ্রাহীতে

পরিণত হয়, তার আত্মিক-ব্যবহারিক গুরুত্ব দ্বারা। ব্যক্তিত্বের সামাজিক পরিপক্বতা মাপা হয় সেইসব কাজকর্মের আয়তন দ্বারা, সে যেগুলির মীমাংসা করে। ব্যক্তিত্ব তত বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হয়, যত বেশি হারে তা কল্পনায় প্রকাশলাভ করে এবং কাজকর্মে বাস্তবায়িত করে যৌথ তথা সবার কাজ।

৯। হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ

ঈশ্বর প্রদত্ত মনীষা, বিজ্ঞতা ও প্রতিভার আলফা-বিটা রূপে বহুকাল ধরে গণ্য করা হয় ইন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষমতাকে। ইন্দ্রিয় অনুভূতি — এ হল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভের ক্ষমতা এবং যুক্তির 'চোখে' দেখার — বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা। ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা অর্জন করার অর্থ পূর্বানুভূতি, আন্দাজ করা, আঁচ করা, পরিপক্ব দৃষ্টিপাত করা। লোকে ঠিক এভাবেই বলে : আমার মনে একটা ধারণার উদয় হয়েছে, আমার 'মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে'। ইন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে সাধারণত জড়িত করা হয় 'সারবস্তুতে অনুপ্রবেশের', সরলতার, সামঞ্জস্যের, লালিত্যের, নান্দনিক 'বোধের' ধারণাকে। যেমন, বানর-মানুষ অস্তিত্বের তাত্ত্বিক পূর্বাভাস দিয়েছিলেন হেকেল (জাভা দ্বীপে দুবুয়া কর্তৃক তা আবিষ্কারের বহুকাল আগে), নৃবিদ ব্লেক জোউকোউদিয়ানে (পিকিং-এর কাছে) খুঁজে পাওয়া একটি দাঁতের ভিত্তিতে এ

সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটা হল মানুষের পূর্বপুরুষ সিনানথ্রোপের সম্পত্তি।

ইন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে এ ধারণা চালু আছে যে, তা 'দানবীয়' শক্তির অধিকারী, তা যোগায় প্রেরণা, সৃজনমূলক অগ্রগতি, সুন্দরের অনুভূতি, আনন্দবোধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ. নীৎশে ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে অভিহিত করেন প্রেরণার অবস্থা রূপে। তবে ইন্দ্রিয় অনুভূতির যথার্থ, পার্থিব ভিত্তি আছে, শেষ পর্যন্ত যা অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ইন্দ্রিয় অনুভূতির আকস্মিকতা এক মনগড়া ব্যাপার, তার আড়ালে লুক্কায়িত চেতনার সুপ্ত কর্ম। যেহেতু যেকোন সমস্যা সমাধানের আগে থাকে সুদীর্ঘ ও পরিশ্রমী কাজ, তথ্য সঞ্চয় ও তা নিয়ে কাজ করা, তথাকথিত 'ডিমে তা দেওয়া'। তবে মানুষের কাছে মনে হয় এ সিদ্ধান্ত এসেছে দুম-করে, এ হল 'আলোকপাত', 'চিন্তাধারার অগ্রগতি', 'অন্তর্দৃষ্টি'। ইন্দ্রিয় অনুভূতির এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন গণিতজ্ঞ আ. পোয়াঁকারে: 'এখানে সর্বাগ্রে যা অভিভূত করে, তা হল হঠাৎ আলোর ঝলকানি, যা হল আগেকার সুদীর্ঘ অচেতন কাজের লক্ষণ...। তা (ইন্দ্রিয় অনুভূতি) সম্ভব, অন্তত পক্ষে তা ফলপ্রসূ শুধু তখনই, যখন, একদিকে, তার আগে থাকে, আর অন্যদিকে, তার পরে থাকে সচেতন কাজের এক পর্যায়।'* তবে অনেক

* পোয়াঁকারে আ.। গাণিতিক সৃজনকর্ম, ইউরিয়েভ, ১০৯। পৃঃ ১৪-১৫।

বিজ্ঞানীরই বিশ্বাস ছিল যে, কোন কাজ বা ধারণার সিদ্ধান্তটি তার কাছে হঠাৎ এসেছে। যেমন চার্লস ডারউইন বলেছেন, ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা প্রসঙ্গে' বইটি পড়ার সময় প্রকৃতিতে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের প্রশ্নটি প্রণয়নের ধারণা তাঁর মাথায় এসেছিল। তর্কাতীত যে, ইন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাপারে প্রতিভা বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের নানা ক্ষমতার উপর, সংমিশ্রণ, সংশ্লেষণ, বিমূর্তকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ইত্যাদির ব্যাপারে তার দক্ষতার উপর।

সৃজনকর্মে মাঝেসাঝে 'ইউরেকাজনিত' ভূমিকা পালন করে নিদ্রাও যাতে ব্যক্তিত্বের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে অচেতন পর্যায়ে। নিদ্রায় আবিষ্কারের ঘটনা বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ইতিহাসে কম জানা নেই। কোন এক সমস্যার সিদ্ধান্তে 'ভারগ্রস্ত' ব্যক্তিত্ব মনে মনে সিদ্ধান্তের অসংখ্য রকমফেরের কথা 'ঘুরে-ফিরে' চিন্তা করে। নিদ্রাতেও উত্তেজনা লাঘব না করে এইসব প্রক্রিয়া মনের সুগভীর ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। মানুষের সক্রিয় চিন্তাকর্ম নিদ্রায় স্তব্ধ হলেও তা পুরোপুরি থামায় না। কাজ মানুষকে এতই গ্রাস করে যে, অবসর কালেও তা চলে। ঠিক সে কারণেই মানুষ নিদ্রাকালে তা 'দেখে', যে সিদ্ধান্ত সে খুঁজে ফিরছে। মৌলিক পদার্থের পর্যায় সারণীর গঠন নীতি স্বপ্নে দেখার পর মেন্দেলিয়েভকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, কীভাবে এই আবিষ্কার ঘটেছিল, তিনি উত্তরে বলেন : 'হ্যাঁ, আমি এ নিয়ে কাজ করেছি ৩০ বছর।'

মানুষ — 'জৈবিক বস্তুর' জগতে এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার আত্মিক জগৎ, 'অনুজগৎ' অফুরন্ত, যাতে এক ধারায় মিলিত হয়েছে মুক্তি ও অনুভূতি, নানা চাহিদা ও আদর্শ, নৈতিকতা ও আবেগ। মানুষ শুধু খাবার জন্যেই বেঁচে নেই। ক্রিয়াকলাপের বিশেষ ধরন হল ব্যক্তিত্বের 'আত্মিক জীবন', যা জড়িত তার জীবনের নানা লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে। এই ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হয় তার নানা চাহিদা, আগ্রহ, ইচ্ছা, উন্মুক্ত হয় নানা ক্ষমতা, প্রকাশ ঘটে নানা নৈতিক গুণের, তার সামাজিক সক্রিয়তার।

৪। আদর্শ নয়, বরং প্রকৃত অগ্রগতি

১। আগে থেকে নির্ধারিত পরিসর ছাড়া

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, ব্যক্তিত্ব হল সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের ফল, এ এক সামাজিক ব্যাপার ; জানি যে, জগতের সঙ্গে সক্রিয় পারস্পরিক ক্রিয়া করে ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে নিজস্ব বিশ্ববীক্ষার উপর, কাজকর্মে নিজস্ব দাবিদাওয়ার বাস্তবায়ন ঘটায়, ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়, স্মৃতিকে ক্ষুরধার করে ও কল্পনার সমৃদ্ধি ঘটায়। তবে আমরা এও জানি, বিশ্ববীক্ষা নিজ থেকে বেড়ে ওঠে না, ক্ষমতার প্রয়োজন হল বিকাশ ঘটানোর, স্মৃতির—প্রশিক্ষণের। দেবরাজ জিউস-এর মস্তিষ্ক থেকে এথেন্স দেখা দেবার মতো ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় না, কাজকর্মে তার জন্ম হয়, গঠিত হয় সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত বিকাশ প্রক্রিয়ায়।

ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক যুগ তার নিজস্ব নানা উপকরণ, নিজস্ব 'প্রেসক্রিপসন' পেশ করে। শ. মঁতেস্ক্য যেমনটি লিখেছেন, 'শিক্ষাদানের নিয়মাবলী — এ হল প্রথম নিয়মাবলী, নিজ জীবনে যার সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে।'* ঐতিহাসিক বিকাশের সাধারণ মান অনুযায়ী শিক্ষার বিকাশ মান ও তার উল্টো ব্যাপার বিচার করা যায়: শিক্ষা বিকাশের মান অনুযায়ী — সমাজের সংস্কৃতি বিকাশের সাধারণ মান।

তবে ব্যক্তির শিক্ষাদানের নানা পথ সম্বন্ধে বলার আগে ব্যাখ্যা করা দরকার, কেমন ব্যক্তিত্বের আমরা সংজ্ঞা দিতে চাই? ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক চিন্তাবীরের এক আদর্শ আছে। সব যুগেই চিন্তাবীররা ব্যক্তিত্বের আদর্শ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'সামঞ্জস্য', 'বহুমুখিতা', 'পরিপূর্ণতা' ধারণাগুলি ব্যবহার করেছেন। তবে এই ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ভাবে, সময় সময় বিপরীত ধরনের সারার্থ সহ। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ — মানুষ সম্বন্ধে, তার সারবস্তু, প্রকৃতিতে ও সমাজে তার স্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাদির প্রত্যক্ষ পূর্বানুবর্তন। তাই মধ্যযুগীয় সমাজের চিন্তাবীরদের কাজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি আমরা খুঁজে পাই সেইসব 'পরিপূর্ণতার' সুদীর্ঘ তালিকা, 'পরিপূর্ণ' মানুষের

---

* শ. মঁতেস্ক্য। নির্বাচিত রচনাবলী, মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ১৮৭।

যেগুলি থাকা উচিত। মুসলিম চিন্তাবীর ফারাবি যেমন তাঁর 'সজ্জন শহরের বাসিন্দাদের নানা দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা' গ্রন্থ অনুযায়ী মনে করেন, শাসনকর্তা হতে পারেন শুধু সেই আদর্শ মানুষ, যিনি না-কম, না-বেশি, মোট বারোটি গুণের অধিকারী : ভোজনের ব্যাপারে সংযম, দূরদর্শী, ন্যায়সঙ্গতার প্রতি প্রেম, জ্ঞানের ব্যাপারে ঝোঁক, সুসম্পূর্ণ স্মৃতি, ইত্যাদি। আমাদের যদি মনে থাকে যে, মধ্যযুগীয় সমাজে মানুষ সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থায় কঠোরভাবে নির্দিষ্ট জায়গার অধিকারী ছিল, তাহলে প্রত্যেক সামাজিক গ্রুপের আদর্শ সঠিকভাবে বর্ণনা করার ইচ্ছাকে বোঝা সম্ভব হয়। অন্য এক ব্যাপারও পরিষ্কার : মধ্যযুগীয় 'সম্প্রদায়ভিত্তিক' সমাজের পক্ষে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের একক আদর্শ বলে কিছু নেই। এর ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই সে কালের চিন্তাবীরদের কাজে। ইবন-রুশদের উক্তি অনুযায়ী, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যদি এই সব সদ্‌গুণ অর্জনের সুযোগ থাকত, এবং সেই একই সময়ে প্রত্যেক মানুষ যদি সেগুলি পেতে বাধ্য থাকত, তাহলে সে হত যেমন যে সেবা করছে, সে এবং যার সেবা করছে, সে, এবং যে শাসন করছে, সে ও যাকে শাসন করা হচ্ছে, সে, আর প্রকৃতও, এভাবে, কোন এক বৃথা কাজ সুসম্পন্ন করত।'*

* Averroes' Commentary on Plato's 'Republic'. Ed By E.I.G Rosental, Cambridge, 1956,p.112-113.

মধ্যযুগ যদিও আজ অতীতের গর্ভে বিলীন, তাও কিন্তু এ ভাবা উচিত নয় যে, তারই সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ মানুষের স্বকীয় এই ভাবমূর্তির মৃত্যু ঘটেছে। আধুনিক যুগ বুঝি-বা নতুন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মানুষের আদর্শের সেইসব বিভিন্ন রকমফেরের পুনর্বিবেচনা করছে ও বাস্তবে সেগুলি নিয়ে 'খেলছে', যেগুলি উত্থাপন করেছিলেন অতীতের চিন্তাবীররা। ভাবীকালের সমাজের স্রষ্টা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের কী কী গুণ থাকা উচিত ?

মনে হয় সেইসব আরব চিন্তাবীরদের আইডিয়ায় যুক্তির পরশ ছিল, যাঁরা মানুষকে তার জায়গা সঠিকভাবে নির্দেশ করেছিলেন, যার মূলকথা ছিল আলাদা আলাদা ব্যক্তি বিশেষের জন্য সুনির্দিষ্ট ধরনের ক্রিয়াকলাপ। সুবিদিত যে, 'ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিসকে ধরা উচিত নয়।' সেই ১৯শ শতাব্দীতেই জার্মান শিক্ষাবিদ আ. ডিস্টেরবেয়ার মনে করতেন যে, সার্বিক সামঞ্জস্যের উপাদান হয়ে ওঠার জন্য নিজের মধ্যে মানুষের যেকোন একটি গুণ বিকাশই যথেষ্ট হয়। 'গোটা মানবজাতির প্রতি সম্পর্কের বিচারে প্রত্যেক আলাদা মানুষ হল একমুখী এবং একমুখী বিকাশের জন্য নির্ধারিত। যদি তার মধ্যে প্রকৃতি প্রদত্ত সুবিদিত ঝোঁককে প্রাধান্য দিয়ে বিকাশ ঘটানো যায়, তাহলে তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে : সে সুখী হবে ও অন্যদের সুখী করবে। আর প্রত্যেকে যদি এক ধরনের

পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে, তাহলে গোটা মানবসমাজ গড়ে তুলবে এক সামঞ্জস্য, পরিপূর্ণ একতা।'* বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিকাশের অনেক আধুনিক ভক্ত সানন্দে এই উক্তির নিচে স্বাক্ষর দেবেন। প্রতিভাধর অপেশাদার লোকেদের দিনকাল চলে গেছে, তাঁরা বলবেন, এখন আমাদের আদর্শ হল সেই মানুষ, যে কিনা সেই কাজ পুরো রপ্ত করবে, যার উদ্দেশে সে তার জীবন উৎসর্গ করেছে, অর্থাৎ পেশাদার লোক।

তবে গতিশীল বিংশ শতাব্দী শুধু নানা ধারণা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয় না, এক-দুই প্রজন্মের জীবনের সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে হাতে-কলমে সে সেগুলি যাচাই করতেও সক্ষম হয়। 'পেশাদার' লোকেরাই অ্যাটম বোমা তৈরি করেছিল, এই পেশাদাররাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মৃত্যু শিবিরগুলিতে মানুষ মারার অতি সূক্ষ্ম ও যথেস্ট যুক্তিসিদ্ধ উপায় আবিষ্কার করেছিল, পেশাদাররাই তৈরি করেছিল ন্যাপাম, প্লাস্টিক বোমা, 'নক্ষত্র যুদ্ধ' প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত আছে এই পেশাদাররাই। এই ধরনের একমুখিনতা, আংশিকতা — যা একেবারে সুসম্পূর্ণতায় পৌঁছেছে — যমদূতের অনুরূপ শুধু সমাজের পক্ষেই নয়, বরং খোদ মানুষের পক্ষেও।

বিচ্ছিন্নভাবে শুধু 'নিজের জায়গায় থাকা' এবং

---

* নান্দনিক শিক্ষার ধারণাবলী। খঃ ২, মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৪৯।

অন্য আর কোন জায়গায় নয় — এমন মানুষের অস্তিত্বের চরম নাটকীয়তা মনস্তাত্ত্বিক রহস্য কাহিনীর এক স্বকীয় ধরনে দেখিয়েছেন ইংরেজ লেখক জি.কে. চেস্টারটন। লোকেদের নানা সম্ভাবনা ও ক্ষমতা মূল্যায়নের ব্যাপারে সুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কারক ও বিশ্বপ্রেমী উওরেন উইণ্ডের এক বিরল গুণ ছিল। মনে হত, সুখমগ্ন মানবজাতি বুঝি-বা তাঁর প্রতি শুধু কৃতজ্ঞই ছিল। অথচ... হঠাৎ একদিন তাঁকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল। দেখা গেল যে, তাঁর হত্যাকারীদের এই অপরাধের জন্য মাত্র একটি কারণ ছিল : বহুকাল আগে এই সজ্জন ব্যক্তি তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, এক দৃষ্টিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য 'আন্দাজ' করেন, এইভাবেই তিনি চিরকালের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেন, অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত অসংখ্য বহুরূপী সম্ভাবনাকে তিনি দেখতেও পান নি।*

কোন একটি ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে, বহুরূপী মানবিক সম্পর্ক, বহুরূপী ধরনের কাজকর্মের অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির উৎসাহও খোয়াতে পারে। স্মৃতি ও কল্পনা, আবেগ ও মনোবলের সাহায্যে মানুষের মধ্যে যে জটিল কাজকর্ম চলে, তার জন্য দরকার হয় সুবিশাল

* দ্রষ্টব্য : 'অর্ধচন্দ্রের ভেল্কিবাজি'। চেস্টেরটন জি. কে। ছোটগল্প, মস্কো, চিরায়ত সাহিত্য, ১৯৮০।

বহুরূপী জ্ঞানের, প্রতিষ্ঠিত নানা দৃষ্টিভঙ্গির, গণ্ডি ছেড়ে বাইরে বেরনোর, মানুষের ক্রিয়াকলাপের একেবারে ভিন্ন ক্ষেত্রে নজরদানের। বিজ্ঞানীর সাফল্য যত বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন, তাঁর ধারণাগুলি যত বেশি সাহসী ও বৈপ্লবিক, তাঁর আগ্রহের জগৎও তত বেশি ছড়ানো ও বহুরূপী। ১৯শ শতাব্দীর অপূর্ব পদার্থবিদ ল. বোলৎসমানের বাইরের আপাত-বিরোধী এই উক্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর অর্থ : 'আমি যা হয়েছি, তিনি লিখেছেন, — তারজন্য আমি শিলারের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি বিনা আমি আমার মতোই দাড়ি ও নাকওয়ালা এক মানুষ হতাম বটে, তবে তা এই আমি নয়...। আমার ওপর এমনই প্রভাব ফেলা অন্য ব্যক্তি হলেন বিঠোফেন।'*

তাহলে কি একমুখী সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আদর্শের জায়গায় যেকোন ধরনের কাজে সমান পারদর্শী মানুষের আদর্শকে বসানো দরকার? অবশ্যই, কৃষি ও শিল্প, মানসিক ও দৈহিক শ্রমের ব্যাপারে যে শ্রম বিভাজন ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, তা এমন মানুষ সম্বন্ধে স্বপ্ন রচনা করে, যে কিনা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা বাধা অতিক্রম করবে। তবে প্রগতির পথ ধরে মানবজাতি যত আগে এগোচ্ছে, শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপও ততই জটিল ও

---

* ল. বোলৎসমান। প্রবন্ধ ও ভাষণ। মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ২৮৩ (রুশ সংস্করণ)।

আলাদা-আলাদা হয়ে উঠছে। অপেশাদারদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় সমান পারদর্শী লোকেদের দিনকাল চলে যাচ্ছে। আজই এটা পরিষ্কার যে, ভাবীকালের তেমন মানুষ সম্বন্ধে অতি সরল স্বপ্ন — যেকোন ধরনের কাজকর্ম করার ব্যাপারে যার থাকবে প্রায় সুপারম্যানজনিত ক্ষমতা — এক স্বাধীন, নিজের নানা ঝোঁক ও চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্বাচন ক্ষেত্রে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের অবজেকটিভ চাহিদার প্রতিফলনস্বরূপ। পৃথিবীতে অমানবিক পরাক্রম অর্জনের জন্য দানবের কাছে প্রাণ বিক্রির রূপকথাটি সবার কাছেই সুবিদিত। এটি হল 'স্বাভাবিক পথে' এমন 'সুপার জ্ঞান' ও 'সুপার দক্ষতা' অর্জন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়তার প্রতীক। সোভিয়েত লেখক ভ. অরলোভের 'বেহালাবাদক দানিলভ' উপন্যাসে 'দানবকে প্রাণ বিক্রির' বিষয়বস্তুর বুঝি-বা 'উল্টো চিত্র' দেওয়া হয়েছে। কোন এক সঙ্গীতকার — যিনি কিনা দানবীয়, সুপারম্যানজনিত ক্ষমতার অধিকারী, প্রকৃতপক্ষে যিনি হলেন সুপারম্যান — এ সবকিছুই পরিত্যাগ করছেন পরিপূর্ণতাসাধনের যথার্থ মানবিক ক্ষমতার তথা নিরলস শ্রম, ভালবাসা, আত্মোৎসর্গের খাতিরে এবং তদ্দ্বারাই তিনি মানবিক প্রাণ লাভ করেছেন।

যেকোন ধরনের কাজে সমান পারদর্শী সুসম্পূর্ণ মানুষের বিমূর্ত আদর্শ আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাকে গ্রহণ করে বর্তমানের অসম্পূর্ণ মানুষ ও ভবিষ্যতের সুসম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে আমাদের

এক কঠোর সীমারেখা টানা উচিত। বর্তমানের সামঞ্জস্যহীন, নিজেদের একমুখিনতার বিচারে বিকৃত লোকেদের উপর সেই পিলারের ভূমিকা দেওয়া হয়, যার উপর রয়েছে ভাবীকালের ভবনের ভার, যেখানে বাস করবে অন্যরা, সুসম্পূর্ণ, বহুমুখী লোকেরা।

সে ক্ষেত্রে তাহলে কি পুরনো শ্রম-বিভাজনের ছাপ-মারা অসম্পূর্ণ, বৈপরীত্যে-ভরা, একমুখী লোকজন সহ সমাজের এমন অবস্থা অর্জন করা যাবে? অথচ ঠিক এরাই, বিপরীত্যে-ভরা, ভুলভ্রান্তি-করতে-সক্ষম 'বর্তমানের লোকেরাই' ভাবীকালের উজ্জ্বল ভবনটি তৈরি করছে।

মার্কসবাদের কাছে এ দুই-ই সমান হারে অজানা : যেমন, বর্তমানের জীবন্ত মানুষ এবং তার কেমন হওয়া উচিত, মানুষের এ দুই ভাবমূর্তির মধ্যে ফারাক, তেমনই, বর্তমান মানুষের সব অসঙ্গতির দোষক্ষালন করে সুসম্পূর্ণ মানুষের আদর্শকে ছোট করা। সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের যেসব ভাবমূর্তি আমরা বিবেচনা করেছি, তাকে আমরা ব্যক্তিত্বের **সুস্থির** আদর্শ রূপে অভিহিত করতে পারি। সুসম্পূর্ণ মানুষকে বিবেচনা করা হয় কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট গুণ, দক্ষতার সুস্থায়ী সংমিশ্রণ রূপে। এমন সম্পূর্ণতা অর্জনকারী মানুষের আরও বেশি সম্পূর্ণতা লাভের কোন প্রয়োজন নেই। সে তার সীমারেখায় উপস্থিত হয়েছে এবং আরও বিকাশ ঘটাতে পারে শুধু 'পরিমাণের' বিচারে অর্থাৎ শিক্ষার অর্জিত মান,

নিজ নৈপুণ্য ধরে রাখতে পারে। ব্যক্তিত্বের মার্কসীয় মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন 'সম্পূর্ণতা' অগ্রহণীয়। যে-ব্যক্তিত্ব আরও অগ্রগতির ব্যাপারে প্রচেষ্টাহীন। নিজস্ব সাফল্যাদির আত্মসুখীর চেতনায় এসে থেকে গেছে, তাকে সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব রূপে অভিহিত করা চলে না।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পক্ষে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বিকাশের চরম লক্ষ্য নয়। মার্কসবাদে ব্যক্তিত্বের আদর্শ **গতিশীল** চরিত্রাধিকারী, তা অর্জিত হয় বিকাশের পরে নয়, বরং খোদ বিকাশে। বিকাশের এমন সীমারেখা ব্যক্তিত্বের কাছে অজানা, যার পরে কিনা দেখা দেবে পরম শান্তি, তার অবস্থান প্রতিষ্ঠার পরম গতিশীলতায়।

সুসম্পূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষের আদর্শ — আমাদের সমসাময়িক পরস্পর-বিরোধী, সন্দেহপ্রবণ, কোনক্রমেই আদর্শ নয়, এমন মানুষের কল্পিত স্বপ্ন নয়। তাদের কাজকর্মে এই আদর্শ কম-বেশি হারে রূপলাভ করে। লেভ তলস্তয়ের দ্বিধাবোধকারী নায়করা, সোভিয়েত লেখক মিখাইল শলোখভের 'ধীরে বহে দন' উপন্যাসের বিষাদজনক চরিত্র গ্রিগোরি মেলিখভ সেই সবে দক্ষ অতি সরল চরিত্রের চেয়ে, কখনই ভুল-না-করা লোকের চেয়ে — যাকে মানুষ সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণা বলে মাঝেসাঝে গ্রহণ করা হয় — ভবিষ্যতের মানুষের অনেক ঘনিষ্ঠ।

ব্যক্তিত্বের আদর্শের ব্যাপারে মার্কসীয় পন্থার সারকথাটি সুগভীরভাবে বোঝার জন্য স্মরণ করব

যে, মার্কসবাদে মানুষের সারবস্তু নির্ধারিত হয় সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টি রূপে। তবে নানা সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিসৃত হয়, তার আত্মিক জগতে প্রতিফলিত হয়। আর খোদ সমাজেও অসংখ্য পরস্পর-বিরোধী ও রক্ষণশীল প্রবণতা রয়েছে।

ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে বাস্তবতা, সামাজিক সম্পর্কের সম্পদ শুষে নিয়ে, সমাজকে শুধু তার উপস্থিত অবস্থা দ্বারাই অধিকার করে নয়, বরং তার বিকাশ প্রবণতাকে ধরেও, তা হল গতিশীলভাবে সুসম্পূর্ণ অথবা 'সম্পদশালী' এক ব্যক্তিত্ব। এখানে কোন্ সম্পদের কথা বলা হচ্ছে? '...নানা ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা, ক্ষমতা, চাহিদার উপকরণ, উৎপাদনী শক্তি, ইত্যাদির বিশ্বজনীনতা ছাড়া অন্য আর কিছু কি সম্পদ হতে পারে...? মানুষের সৃজন প্রতিভার পরম প্রকাশ ছাড়া অন্য আর কিছু কি সম্পদ হতে পারে...।'*

অন্যকথায়, 'সমৃদ্ধ' ব্যক্তিত্বের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল মানুষের বংশগত সারবস্তু ও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক অস্তিত্বের মিলের প্রতি প্রবণতা। এমন ব্যক্তিত্ব বোঝে যে, সমাজের নানা অবজেকটিভ চাহিদা, তার ক্রমিক বিকাশের সম্ভাবনা তার নিজস্ব নানা চাহিদা ও

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪৬, অঃ ৩, পৃঃ ৪৭৬ (রুশ সংস্করণ)।

সম্ভাবনার অনুরূপ। 'সমৃদ্ধ' ব্যক্তিত্ব তার বর্তমান সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা ও নিজের প্রকৃতই অসীম নানা সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে ; নিজের অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করার ব্যাপারে সে সদা প্রচেষ্ট। এর থেকেই বলা চলে, 'সমৃদ্ধ' ব্যক্তিত্ব — এ হল **বিকাশমান,** আত্মসম্পূর্ণতার ব্যাপারে প্রচেষ্ট, নিজের জীবনের বর্তমান নিয়মকানুনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। সমৃদ্ধ মানুষ, মার্কসের উক্তি অনুযায়ী, এ হল সেই 'মানুষ, যার **প্রয়োজন** হল পরিপূর্ণভাবে জীবনের মানবিক প্রকাশ ঘটানো, সেই মানুষ, যার মধ্যে তার নিজস্ব রূপায়নের আত্মপ্রকাশ ঘটে অন্তরের প্রয়োজনীয়তা, **চাহিদা** রূপে।' সুতরাং আজকের দিনের 'অসম্পূর্ণ' মানুষ ও ভবিষ্যতের মানুষের মধ্যে কোন কঠোর সীমারেখা নেই। অবশ্যই, আমাদের যুগে সবে-জন্মানো মানুষের থেকে ভবিষ্যতের মানুষের পার্থক্য থাকবে যেমন জ্ঞানের আয়তন, তেমনই দৈহিক পরিপূর্ণতা হারের বিচারে। তবে তার মধ্যে সদা হাজির থাকবে নিজের নানা ক্ষমতার বিকাশ, সম্পূর্ণতাসাধনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা, অনুসন্ধানের ব্যাপারে সৃজনজনিত তৃষ্ণা, বর্তমান অবস্থায় তার অসম্পূর্ণতা ও বিকাশের অসীম সম্ভাবনার ব্যাপারে চেতনা।

পরিশেষে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব শুধু নিজস্ব অসম্পূর্ণতাই নয় বরং সেইসব সামাজিক সম্পর্কের অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করার চেষ্টা চালায়, যেগুলি হল তার নিজস্ব গঠনের অবজেকটিভ ভিত্তিস্বরূপ। তাই এ

হল অতি অবশ্যই কর্মতৎপর, **সামাজিকভাবে সক্রিয়** এক ব্যক্তিত্ব। সামাজিকভাবে সক্রিয় এমন ব্যক্তিত্বের — যে নিত্য নিজের সম্পূর্ণতাসাধন করে, নিজ জীবনযাত্রার অবজেকটিভ পরিস্থিতিগুলির পরিবর্তন ঘটায় — অস্তিত্ব আছে এই আমাদের যুগেও, অতীতেও তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিল। সুউন্নত নানা সামাজিক প্রবণতার ধারক-বাহক অতীতের অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীদের অস্তিত্ব কি ছিল না, অন্তর্জগতের সম্পদ দ্বারা, আত্মিক জীবনের প্রখরতার দ্বারা তাঁরা কি চোখে পড়তেন না? প্রত্যেক যুগ নিজের নানা নায়ক, বিপ্লবী ও চিন্তাবীর হাজির করে, যাদেরকেও নিজেদের সময়ের পক্ষে 'নতুন লোক' বলে অভিহিত করা চলে, হতে পারে যে, তারা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষের প্রতিরূপ। সুতরাং মার্কসবাদের কাছে সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হল **ঐতিহাসিক** ব্যাপার।

স্বভাবতই, আরও একটি স্বতঃসিদ্ধান্ত দেখা দেয়: যেহেতু সুসমঞ্জস মানুষ আমাদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব হতে পারে, তাই সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠন — কমিউনিস্ট সমাজ বিকাশের শুধু মুখ্য লক্ষ্যই নয়, বরং তার বিকাশ ও সম্পূর্ণতাসাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক শর্ত। 'অসম্পূর্ণ সমাজ — অসম্পূর্ণ মানুষ' এবং 'সুসম্পূর্ণ সমাজ — সুসম্পূর্ণ মানুষ' — এই সরলীকৃত ছক মার্কসবাদের কাছে অগ্রহণীয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের এক *চেতনালব্ধ-পরিকল্পনাভিত্তিক চরিত্র* আছে, এর জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন শক্তির সুমহান প্রয়াসের আর এমনকি জেনে-শুনে আত্ম

বলিদানের। সমাজতন্ত্র গঠন করা সম্ভব শুধু সবার কাজে পুরোপুরি নিবেদিত-প্রাণ লোকজন দ্বারা, যাঁরা বেঁচে আছেন শুধু অতীতের নয়, বরং আগামী দিনের কথা ভেবে।

নতুন মানুষ সবে গড়ে উঠছে, তার বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা এক ব্যক্তিত্বে সংগৃহীত, সঞ্চিত হয় না। সময় সময় সেগুলি 'ছড়ানো-ছিটানো', বিভিন্ন লোকের মধ্যে হাজির, যাঁরা সামগ্রিকভাবে, যৌথভাবেই বিপুল পরিসরের সামাজিক কাজকর্ম বাস্তবায়িত করছেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কমিউনিজমের ভাবাদর্শ সত্যি সত্যিই বিপুল পরিসরের, তা কোন এক ব্যক্তিত্বের পক্ষে প্রকাণ্ড। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, এমনকি অন্তর্জগতর বৈপরীত্য সত্ত্বেও, তার মধ্যে হাজির আত্ম-অসন্তুষ্টি, প্রখর অন্তর্জীবন, সুগভীর দার্শনিক তাৎপর্যসম্পন্ন সমস্যাগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার মতো ভেবে চিন্তাভাবনা করা, কাজকর্ম করার ইচ্ছা। 'সমৃদ্ধ' ব্যক্তিত্ব গঠন — আগামী দিনের নয়, বরং আজকের আশু কর্তব্য। সোভিয়েত সমাজের জীবনের সব দিকের পুনর্গঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তেমন সব ব্যক্তিত্বের, যাঁরা সমাজের আজকের বিকাশ মানকে ডিঙিয়ে যেতে, আগামী দিনে উঁকি দিতে সক্ষম, তার কাছাকাছি আসার অতি সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজতে পারেন, বলতে পারেন, 'সময় এসেছে, আগে চল'!

অবশ্যই, এমন ব্যক্তিত্ব নানান বাধ্যতামূলক দক্ষতার,

আচরণ নমুনার, 'গুণাগুণের' সমষ্টি নয়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, সুসম্পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞা কি খুবই ভাসা-ভাসা, সাময়িক নয়? সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব যেসব 'সম্পদের' অধিকারী, তার এক তালিকা আমরা তৈরি করতে না পারলেও তার সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু আমরা বলতে পারি। এমন ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্পদ — তার বিশ্ববীক্ষা। বিশ্বের প্রতি সম্পর্ক থেকেই বেড়ে ওঠে মানুষের নানা লক্ষ্য, নিজস্ব নানা সম্ভাবনার ব্যাপারে, ভাল ও মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দরের ব্যাপারে ধারণা। তবে আমরা ইতিমধ্যেই জানি, বিশ্ববীক্ষা — জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় আচরণবিধির এক সমষ্টি নয়, বরং সেইসব নীতির এক ব্যবস্থা, যেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম ও মূল্যায়ন করে, আর শুধু তারপরই সেগুলির ভিত্তিতে নিজের জীবনকর্ম গড়ে তোলে। বিশ্ববীক্ষার নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সাধারণ হতে পারে, তবে সেগুলি রূপলাভ করে প্রত্যেক আলাদা মানুষের জীবন শৈলীতে, আচার-আচরণে বিভিন্নভাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমন এক বিশ্ববীক্ষাজনিত নীতি তথা জগতের প্রতি কর্ম-তৎপর, সক্রিয় সম্পর্কের নীতিটির কথা ধরা যাক। একজনের পক্ষে এ নীতি রূপায়িত হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রবল আকাঙ্খা দ্বারা, অন্যজন সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন শিক্ষার সেবায়, তৃতীয়জন — সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। একজনের পক্ষে পারিপার্শ্বিক জগতের

প্রতি সক্রিয় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে নিজের জীবনযাত্রার পুনর্গঠন, নিজ শ্রমদলের জীবন রদবদলের দ্বারা। অন্যজনের ধারণায় — সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের উচিত কর্ম-তৎপর সম্পর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া। যে-বিশ্ববীক্ষার মূলে রয়েছে মার্কসীয় দর্শন, তা মানুষকে এক জাতীয় আচরণে বেঁধে ফেলে না, আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগৎকে এক এবং একক নমুনার খসড়া করে তোলে না।

সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব — ভাবীকলের মানুষের প্রোটোটাইপ — সর্বদা **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন**। পোলিশ লেখক স্ত. লেমের বৈজ্ঞানিক-অলীক কল্পনার গল্প সিরিজের নায়ক ইয়ন তিখি নিজ রচয়িতার ইচ্ছাবলে একদা এক গ্রহে গিয়ে হাজির হয়, যেখানে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এক যাচ্ছেতাই ধারণা কায়েম হয়েছিল, যেমন, তা নাকি পারস্পরিক-বদলের পুরোপুরি ব্যক্তিসত্তাহীন ব্যক্তি বিশেষের সমাজ, যেখানে যৌথপ্রথার আদিম ধারণার স্বার্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাকে পুরো খতম করা হয়েছে। এই সমাজের সদস্যদের মতে, সব সামাজিক দুর্দশার উৎসস্থল — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা। এ হল ষোলআনা সামাজিক পারস্পরিক-বদলের সমাজ, ‘পেরেক’ মানুষের সমাজ, যেখানে সবচেয়ে গুরুভার দণ্ড — মানুষের উপর ‘জীবন-ভর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বোঝা’ চাপানো। এই সমাজের সদস্যরা প্রতিদিন নিজেদের সামাজিক, পেশাগত, পারিবারিক দায়িত্ব বদলায়। আজকে — ডাক্তার, আগামীকাল — উদ্যানকর্মী, আজকে — আমলা, কালকে — শ্রমিক, ইত্যাদি। অল্প সময়ে তারা

নিজেদের কাজ ভালভাবে রপ্তও করতে পারে না, তবে গুরুত্বর ক্ষতিও করে উঠতে পারে না, তারা কোন ব্যাপারেই জবাবদিহি করে না, উত্তম কর্মজীবন গড়ার প্রচেষ্টাও তাদের নেই, লাভের আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাও করে না। আর সবই এ কারণে যে, আগামীকাল তারা একেবারেই ভিন্ন কাজ করবে। ব্যক্তিগত বন্ধনও তাদের নেই, যেহেতু তাদের 'পারিবারিক' কাজও বদলায়, এমনকি মৃত্যুও তারা জানে না। 'মৃত্যু কী, তা একবার ভাব, — এই ধরনের 'যৌথপ্রথার' সমর্থক বলছে। — এ হল সেই লোকসান, যা ঘটে বিষাদজনক নিজ অপূরণীয়তার দরুন। যে মরে, সে কাকে হারায়? নিজেকে? না, যেহেতু মৃত-ব্যক্তি — বিদ্যমান কেউ নয়, বরং যে নেই, সে — কিছু হারাতে পারে না।'*

কমিউনিজমের আমলে তার প্রত্যেক সদস্যের স্বাধীন, ব্যক্তিগত বিকাশ হবে সবার স্বাধীন বিকাশের শর্ত — এ মঞ্জুর করা মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা কি কমিউনিস্ট সমাজের এমন চিত্রই এঁকেছিলেন? 'আমাদের রাষ্ট্রের শক্তিশালী যন্ত্রটি যুগের পর যুগ ধরে অস্পৃষ্ট ও অপরিবর্তনীয় রয়ে যায়, — নিজ চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন সামাজিক-পারস্পরিক-বদলানো সমাজের এক ভক্ত, — শৈলের চেয়েও বেশি সুস্থায়ী, আর এই সুস্থায়ী অবস্থার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এ ব্যাপারে যে, চিরকালের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যজনিত

---

* স্ত. লেম। রচনাবলী। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৬, পৃঃ ৩২১ (রুশ সংস্করণ)।

অস্তিত্বের নড়বড়ে প্রকৃতিকে খতম করা হয়েছে।'*
নির্মম বিদ্রূপের সঙ্গে লেম দেখিয়েছেন যে, সার্বিকভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার প্রকাশ-ঘটা ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করার সমাজে বিকাশের অন্তরের প্রেরণাটি উধাও হয়, এ সমাজ এগোয় বদ্ধাবস্থার দিকে। অযথাই সোভিয়েত সমাজে মানবিক হেতুর সক্রিয়করণকে সামাজিক জীবনের সব দিকের পুনর্গঠনের অন্যতম এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রূপে বিবেচনা করা হয় না, আর তা সবই — সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ আরও দ্রুত করার উদ্দেশ্যে।

ভাবীকালের মানুষের প্রোটোটাইপ ধরনের ব্যক্তিত্ব কীভাবে দেখা দেয়, তা গঠনে কী সাহায্য করে? নিম্নলিখিত কোনকিছুই মার্কসবাদীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, যেমন, শুধুমাত্র আত্মশিক্ষার সাহায্যে, 'ভিতর থেকে' ব্যক্তিত্ব গঠন সংক্রান্ত সাবজেকটিভ — ভাববাদী ধারণা। অথবা ব্যক্তি বিশেষের পরাধীনতা, নিজেকে গড়ার প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণে অক্ষমতার আইডিয়া। 'তৃতীয় পথও' তাকে সন্তুষ্ট করে না: সমাজ মানুষকে এক আদর্শ নমুনা দেয়, তার কেমন হওয়া উচিত তা কোন মানুষ এই নমুনা অনুসারে আত্ম-সম্পূর্ণতাসাধন প্রক্রিয়া শুরু করে।

আধুনিক অ-মার্কসীয় দর্শনে এ ভাবধারা অধিক জনপ্রিয় যে, ব্যক্তি বিশেষ এমন নমুনা রপ্ত করে যুক্তির পথে নয়, বরং অচেতনভাবে। ইতিবাচক ভাবমূর্তি ভেঙে খন্ড খন্ড হয় আচরণের, জীবনের

---

* রবার্ট ওয়েন। নির্বাচিত রচনাবলী, খঃ ১, পৃঃ ৩১৯।

অসংখ্য আলাদা আলাদা নমুনায় — নৈতিকতার নানা মাত্রা থেকে শুরু করে নামযশওয়ালা মোটরগাড়ির মার্ক পর্যন্ত। স্পেনের দার্শনিক খ. অর্তেগা-ই-হাসেট তাঁর 'জনতার অভ্যুত্থান' রচনায় সরাসরি বলতে চেয়েছেন যে, চিন্তাভাবনা করতে অক্ষম জনতার অধিকাংশের মধ্যেই হাজির নমুনার অধীনে থাকার প্রচেষ্টা। শিক্ষা রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিত্ব কর্তৃক বুঝিয়ে-বলার, কলকাঠি নাড়ার ব্যাপারে।

মার্কসবাদে ব্যক্তিত্ব শিক্ষার প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হয় ব্যক্তিত্ব ও সমাজের পারস্পরিক-সম্পর্কের মতো অধিকতর সাধারণ সমস্যার এক দিক রূপে। তার মূলকথা হল ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা নানা ভাবধারা। মাত্রা ও নিয়মকানুনের নিষ্ক্রিয় রপ্ত করা নয়, বরং কাজকর্মের প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির সব সম্পদ আহরণ, মানুষের ক্রিয়াকলাপ বহুমুখী। এর মধ্যে আছে প্রকৃতির রহস্য রপ্ত করা, মানুষের অন্তরের গোপনে প্রবেশ করা, অন্য লোকের আনন্দ-বেদনা বোঝা। মানুষ অটলভাবে মানবজাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ আয়ত্তে আনছে, গড়ছে ও ভাঙছে শিখছে, খেলছে, স্বপ্ন দেখছে...।

এবার আসুন মানুষের ক্রিয়াকলাপের মূল ধরনগুলির ব্যাপারে আলোচনা করা যাক্, যাতে মেহনত করে, খেলে, শিল্পকলা উপভোগ করে, জ্ঞানার্জন করে মানুষ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়, নিজের 'বংশগত' সারবস্তু লাভ করে।

২। সবার আগে ছিল কাজ...

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে, মানবজাতি উৎপত্তির ঊষালগ্নে ছিল শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ। ঠিক এই শ্রমেই চেতনা গড়ার কাজ চলে। শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ হল মানুষের নানা ক্ষমতা ও চাহিদা বিকাশের উৎস। যৌথ ক্রিয়াকলাপ রূপে শ্রমেই গড়ে ওঠে নানা নৈতিক গুণ, বিশ্ববীক্ষা, নান্দনিক মর্মপীড়া।

আপনা আপনিই ও প্রশ্ন ওঠে : শ্রম যদি আক্ষরিক অর্থেই মানুষ 'তৈরি করে' থাকে, পশুর রাজত্ব থেকে উদ্ধার করে থাকে, তাহলে অধুনা মনে হয় তা নতুন, সুসম্পূর্ণ মানুষ, ভাবীকালের সমাজ স্রষ্টা তৈরি করতে সাহায্য করবে। বাকি শুধু শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের সেই নির্দিষ্ট ধরনটিই খুঁজে বের করা, সুসম্পূর্ণ গড়ার জন্য যা 'কর্মশালা' হবে।

তাহলে কি তা কারিগর-কুটিরশিল্পীর শ্রম, যার জন্য দরকার হয় কল্পনা, অলীক কল্পনা, শিল্প রুচি, একেবারে নানা ধরনের কর্ম পালনের দক্ষতা? কারিগর উৎপাদিত জিনিসপত্রে রয়েছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার ছাপ, তার সৃষ্টিতে সে উজাড় করে ঢালে নিজের সব জ্ঞান ও নৈপুণ্য, ব্যক্তিত্ব রূপে নিজের পুরো প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু আধুনিক উৎপাদন যে শিল্প উৎপাদন — তাতে একক কুটিরশিল্পীর কোন স্থান নেই। কুটিরশিল্পীর শ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব কি আধুনিক উৎপাদনে যোগ দিতে পারে?

সন্দেহ আছে। পরিশেষে, আধুনিক শিল্পের, সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক সদ্ব্যবহার। কারিগর কিন্তু 'জিনিসপত্র তৈরির' প্রক্রিয়ায় সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা, সুস্থ চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া গোপন নৈপুণ্য কাজে লাগায়। সুতরাং ব্যক্তিগত শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের পরিস্থিতিতে গড়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বের পক্ষে সামাজিক উৎপাদনের পরিস্থিতিতে নিজের অলীক কল্পনা, কল্পনা, অভিজ্ঞতা কাজে লাগান সহজ হবে না।

তাহলে কি সুসম্পূর্ণ মানুষ গড়ার জন্য কৃষিজনিত শ্রমই আবশ্যিক শর্ত? তাতে ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, যার দরুন বিশ্বের সঙ্গে নিজের সংস্পর্শের অনুভূতি লাভ হয়, সুন্দরের অনুভূতি জাগে। তবে এটা গোপন নয় যে, কৃষিজনিত শ্রম — আজও অন্যতম এক অতি গুরুভার ও একঘেয়ে ধরনের শ্রম, এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের অনুভূতি এতে লাভ করে খুব সম্ভবত নগরবাসী, যে এই শ্রম লক্ষ্য করে 'এক পাশ থেকে'।

কারিগরের ও কৃষিজনিত শ্রমের উপর আশা করা যে ইউটোপিয়া, তা পরিষ্কার। তবে বর্তমানে পশ্চিমে এই ইউটোপিয়াকে জীবনে রূপদানের প্রচেষ্টা বিদ্যমান তথাকথিত 'নানা বিকল্প প্রকল্পে'। ছোট ছোট কমিউনে বাস করা, একত্রে শিশুদের শিক্ষাদান, একত্রে মেহনত করা, একত্রে অবসর বিনোদন, নিজ শ্রমের ফলে বসবাস — বিকল্প জীবনযাত্রার

সমর্থকদের এই হল আদর্শ। তবে খোদ জীবনই দেখাচ্ছে, এমন শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপকে, এমন জীবন শৈলীকে প্রভুত্বকারী করে তোলা অসম্ভব ব্যাপার। পশ্চিমে যথার্থ বিদ্যমান কমিউনগুলির বড় অংশকে উৎপাদনী ক্ষেত্র — যেখানে প্রভুত্ব করে আধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদন — রূপে নয়, বরং সার্ভিসিং ক্ষেত্র রূপে গণ্য করা চলে। এ ছাড়াও, এইসব 'প্রকল্পের' অধিকাংশেরই খরচা ওঠে না। টিকে আছে সেগুলির অংশগ্রাহীদের আত্মবলি ও ব্যক্তিগত আয়ের কল্যাণে। যেমন, পশ্চিম জার্মানিতে এইসব 'প্রকল্পের' মাত্র ২৫ শতাংশ অংশগ্রাহী বাস করে সেগুলির খরচায়, বাকি তিন-চতুর্থাংশ — সামাজিক সাহায্যের কল্যাণে। আর নানা ধরনের ফসল ফলানো, সোয়েটার ও টুপি বোনা, বাড়ির যন্ত্রপাতির মেরামত কখনও আধুনিক মানবজাতি বিকাশের পক্ষে বিশ্বজনীন উপায় হতে পারে না, যে-মানবজাতি আজ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজন-সম্ভাবনা, সুউন্নত নান্দনিক রুচি, ইত্যাদির অধিকারী।

এ অবস্থায় আমরা আশা রাখতে পারি শুধু আধুনিক শিল্পজনিত শ্রমের উপরই — তার প্রকাণ্ড পরিসর, বৈজ্ঞানিক সাফল্যাদির ব্যাপক সদ্ব্যবহার, শ্রম বিভাজন, যৌথপ্রথা সহ। শিল্পজনিত শ্রম সামাজিক চরিত্রাধিকারী। শ্রমের সামাজিক চরিত্র ও আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত ধরনের মধ্যকার বৈপরীত্যের মীমাংসা ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র মনে হয় শিল্পজনিত শ্রমকে সেই 'জন্মভূমি' করে তোলে, যার থেকেই

নতুন বহুমুখী সুসমঞ্জস মানুষ বেরিয়ে আসবে। এ শ্রম লোকজনকে এক অখন্ড সত্তায় মিলিত করে, শ্রম মানুষের সব সৃজনশক্তিকে আকর্ষণ করার দাবি জানায়, এ শ্রমের প্রতিটি উপাদান — প্রকান্ড এক অখন্ড সত্তার অংশ। আপনা আপনিই এই সিদ্ধান্ত করা যায় : মানুষের সারবস্তু বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের যোগফল হলে, আর সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলি স্বাধীন, সুউন্নত, বৈজ্ঞানিক-সংগঠিত, সৃজনমূলক শ্রমের পরিস্থিতিতে গড়ে উঠলে, সমাজতন্ত্রের আমলে প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের — শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রাহী — উপর সামাজিক সম্পূর্ণভার প্রতিফলন পড়ে। এই সিদ্ধান্ত করলে আমরা গুরুতর তাত্ত্বিক ভুল করব।

আসুন স্মরণ করি : ব্যক্তিত্ব গঠন প্রক্রিয়া হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যজনিত আকারে মানবিক সারবস্তু **আহরণ** প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে দেখা দেবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানুষের সারবস্তু দেওয়া হয় না। ব্যক্তিত্ব কর্তৃক নানা সামাজিক সম্পর্কের 'আহরণ' ঘটে তার ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ায়। আর ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ হল সেই শ্রম, যাতে যোগ দেয় দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুউন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিক, আর তা কি তাকে 'স্বয়ংক্রিয়ভাবে' সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব করে তোলে? কেননা শ্রমিক *যে-জায়গায় থাকে, সেখান থেকে,* কনভেয়রের পাশে দাঁড়িয়ে ও একঘেয়ে কাজ করে শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলি মোটেই সর্বদা

চোখে পড়ে না। অন্যকথায়, আধুনিক উৎপাদন, শ্রম তার সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞ সহ, সমবায়মূলক শ্রম বিভাজন সহ নতুন মানুষ গড়ার শুধু পটভূমি ছাড়াও এই প্রক্রিয়ার পথে নানা বাধাও সৃষ্টি করে।

আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানুষের সারবস্তুকে তত্ত্বে সাদৃশ্য বলে ভেবে, এটি পুরো উপলব্ধি না করে যে, আধুনিক শ্রম — এ হল চরম খণ্ড-বিখণ্ডিত ক্রিয়াকলাপ, যা তার প্রত্যেক অংশগ্রাহীর সৃজন সম্ভাবনাকে প্রচণ্ডভাবে সীমিত করে, আমরা হাতে-কলমেও ভুল করতে পারি আর তা নতুন মানুষ শিক্ষার ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার উপর বর্তিয়ে। নতুন মানুষ শিক্ষার ব্যাপারে এমন 'ইউটোপীয়' পন্থার সম্ভাবনাটি মার্কস আগে থেকেই দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, আলাদা কোন মানুষের সমসাময়িক সমাজের নানা অর্থনৈতিক যোগাযোগের 'বিশ্বজনীনতা' তখনও তাকে বিশ্বজনীন করে না। কারখানা বিশ্বজনীনতার শুধু প্রয়োজনীয়তাই, 'ব্যক্তি বিশেষের সার্বিক বিকাশের ব্যাপারে' শুধু 'প্রচেষ্টাই' সৃষ্টি করে। সুতরাং একেবারে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সজ্জিত শ্রমও নিজ পেশাগত দায়দায়িত্ব পালনে ভারগ্রস্ত তার সাধারণ অংশগ্রাহীর কাছে নিজ 'বিশ্বজনীনতার' উন্মোচন ঘটায় না।

পশ্চিমে জনপ্রিয় শ্রমের 'মানবতাসাধন' সংক্রান্ত অসংখ্য প্রেসক্রিপসনও সমস্যাদির সুরাহা করে না। এগুলি জড়িত হল শ্রমের শুধু বাইরের পরিস্থিতির

উন্নতিবিধানের, নান্দনিক রূপদানের সঙ্গে, যার ফলে শ্রমের ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপেই শ্রমের শর্তের খোদ সারবস্তু। তার সামাজিক তাৎপর্য বদলের ব্যাপারে ইচ্ছা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা — এই হল শ্রমের মানবতাসাধন মতবাদের মূল ধারা। ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে শ্রম কর্তৃক পরম সন্তুষ্টির নেতিবাচক নানা জের আ. শভেৎসার লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: 'যে-শ্রমে মানুষকে নিত্য তার উপস্থিত বুদ্ধি ও তার সমস্ত প্রাণ ঢালার দরকার হয়, সেই শ্রম কর্তৃক প্রেরণালব্ধ আত্মমর্যাদার স্বাভাবিক অনুভূতির বদলে দেখা দেয় আত্মসন্তুষ্টি, যা সাধারণ অসম্পূর্ণতাকে নিজস্ব কৌশল দ্বারা সম্পূর্ণতায় হাজির করার কাজ দেখতে তাকে বাধা দেয়।' তাই মনে হয় সৃজনকর্মের জন্য হাজির শ্রমের ব্যাপারে, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে ঠিক এই অসন্তোষ অনুভূতিই হল ব্যক্তিত্বের পরিপক্বতার, সম্পূর্ণতাসাধনের মূল মানদণ্ড।

শ্রম তার নানা ঐতিহাসিক-সুনির্দিষ্ট প্রকাশ দ্বারা তখনও মানুষের আত্মপ্রকাশের মূল ধরন হয়ে ওঠে না, তখনও তার প্রকাশ ঘটে 'বাইরের প্রয়োজনীয়তা' রূপে। সোভিয়েত শিক্ষাবিদ আ. স. মাকারেঙ্কো লিখেছেন: 'মানুষকে আপনি যত ইচ্ছা মেহনত করতে বাধ্য করতে পারেন, তাব একই সময়ে তার সঙ্গে তাকে যদি আপনি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা না দেন, তাহলে সে মেহনত শুধু

এক নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হবে, যা কোন সুফল দেবে না।' স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ থেকে পার্থক্যস্বরূপ, মার্কস উল্লেখ করেছেন, শ্রম বাস্তবায়িত হয় 'বাইরের সেই লক্ষ্যের চাপে, যা বাস্তবায়িত করা উচিত এবং যার বাস্তবায়ন হল স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা অথবা সামাজিক দায়িত্ব...।'*

শ্রম যেহেতু আপনা-আপনি প্রত্যেক সোভিয়েত মানুষকে সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব করে না, ঠিক সে কারণেই শিক্ষা ও আত্মশিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার কাজ — আজকের শ্রমে ভবিষ্যতের স্বাধীন, সৃজনকর্মের ভাবমূর্তি নিরীক্ষণে এবং এই ভবিষ্যৎকে নিকটবর্তী সংগ্রামে লিপ্ত করায় তাকে সাহায্য করা।

সোভিয়েত দেশ কর্তৃক সহ্য করা পর্যায়ের স্বকীয়তার মূলকথা হল এই যে, লক্ষ্য শুধু অর্থনীতির আংশিক উন্নতিবিধান নয়, বরং গোটা অর্থনীতি ব্যবস্থার রদবদল, আর যার জন্য প্রথম সারিতে হাজির হয়েছে পুনর্গঠনের ও সমস্ত সামাজিক পুনর্নির্মাণের মূল লক্ষ্যের কর্তাস্বরূপ (subject) এক ব্যক্তিত্ব।

সোভিয়েত দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য — শ্রমিককে উৎপাদন-উপকরণগুলির লোক-দেখানো নয়, বরং প্রকৃত মালিক করে তোলা,

---

* ক. মার্কস, এঙ্গেলস ফ.। রচনাবলী, খঃ ২৬, অঃ ৩, পৃঃ ২৬৫-২৬৬ (রুশ সংস্করণ)।

নিজ শ্রমফলের জন্য তাকে পুরো জবাবদিহি করার ব্যাপারেই শুধু শিক্ষাদান নয়, বরং এইজন্য সংগ্রাম করা, শ্রম যাতে আরও বেশি আগ্রহজনক, সৃজনধর্মী হয়ে ওঠে। বলা চলে যে, অর্জিত সবকিছুর ব্যাপারে সন্তুষ্টির দশকগুলির, বদ্ধাবস্থার দশকগুলির চেয়ে পুরনোর সঙ্গে প্রবল সংগ্রামের জটিল সময়টি, উৎপাদনের অবস্থায় সাধারণ অসন্তুষ্টির সময়টি উত্তম শিক্ষকের কাজ করবে।

৩। বহু জীবন সহ্য করা

শ্রমে নিহিত সার্বিক সামাজিক যোগাযোগ উন্মোচনের এক পদ্ধতি হল অভিনয় বা খেলা। শ্রমের মূলকথা সর্বদা নানা লক্ষ্য ও উপায় জানা, নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করা কাজের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা হলে, অভিনয়ে মানুষ, প্রথম দৃষ্টিতে, পরম স্বাধীনতা উপভোগ করে। শ্রম-লক্ষ্যাভিমুখী ; অভিনয়ের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই ; শ্রম — নির্দিষ্ট মাত্রা, নমুনা, মানদণ্ড অনুযায়ী কাজকর্ম ; অভিনয় — মানদণ্ডগুলি 'শিথিল করার' উপায় ; শ্রম — সামাজিকভাবে হিতকর ; অভিনয়ের কোন চক্ষুগোচর হিত নেই।

অভিনয়ে মানুষ বাইরের প্রয়োজনীয়তার উৎপীড়ন মুক্ত হয়। তা কল্পনার অসীম প্রান্তর যোগায়, মানুষকে তা হতে সাহায্য করে যা ও যে সে হতে ইচ্ছুক — সত্যিকথা, অভিনয় চলার সময়। অভিনয়ে গাছ ও পাখি, মেঘ ও বাতাসের অনুরূপ হওয়া

যায়। অভিনয় করাকালে মানুষ সাময়িকভাবে মহান শিল্পী ও সুবিখ্যাত সেনাপতি, চিন্তাবীর ও রাষ্ট্রপ্রধান 'হতে' পারে। এটাই কি সেই ব্যক্তিত্বের প্রোটটাইপ নয়, বিশ্বের প্রতি যার সম্পর্ক বিশ্বজনীন। যেকোন ধরনের মার্ক অনুযায়ী সৃষ্টি করতে, নানা বস্তু ও মানুষের অন্তরের গভীর সারবস্তুতে প্রবেশ করতে সক্ষম, আর তা সবই পারে নিজের স্বার্থজনিত আগ্রহগুলি বিস্মৃত হয়ে।

একইসঙ্গে হ্যাঁ ও না। হ্যাঁ এই কারণে যে, অভিনয়ে মানুষ দৃষ্টিগোচরভাবে, চাক্ষুষভাবে নিজেকে অনুভব করে। অসংখ্য সম্ভাবনার পক্ষে নিজ চেতনা উন্মুক্ত, ডজন ডজন অন্যের জীবন সওয়ার ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করে। না এই কারণে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহান চিত্রশিল্পীর রূপধারণ করে আমি বা আপনি তাঁর নানা ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করব না, আমরা 'বুঝি-বা' চিত্রশিল্পী, 'বুঝি-বা' বিজ্ঞানী, 'বুঝি-বা' রাজনীতিক হব। 'সমৃদ্ধ', সুসমঞ্জস মানুষ কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য অটলভাবে চিন্তাভাবনা করে, আত্মোৎসর্গী হয়ে মেহনত করে, জ্ঞান অর্জন করে, শুধু অভিনয়ই করে না। সে শুধু Homo ludens- ই নয়, বরং যেমন Homo sapiens, তেমনই Homo faber। মানুষের ক্রিয়াকলাপের বুঝি-বা দু'টি স্তর আছে: তা বাস্তবায়িত হতে পারে 'সিরিয়াসভাবে', আবার হতে পারে 'অভিনয়ের' আকারে, যার অর্থ ক্রিয়াকলাপের খোদ প্রক্রিয়া দ্বারা উপভোগের প্রয়োজনে রূপায়িত হয়। প্রথম

ক্ষেত্রে মানুষ মেহনত করে, মেলামেশা করে, চেতনালাভ করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — অভিনয় করে নিজের জীবন দ্বিবিধ করে। সে অনুভব করে যে, বৈজ্ঞানিক বিতর্কে সে নিজের প্রতিপক্ষের স্থান নিতে সক্ষম, শুধু উৎপীড়িতই নয়, উৎপীড়কও হতে পারে, শুধু দর্শক নয়, অভিনেতাও হতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন হুলিও করতাসারের 'জন হাউলেপ্পার জন্য নির্দেশ' গল্পে। অভিনয় ক্ষমতার কল্যাণে মানুষ তার চারিপাশের সবকিছু তথা প্রকৃতির সঙ্গে, নিজের সঙ্গে যোগাযোগ অনুভব করতে পারে। ঠিক এই অভিনয় ক্ষমতাই মানুষকে নৈতিকতার এই 'সোনার নিয়ম' পালনে সাহায্য করে : তুই যদি চাস্ তোকে যাতনা দেওয়া না হোক, তবে অন্যকেও তা দিস না। অন্য, নিজের মতো নয় এমন দৃষ্টিকোণ ধারণের ক্ষমতা নানা বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানে, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ ভাষা খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি রয়েছে অভিনয়ে, আর অভিনয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি — শ্রমের ক্ষেত্রে। অভিনয় ও শ্রম — ক্রিয়াকলাপের সম্পূরক দুই ক্ষেত্র। আর তা আকস্মিক ব্যাপার নয়। যেহেতু অভিনয় দেখাও দেয় 'সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে নানা বস্তুর আদান-প্রদান' প্রক্রিয়ায়, শ্রমের প্রক্রিয়ায়। সম্পূর্ণ অর্থে অভিনয় হল শ্রমের সন্তান।

অভিনয় করে, বাইরের দিক থেকে মূল্যহীন কর্ম পালন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ক্ষমতার অভ্যাস চালাতেন, দৈহিক শক্তি রক্ষা করতেন, নিজেদের যাচাই করতেন, সম্ভাব্য নানা পরিস্থিতির মডেল তৈরি করতেন। ভাবী মৃগয়া অথবা সামরিক ক্রিয়াকলাপের আগে এক ধরনের ট্রেনিং নিতেন। মৃগয়া শেষে তাঁরা কাজকর্মের গতিবিধি অভিনয়ের সাহায্যে পুনঃসৃষ্টি করতেন। এক ধরনের 'অভিনয়জনিত বিশ্লেষণ চালাতেন, ফলে সফল কৌশলগুলি পাকাপোক্ত হত।

আমাদের একেবারে আধুনিক শিশুরাও অভিনয়-খেলা খেলতে ভালবাসে, যার দ্বারা তারা ভাবীকালের বড়দের জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। সব মেয়েই মনে হয় 'মা-মেয়ে' খেলেছে। সব ছেলেই মনে হয় জীবনে কম করেও একবার জন্মভূমির রক্ষাকারী, নির্ভীক সেনা, নতুন নতুন জায়গায় প্রথম আবিষ্কারক, বৈমানিক, মহাকাশচারী রূপে নিজেকে অনুভব করেছে।

সুতরাং অভিনয় হল শ্রমের ব্যাপারে প্রস্তুতির, মানবজাতির শিশুত্বের পর্যায়ে ও আলাদা আলাদা মানুষের বাল্যকালে শ্রমে শরিক হবার অত্যাবশ্যক এক দিক। তবে আধুনিক 'বড়দের' দুনিয়া তার নানা উৎপাদনী কর্তব্য মীমাংসার জন্য অভিনয়-খেলার আশ্রয় নেয় না। তার অধীনে আছে শ্রমের ব্যাপারে প্রস্তুতির অধিকতর আধুনিক নানা উপায়-উপকরণ। আধুনিক দুনিয়া খেলার (অভিনয়ের) বিরুদ্ধে, 'অলীক কল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের' স্বকীয় ধরনের এক 'সমাজ' সৃষ্টি করেছে, যা-ই রূপক আকারে 'এশের পি' গল্পে দেখিয়েছেন

আমেরিকার কল্পকাহিনীর লেখক আর. ব্রাডবেরি। তবে স্বাধীন অভিনয়ের, অলীক কল্পনার পদদলিত আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার ডানা-মেলে ধ্বংস করার শক্তি অর্জন করছে। নিজ জীবন থেকে 'যুক্তিহীন' সবকিছুকে তাড়িয়ে দিয়ে সমাজ তার চাপেই মারা পড়ে, যেমনটি মারা পড়েছিল 'অলীক কল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমাজের' সদস্যরা — এডগার এলেন পো'র বিখ্যাত গল্পের 'এশের ভবনের' হুবহু নকল এক কেল্লার টুকরো-টুকরো খণ্ডের চাপে, যেটি তৈরি করেছিল এক পাগলাটে অলীক-কল্পনাবিলাসী। 'নিষিদ্ধ' এই লেখকের প্রাণের খেলা কল্পনার নানা সুফল সম্বন্ধে তারা কিছুই জানতে ইচ্ছুক ছিল না এবং 'এশের ভবনে' প্রবেশ করে তারা মুশ্‌কিলে পড়েছিল, লেখকের কল্পনা, খেলার যুক্তি অনুসারে যেটির ভেঙে পড়া উচিত ছিল, আর... সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়েছিল।

তবে দৈনন্দিন জীবনের 'রাশভারী' অবস্থা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ডজন ডজন জীবন সওয়ার হারিয়ে- যাওয়া ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যায়, খেলা (অভিনয়) ও শ্রমের ইপ্সিত সম্মিলনে কীভাবে ফেরা যায় ? উপায় মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ — নিজের বাল্যকালের প্রতি দৃষ্টিপাত। ঠিক সেখানেই রয়েছে কল্পনার ইপ্সিত খেলা, সমৃদ্ধ অলীক কল্পনা, সৃজন শক্তিগুলির বাধাহীন, দুর্বার বিকাশ। ছোটবেলার দেশ ভ্রমণের ফলে, আমাদের পুরনো পোষাকের মতোই 'বড়দের' ধ্যানধারণা ছুঁড়ে ফেলা যাবে, শিশুর দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপ দর্শন করা যাবে। ছোটবেলার অমূল্য বস্তু রক্ষা করে আমরা বুঝি-বা আধুনিক যুক্তিসিদ্ধ সংস্কৃতিতে আবেগময়

সৃজনী সূত্রপাতের পরশ লাগাচ্ছি।

আমাদের, এই বড়দের পক্ষে কি সাময়িকভাবেও ছোটদের মতো 'হওয়া' সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আসুন দেখা যাক্, ছোটরা কী ও কেন খেলে, আর বড়দের কী কী খেলার প্রয়োজন।

শিশুর খেলা বৈচিত্র্যময়। এই দেখুন এক শিশু সুন্দর ও রঙ-বেরঙের এক খেলনা ভাঙছে আর সে প্রক্রিয়া থেকে প্রচন্ড তৃপ্তি লাভ করছে, আর এই দেখুন রঙ-তুলি হাতে নিয়ে কাগজে হিজিবিজি বিন্দু ও রেখা টানছে। অনেকক্ষণ ধরে বকবক করে অর্থহীন কিছু বলে শিশু প্রচন্ড তৃপ্তি পায়। আর হঠাৎই এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়াবে আর বড়দের প্রশ্নে উত্তর দেবে : 'আমি পাখি ; অথবা : 'আমি বাড়ি'...। অন্যান্য খেলাও আছে — সঠিক বিষয়বস্তু, কাজকর্ম — ভূমিকা বন্টন সহ, সেসব খেলা খেলে একটু বড় বাচ্চারা। খেলা হতে পারে ক্রীড়ামূলক, আছে খেলা 'নিয়মকানুন অনুযায়ী', আচার-প্রথার অনুরূপ। এ সবেরই মিল আছে এক ব্যাপারে, — এগুলির কোন দৃষ্টিগোচর 'উৎপাদ', ফল নেই, এগুলির তাৎপর্য খোদ খেলায়, প্রক্রিয়ায়, যা থেকেই শিশু তৃপ্তিলাভ করে।

শিশুর বলতে গেলে গোটা জীবনটা খেলায় ভরাতে তাকে কী বাধ্য করে, আর কেনই-বা বড়দের বার বার খেলার জগতে 'ফিরে আসতে' হয়? এর এক অতি সরল, অথচ ভুল উত্তর আছে : মানুষের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের খেলা-জাতীয়, 'নাটকীয়' সহজাত প্রবৃত্তি, অনুকরণ করার বাসনা, যার একান্ত সরাসরি প্রকাশ ঘটে বয়সের ঊষালগ্নে, আর তারপর বৈঠিক শিক্ষা, সামাজিক-

রুটিনমাফিক কাজকর্মের দরুন চাপা পড়ে যায়। এখানে আমরা আবার এক তত্ত্বের মুখোমুখি হই, যা অনুসারে মানুষের সারবস্তু তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত।

রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসনের প্রথমের দশকগুলিতে খেলার শিক্ষামূলক সম্ভাবনার উপর প্রচন্ড আশা রাখা হয়েছিল। খেলা-জাতীয় (অভিনয়) 'নাটকীয়' সহজাত প্রবৃত্তি আবিষ্কারকে তুলনা করা হয়েছিল নতুন ধরনের শক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে। অনুকরণের ব্যাপারে শিশুর জন্মসূত্রে-প্রাপ্ত ঝোঁকের উপর ভিত্তি করে অভিনয়-নাটকীয়তার সাহায্যে শিশুকে সামঞ্জস্যের, সুন্দরের ও শৃঙখলার জগতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল, এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ বাস্তবিক জগতেও সুবিকশিত অনুকরণ ক্ষমতার কল্যাণে সামঞ্জস্যতা, শৃঙখলার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবে। এ লক্ষ্য করা কঠিন কাজ নয় যে, এখানে বলা হচ্ছে পুরনো নৃবিদজনিত প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী নতুন মানুষ গড়ার এক বিশ্বজনীন, আর সে কারণেই ইউটোপীয় উপায়ের কথা।

নানা বস্তু, লোকজন, ধারণার প্রতি খেলাজনিত (অভিনয়মূলক) সম্পর্কের ভূমিকাটি বোঝার জন্য খুদে মানুষের জগতে তার গড়ে-ওঠা নানা চাহিদার জগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করা যাক, আর এখানে আমরা দেখি, 'সাধারণভাবে' খেলা বলে কিছু নেই, আছে বিভিন্ন ধরনের খেলা। সময় সময় খেলা বলতে আমরা বোঝাই *দেহচর্চার, হাঁটা-চলার সক্রিয়তার ব্যাপারে সাদামাটা* চাহিদাকে — এই খেলা দেহযন্ত্রের দৈহিক সম্ভাবনাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই তা কখনও মানুষের 'বিশ্বজনীন'

বিকাশের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে না। সহজ কারিকুরি করার কাজকর্মকেও আমরা খেলা বলি : নতুন জিনিসগুলি শিশু বুঝি-বা খুটিয়ে-নাটিয়ে দেখে, সেগুলির স্বাদ, গন্ধ, কঠিনতা পরীক্ষা করে, কোন দৃষ্টিগোচর লক্ষ্য ছাড়াই তা 'যাচাই করে' সে বুঝি-বা নিজ কণ্ঠ দ্বারা কারিকুরির কাজ চালায়। বিকাশের একেবারে আদি পর্বে খেলা শিশুর প্রধান শিক্ষক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত নকল-করা (অনুকরণ) ধরনের নানা খেলার কথাও বলা চলে, যেগুলিতে শিশু তাকে হতবাক করা ব্যাপার-স্যাপারের রূপ দেয়। এই রূপদানের কল্যাণে সেই জিনিস আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়। তার সদৃশ হওয়ার সে চেষ্টা করে। অধিকতর জটিল নানা খেলাও আছে — নানা ভূমিকাসম্পন্ন, তথাকথিত 'শিল্পজনিত' খেলা, 'নানা নিয়মকানুন সহ' খেলা। শিশুর কাছে তাকে ছাড়া আপনা-আপনি জগতের অস্তিত্ব নেই, এই জগৎ বুঝি-বা সেই প্রথম থেকেই মনুষ্যধর্মী। শিশুর ধারণায় বড়রা — জিনিসপত্রের প্রভু। বড়দের মতো হওয়ার অর্থ 'জিনিসপত্রের প্রভু' হওয়া। তাই 'বড়দের মতো হওয়ার' অভিপ্রায় — শিশুর সব কাজের মুখ্য অভিপ্রায়, পারিপার্শ্বিক জগৎ 'আয়ত্তে আনার' মূল পথ।

মানুষ ও জগতের মধ্যে একাকার অবস্থার ধারণা বিনা শিশু কাজকর্মের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারত না, তার সেই 'আমি নিজে'ও থাকত না, ছোটদের সেই স্বার্থকেন্দ্রিকতাও থাকত না, পিতামাতাদের যা এমন হতাশ করে। সুতরাং খেলায় 'বড়দের মতো হওয়া', বড়দের কাজকর্ম নকল করা — এটা নানা সৃজনশক্তির

লক্ষ্যহীন খেলা নয়, শিশুর ধারণায় তা সম্যকভাবে লক্ষ্যাভিমুখী ক্রিয়াকলাপ। খেল্‌জনিত এমন আচরণের মধ্যে আছে স্বকীয় ধরনের মায়াবী ধারণাদির নানা উপাদান : 'বড়দের আচরণের আলাদা আলাদা দিক নকল করে আমি বড়দের জগতের সংস্পর্শে আসব এবং জিনিসপত্র আমার অধীনে আসতে বাধ্য হবে।' বড়দের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন অতি-সরল ও অলীক কল্পনার খেলজনিত ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ায় বড়দের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী নানা সামাজিক মাত্রার ব্যাপারে শিশুর আদি স্থিতিবোধ ঘটে। কেননা বড়দের মতো হওয়ার জন্য শিশুকে বড়দের জীবনের কিছু কিছু, সবচেয়ে টিপিক্যাল, বার-বার ঘটা খুটিনাটির পুনঃসৃষ্টি করতে হয়।

সুতরাং খেলা হল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের সংস্পর্শে আসার আদি পর্ব। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে প্রখর যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে এই জগতের নৃআকার সংক্রান্ত অতি সরল ধারণা ভেঙে চুরমার হয়, শিক্ষা, সামাজিক-হিতকর ক্রিয়াকলাপকে জায়গা ছাড়তে খেলা বাধ্য হয়। সুতরাং শিশুর কাছে খেলা কখনই পরম স্বাধীন সৃজনকর্ম, 'সারবস্তুজনিত শক্তিগুলির খেলা' নয় ; খুব সম্ভবত এ হল খুদে মানুষের সমাজীকৃত রূপধারণের প্রাথমিক অবস্থান, ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক নিজস্ব সামাজিক সারবস্তু 'আহরণের' চাহিদা গঠন, তবে এই সারবস্তুর পরিপক্ব প্রকাশ নয়। সোভিয়েত মনস্তাত্ত্বিক ল. স. *ভীগোদ্‌স্কি বারংবার বলেছেন,* শিশুর অলীক কল্পনা হল দৈন্য। সে জানে না বলেই অলীক কল্পনায় মগ্ন হয়। নিজেদের মাতৃভাষা রপ্ত করে,

নিজেদের দেহকে কব্জা করতে শিখে, মূল সামাজিক আচরণবিধি (মাত্রা) রপ্ত করে উঠতি-বয়সের ছেলেমেয়েরা স্বতঃস্ফূর্ত খেলা ছেড়ে, ফলপ্রসূ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চলে আসে। তাই নিজের ছেলেবেলায় সুসমঞ্জস মানুষ গড়ার প্রেসক্রিপসন খোঁজা — নিরর্থক। যেহেতু শিশুর খেলা — আমাদের বড়দের জগতের সংস্পর্শের আসার এক উপায় মাত্র, তা ছেড়ে চলে যাবার ধরন নয়।

বড়দের জগতে খেলা কোন্ স্থানের অধিকারী? অবশ্যই, বড়দের জন্যও নিজস্ব নানা খেলা আছে, যেগুলি তাদের অবসর সময় পূর্ণ করে, স্বাস্থ্য জোরদার করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রীড়াজনিত খেলা। অন্যান্য 'খেলারও' অস্তিত্ব আছে। সুনির্দিষ্ট সামাজিক 'মুখোশ' 'অপরের মুখ' ধারণ করে — যেমনটি ঘটেছিল জাপানী লেখক কোবো আবের এই নামেরই রচনার নায়কের সঙ্গে — মানুষ কাজকর্মের দুনিয়ায় সাফল্য লাভের চেষ্টা করে। সে বুঝি-বা 'খেলার নিয়মকানুনকে' মেনে নেয়, যেখানে বাজি ধরে পদোন্নতি, অর্থ, সাফল্যের ব্যাপারে। ব্যক্তিত্বের আত্মনিঃসঙ্গতার এক ধরন রূপে এমন 'খেলার' কথা আমরা আগেই বলেছি।

সুতরাং, একদিকে, খেলা হল এক স্বাধীন সৃজনকর্ম, শ্রমের সম্পূরক, বাস্তবায়িত হয় বাইরের প্রয়োজনীয়তার চাপে। অন্যদিকে — বড়দের খেলা সময় সময় স্বাধীন সৃজনকর্ম থেকে বহুদূরের ব্যাপার।

ব্যাপার হল এই যে, খেলা — এক অতি জটিল ও বৈপরীত্যজনিত ঘটনা, তার চিন্তাহীন প্রয়োগের ফল হতে পারে যা-ভাবা-হয়েছিল তার ঠিক উল্টো। বিভিন্ন

ধরনের খেলাও গড়ে ওঠে তার বিভিন্ন দিকের ভিত্তিতে। খেলায় নিত্য হাজির থাকে দু'টি মুহূর্ত, দু'টি হেতু। এক — দ্বিধাহীন আসক্তি, পরম স্বাধীনতার অনুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব ; দুই — খেলার সব নিয়ম, কঠোরভাবে মানতে রাজি থাকা, তা সে নিয়ম যতই আজগুবি ও বাধ্যতামূলক হোক না কেন, 'চরম পরাধীনতা, মাত্রাবিধি'।

মাত্রাবিধি দিকটির পরম রূপদানের ফলে নিষ্ক্রিয়তা, নিরাশাবাদ দেখা দিতে পারে। স্টোয়াবাদী (গ্রীক stoa থেকে) এপিকটেট সেই প্রাচীন যুগেই মানুষের পার্থিব কর্তব্য সম্বন্ধে লিখেছেন : 'তোর কাজ হল তোর পার্থিব কর্তব্যের ভূমিকাটি ভালভাবে পালন করা ; তা নির্বাচন করা — একেবারেই অন্য ব্যাপার।'*

খেলার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব দিকটির পরম রূপদানের ফলে চরম অনিরপেক্ষতা, ইচ্ছাশক্তি-সর্বস্যতা দেখা দিতে পারে। আগেই উল্লিখিত ইংরেজ লেখক ইউ. গোল্ডিং তাঁর 'মাছির প্রভু' রচনায় মানুষের আচরণের এক ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, যে তার জীবনে নির্ভর করে শুধু খেলার উপর। জনমানবহীন দ্বীপে পরিত্যক্ত একদল শিশুর কাছে প্রথম অনুভূতি ছিল স্বাধীনতার, যা-ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা খেলার সুযোগের অনুভূতি। আর এখানে খেলার 'দ্বিবিধ' (মাত্রাজনিত ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব) প্রকৃতি হঠাৎ রূপলাভ করেছিল দুই দল শিশুর আচরণে : একদলের কাছে খেলা রূপান্তরিত হয়েছিল

---

* এপিকটেট। স্টোয়াবাদী নৈতিকতার মূলকথা। কাজান, ১৮৮৩, পৃঃ ১২-১৩ (রুশ সংস্করণ)।

বড়দের জগতে গৃহীত নিয়মকানুনের ছিমছাম ও ক্লান্তিকর পালন করা : আগুন ধরে রাখা, সবচেয়ে ছোটদের যত্ন নেওয়া, 'বড়দের সামাজিক সোপানপ্রথা' বজায় রাখা। অন্যদের কাছে খেলা হয়ে উঠেছিল 'বড়দের' সব বিধি-নিষেধ ভাঙা। ফলে এই খুদে সহমিতালীর বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করেছিল আত্মধ্বংসের খেলার নয়, বরং প্রকৃত বিপদ। লেখক বুঝি-বা আমাদের বলতে চেয়েছেন, যুক্তির আলোকে না-আলোকিত, কর্তব্যের অনুভূতি দ্বারা না-সংযুক্ত খেলা, আর শুধুই খেলা কখনই স্বাধীন মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি হতে পারে না।

একটা আপাত-বিরোধী ব্যাপার উত্থাপন করব : মানুষ যত বড় হয়, তার খেলনাও তত বেশি রাশভারী ধরনের হয়। ছোটবেলায় সে তার চারিপাশের জিনিসপত্র দিয়ে খেলে থাকলে, বড় হয়ে সে গোটা মানবজাতির সংস্কৃতিকে নিজের খেলার ক্ষেত্রে পরিণত করে। নানা নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ, ভাল ও ন্যায়, সত্য ও সুন্দর, সুখ, বিবেক — আমাদের দ্বারা রপ্ত-করা সব জ্ঞান, মূল্যবোধ, মাত্রাজ্ঞান এমন খেলার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। তবে যত বেশি হাতছানি এ পথে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে ততই বেশি বিপদ। সবচেয়ে মূল্যবান সবকিছুকে, নিজের গোটা জীবনকে খেলায় পরিণত করার প্রচেষ্টায় মানুষ হঠাৎ লক্ষ্য করতে পারে যে, খেলাই জীবন হয়ে উঠছে, রোজকার জীবনযাত্রা জমাট বেঁধে যাচ্ছে আর সে বাস্তবতার সুকঠিন বেড়াজালে ধরা পড়ছে।

'খেল্‌প্রিয় মানুষের' পেছনে লেগে থাকে দু'টি

মূল বিপদ। তার একটি হল বাস্তবতার অনুভূতি পুরোপুরি খোয়ানো। প্রবাদে আছে যে, একদা চীনা দার্শনিক জুয়ান-জি স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি — এক প্রজাপতি। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর তিনি বুঝতে পারলেন না, কে তিনি : প্রজাপতির স্বপ্ন দেখা জুয়ান-জি, নাকি সেই প্রজাপতি, যে স্বপ্ন দেখছে যে, সে — জুয়ান-জি।

আর্জেন্টিনার আধুনিক লেখক হ.ল. বোরহেসের 'Everything and Nothing' নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে 'খেল্‌প্রিয় মানুষের' ভাবমূর্তি সংযুক্ত হয়েছে ঈশ্বরের রূপধারণকারী 'খেলা-করা' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে। আমরা লক্ষ্য করছি মানুষের বিশ্ব-সম্পর্কের স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক পরিসমাপ্তি, যে খেলাকে নিজ অস্তিত্বের তাৎপর্যে পরিণত করেছে : আমি যদি সবাই ও কেউই-না হতে সক্ষম, তাহলে আমার পারিপার্শ্বিক জগৎ আমার কাছে সুস্থায়ী ও স্থবির বলে কেন মনে হয়? কেননা 'খেলা-করা' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার খেল্ ক্ষমতাগুলিও অসীম হারে বাড়ছে। তবে 'খেলার ক্ষেত্রের' এমন বাড়-বাড়ন্তের দরুন ব্যক্তিত্ব বিশ্বের উপর ভরকেন্দ্রটি খোয়ায়, নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা খোয়ায়, তাকে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে এবং এমনকি খোদ খেলারও তাৎপর্য বঞ্চিত করে। বোরহেস বর্ণনা দিচ্ছেন, শেক্সপিয়র নির্ধারিত সময়কালে ঈশ্বরের সামনে হাজির হয়ে তাঁর প্রতি আবেদন জানাচ্ছেন : '*আগে আমার অনেক মানুষের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ* ঘটেছে' এখন আমি নিজে নিজের মতো হতে চাই, — আর বিশ্বস্রষ্টার চক্ষু তাকে উত্তর দিল ঝড়ের মধ্যে

থেকে : আমিও আমি নই ; আমি বিশ্বকে কল্পনা করেছি, হে আমার শেক্সপিয়র, ঠিক তুই যেমন তোর সৃষ্টিকে করেছিস, আর আমার স্বপ্নের এক অপচ্ছায়া — তুই, ঠিক আমার মতন, যে বস্তুত সব, আবার কেউই-না।'

অন্য বিপদ হল খেলা ও জীবনের মধ্যে সীমারেখাটি চরমভাবে মুছে ফেলার কাজ বুঝি-বা বজায় রাখা। উদ্ভট কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের যেহেতু কোন মানদণ্ড নেই, তাই যেকোন, একেবারে উদ্ভট কল্পনাও বাস্তবতা হতে সক্ষম। আর্জেন্টিনার অন্য এক লেখক হুলিও কোর্তাসার 'পার্কের পর পার্ক' গল্পে তার নায়ক আরাম করে বসে আছে ইজিচেয়ারে, গায়ে সবুজ মখমলের শাল, উপন্যাসের চরম মুহূর্ত ক্রমশ গভীর হচ্ছে, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা তৃতীয় একজনকে মারার কথা ভাবছে। আর এই হল শেষ দৃশ্য। 'প্রেমিক তিন ধাপ দিয়ে উপরে উঠল ও বাড়িতে ঢুকল।... বসার ঘরের দরজা, আর তখনই — হাতে ছোড়া, জানলা দিয়ে আসা হাল্‌কা আলো, ইজিচেয়ারের উঁচু ঠেকনা, সবুজ মখমলের শাল জড়ানো, আর লোকটার মাথা, যে ইজিচেয়ারে বসে এক উপন্যাস পড়ছে।'* উদ্ভট কল্পনা বাস্তবে পরিণত হল। ইজিচেয়ারের লোকটা — কোর্তাসারের গল্পের নায়ক। তার হত্যাকারী — তার দ্বারা পঠিত উপন্যাসের নায়ক।

সংস্কৃতির নানা মূল্যবোধ নিয়ে খেলা, এ হল

---

* কোর্তাসার হ.। পার্কের পর পার্ক। মস্কো, ইজভেস্তিয়া, ১৯৮৪, পৃঃ ১০ (রুশ সংস্করণ)।

ধারালো ব্লেড নিয়ে খেলা, মানুষের নিজস্ব সারবস্তু নিয়ে খেলা। অন্তরের ভরকেন্দ্র থেকে বঞ্চিত মানুষ সহজেই এক তথা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভূত, সৃজনধর্মী, পরম স্বাধীন খেলা ছেড়ে অন্য তথা নানা নিয়মকানুনের সমষ্টিবদ্ধ খেলায়, তার গোটা জীবনকে বশবর্তী করা আচার-প্রথা রূপে খেলায় উত্তরণ করতে পারে।

তাহলে কি এই ধরনের বিপদে-ভরা খেলা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ? বাইবেলে যেমনটি বলা হয়েছে : 'না সন্তান, না পত্নি, না ভ্রাতা, না বন্ধু, তোর জীবন থাকতে কাউকেই তোর ওপর কর্তৃত্ব করতে দিস না। যতক্ষণ তুই বেঁচে আছিস ও নিঃশ্বাস নিচ্ছিস নিজেকে অন্য দ্বারা বদলাস না...' ।* তবে মানুষ নিত্য নিজেকে অন্যর জায়গায় বসায় — সহানুভূতি দেখিয়ে, সহযাতনা সয়ে, একত্রে মর্মপীড়া ভোগ করে, চেতনালাভ ও কাজকর্ম করে। '...যেকোন ধরনের মাপকাঠি অনুযায়ী মানুষ উৎপাদন করতে পারে এবং সর্বত্র সে কোন জিনিসে হাজির মাপকাঠি যোগান দিতে পারে।'**

নিজের মতো থাকা ও সবাই হয়ে ওঠা, 'হওয়া' ও 'মনে হওয়া' — এই হল বিশ্বের প্রতি যথার্থ মানবিক সম্পর্কের দুই দিক। বিশ্ব-সম্পর্কের এই দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাটি রূপায়িত হয়েছে বিশ্বের এক বিশেষ নান্দনিক

---

* বাইবেল। এই গ্রন্থে : সিরাখভের সন্তান যীশুর বিজ্ঞতা। অধ্যায় ৩৩, পঙ্‌ক্তি, ১৯-২১। মস্কো, ১৯৮৩, পৃঃ ৬৬৬ (রুশ সংস্করণ)।

** ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪২, পৃঃ ৯৪ (রুশ সংস্করণ)।

রপ্ত করার মধ্যে, যার সর্বাধিক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে শিল্পকলায়। ঠিক এই শিল্পকলাই নিজের দ্বারা অসংখ্য ভূমিকা 'মাপতে', ভাবীকালের জগতে অনুপ্রবেশ করতে এবং অতীতের নানা যুগে ডুব দিতে সাহায্য করে আর সে ক্ষেত্রে নিজস্ব অন্তর্জগৎ বিধ্বংস না করেই, বরং উল্টো : তার বিকাশ ঘটিয়ে ও পূর্ণতর রূপ দিয়ে।

৪। অনুভূতি শিক্ষা

মানুষ কর্তৃক নিজের ব্যক্তিগত 'বংশজনিত' সারবস্তু 'আহরণ করা' প্রক্রিয়ায় বিপুল ভূমিকা পালন করে শিল্পকলা। একেবারে সাধারণ আকারে, শিল্পকলা হল সমাজ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম এক মধ্যস্থতাকারী, যা পারিপার্শ্বিক জগতের সব সম্পদকে নিজের মধ্যে শুষে নিতে, হৃদয়ঙ্গম করতে, আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে। তদ্দ্বারাই শিল্পকলা তার মুখ্য কর্ম পালন করে — পারিপার্শ্বিক জগৎকে 'মানবিক পরশদানের' মাধ্যমে খোদ মানুষকে আরও বেশি মানবিক, সমৃদ্ধ করে তোলা। অযথাই মার্কস শিল্পকলাকে ক্রিয়াকলাপের 'বস্তুত — আত্মিক' ধরনের পর্যায়ে ফেলতেন না, যা পরিচালিত হয় মানুষের নানা চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বের আত্মিক আয়ত্তীকরণ ও পুনর্গঠনের উদ্দেশে।

মানুষের বিকাশ, তার আত্মিক জগৎ সমৃদ্ধ করার কর্তব্য শিল্পকলা কী উপায়ে সমাধান করে? বহুকাল ধরে মানুষের উপর শিল্পকলার শিক্ষামূলক প্রভাবের সারবস্তুবোধে দুই প্রবণতার মধ্যে লড়াই চলেছে,সুদূর

নানা শতাব্দী থেকে এ ঐতিহ্য বজায় আছে যে, বিশ্বকোষ, জীবনের পাঠ্যপুস্তকের মতোই শিল্পকলা হল পারিপার্শ্বিক জগৎ উপলব্ধি করার সুনির্দিষ্ট এক ধরন। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য — চেতনালাভের শুধু নানা উপায়ে : বিজ্ঞানী প্রমাণ করে, আর শিল্পী দেখায়...। অবশ্যই, শিল্পকলার প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত এবং এর ফলে তার শিক্ষামূলক কাজের ব্যাপারে অতি সরল, বিকৃত ধারণা দেখা দিতে পারে। শিল্পকলা উপলব্ধিতে একপেশে চেতনাবাদ মার্কসবাদের কাছে অজানা। স্থাপত্য নিদর্শন দেখে চিন্তাভাবনা থেকে মনে রেখাপাতের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এঙ্গেলস : 'গোথিক, ফাঁপা খিলান সহ তোরণ পেরিয়ে আমি গেলাম ও চার্চের সম্মুখে হাজির হলাম, গ্রীক স্থাপত্য নিদর্শন হল উজ্জ্বল, আনন্দমুখর সৃষ্টি, মরিতানীয় — বিষাদজনক, গোথিক — পবিত্র ভাবাবেশ ; গ্রীক স্থপতি হল রোদে-ভরা উজ্জ্বল দিন, মরিতানীয় — নক্ষত্র আলোকে উদ্ভাসিত গোধূলিলগ্ন, গোথিক — প্রভাতের ঊষালগ্ন।'* শিল্পকলার রচনায় সময় সময় পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে কোন রকমের প্রত্যক্ষ তথ্য থাকে না, তা শুধু মানুষের মনোভাবে প্রভাব ফেলে।

মার্কস লিখেছেন, প্রাচীন গ্রীক শিল্পকলার চেতনাজনিত মূল্য সহ তার অপূর্ব মনমুগ্ধকর ভাবের ব্যাখ্যাদান সম্ভব নয়। 'শিশুত্বের কবলে না পড়ে পুরুষ কখনও আবার

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪১, পৃঃ ১১৩ (রুশ সংস্করণ)।

শিশুতে রূপান্তরিত হতে পারে না। তার শিশুর সরলতায় সে কি আনন্দ লাভ করে না এবং তার নিজের কি সে প্রচেষ্টা চালানো উচিত নয় যাতে অধিকতর উচ্চ পর্যায়ে সে নিজের যথার্থ সারবস্তু পুনরুৎপাদন করতে পারে? ...আর কেনই-বা মানব সমাজের শিশুকাল সেখানে, যেখানে তা বিকাশ ঘটিয়েছিল চমৎকার সবকিছুর, পুনারাবৃত্তি না ঘটা ধাপের মতন আমাদের জন্য তার চির মাধুর্যের অধিকারী হওয়া উচিত নয়?'*

তাহলে কি শিল্পকলা শিল্পীর নানা আন্তরিক অবস্থা, তার অনুভূতি প্রদান করে, সেগুলি দ্বারা দর্শকদের প্রভাবিত করে সেগুলি শুধু প্রকাশই করে? এই দৃষ্টিকোণের অসংখ্য সমর্থক ছিল এবং আজও আছে। শিল্পকলাকে শুধু পারিপার্শ্বিক জগতের **রূপদানের** দৃষ্টিতে দেখার ফলে বস্তুতই তার শিক্ষামূলক প্রভাব সীমিত হয়, আগে থেকেই তাকে মানুষ গঠনের ব্যাপারে গৌণ ভূমিকা প্রদান করে। শিল্পকলা হল মানুষের অন্তরের অবস্থার **অভিব্যক্তি** — এ মতবাদও কম একপেশে নয়, প্রত্যক্ষ চিন্তাভাবনার বদলে শিল্পকলা দ্বারা অন্তরের নানা অবস্থা প্রদান করা হলে তার চৈতন্যোদয়ের উপায়ে রূপান্তরিত হবার ভয় আছে।

কিছু কিছু আধুনিক অমার্কসীয় মতবাদ এ ধারণার উপর নির্ভর করে যে, শিল্প সৃষ্টির সব সারমর্মই বুঝি-বা আবেগময় অবস্থার প্রকাশ। এই ধারণাটি সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে রূপলাভ করেছে **আবেগবাদ** মতবাদে।

---

* ঐ। খঃ ১২, পৃঃ ৭৩৭।

বলা চলে যে, শিল্পকলার আবেগধর্মী অভাবের খোদ কর্মপ্রণালীটি নির্ধারিত হয় এর দ্বারা যে, তা এক সবিশেষ আকারে **স্বয়ং বিশ্বের নয়, বরং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে মানুষের জটিল পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিফলন ঘটায়**। শিল্পকলা মানুষকে জীবন্ত বলে ধরে নেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী, তা তার মনে আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া জাগায় এ কারণে যে, শিল্প সৃষ্টিতে ঘটমান সবকিছু তার কাছে ঘনিষ্ঠ ও বোধগম্য। শিল্পকলা নানা পরিস্থিতির উজ্জ্বল ও সুনির্দিষ্ট মডেল সৃষ্টি করে, বাস্তব জীবনে যাতে মানুষ পড়তে পারে। মনে হতে পারে যে, শিল্পকলার প্রভাবের এমন চরিত্রের উচিত 'ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত সবকিছু জোরদার করার মধ্যে', তার শিক্ষামূলক কাজকে সীমিত করা। সে ক্ষেত্রে শিল্প সৃষ্টি দ্বারা উদ্ভূত আবেগ এবং মানুষের বাস্তব জীবনে সওয়া আবেগের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

তবে মানুষের সাধারণ আবেগগুলির সাদামাটা দ্বিগুণ করার কল্যাণেই লোকজন, তাদের আত্মিক জগৎ, অনুভূতি ও যুক্তির উপর শিল্পকলার প্রভাব সীমিত হয় না। তা সেগুলির শুধু জাগরণই নয়, বরং সৃষ্টি করে ও বিকাশ ঘটায়। অনুভূতি লাভের শিক্ষা — শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ায় এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

পারিপার্শ্বিক জগতের বহু ব্যাপারই মানুষ গ্রহণ করে ইতিমধ্যেই গঠিত সুনির্দিষ্ট এক আবেগধর্মী মূল্যায়ন সহ। *গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের নানা আবেগের* কার্যকর দর্পণে পরিণত করে শিল্পকলার কল্যাণে সে প্রকৃতিতে নিজেকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এইভাবেই

শিল্পকলার সাহায্যে সে গোটা বিশ্বের সঙ্গে আবেগজনিত যোগাযোগে গা ভাসায়। যেহেতু শিল্পকলায় নিষিদ্ধ বিষয় বলে কিছু নেই। যেকোন ব্যাপার, ঘটনাই শিল্প সৃষ্টির ভিত্তি হতে পারে।

আবেগ দ্বারা 'প্রভাবিত করার' আপাত-বৈপরীত্য ব্যাপারটি, মানুষের উপর তার প্রভাবের শিক্ষামূলক কর্মপ্রণালীটি নিহিত আছে প্রবল আবেগজনিত মর্মপীড়া ও তার **'বিমূর্ত অবস্থার'** সংঘর্ষের মধ্যে। ব্যাপার হল এই যে, নানা আবেগে প্রতিফলিত হয় খোদ বাস্তবতার খন্ড খন্ড অংশ নয়, বরং মানুষের পক্ষে তার তাৎপর্য। আবেগজনিত সম্পর্কের বিষয়বস্তু বুঝি-বা মানুষের সেইসব দৈনন্দিন আগ্রহের গন্ডি ছাড়ায়, যেগুলি দ্বারাই গঠিত তার আবেগের ভিত্তি।

নিজের নানা ভাবমূর্তিকে প্রকৃত বলে স্বীকৃতিদানের কোন দাবি শিল্পকলা জানায় না। শিল্পকলার কর্ম সয়ে দর্শক একই সময়ে উপলব্ধি করে যে, জটিল জীবন-পরিস্থিতিতে এক প্রতিক্রিয়া রূপে সাধারণত উদ্ভূত তার অনুভূতি আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়েছে মনগড়া ভাবমূর্তির, মনগড়া ঘটনাদির উদ্দেশে। বলা প্রয়োজন যে, আপনা-আপনি দেখা দেওয়া, মানুষের চিন্তাভাবনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন আবেগ থাকতে পারে না। আবেগ — এ হল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম এক অতীব জরুরী উপাদান, মানুষের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মূল্যায়ন। সোভিয়েত মনস্তাত্ত্বিক আ. ন. লেওনতিয়েভ লিখেছেন, 'নানা আবেগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সেগুলি তাদের দ্বারা দায়িত্বাবদ্ধ

কর্তার (subject) ক্রিয়াকলাপের সাফল্যজনক রূপায়ণ সম্ভাবনা অথবা সাফল্য ও নানা হেতুর চাহিদার মধ্যে সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটায়।' তাহলে মানুষ কেন মনগড়া চরিত্রগুলির জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে, তাদের জন্য মর্মপীড়া সইতে পারে? এ কারণে নয় কি যে, নায়ক-নায়িকাদের জীবন, তাদের দুঃখ, আনন্দ, উৎকণ্ঠা ঠিক তাদের নিজেদের জীবনেরই মতন? পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের ভাগ্যের ব্যাপারে সে উৎকণ্ঠা বোধ করে, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জীবন তার কাছে ঘনিষ্ঠ কেন? তা কি এ কারণে নয় যে, জটিল এক সামাজিক ও জৈবিক অখণ্ড সত্তার এক অংশ রূপে সে নিজেকে অনুভব করে?

অন্যকথায়, শিল্পকলার আবেগজনিত প্রভাব এর দ্বারা ফুটে ওঠে যে, মানুষ নিজেকে, নিজের ক্রিয়াকলাপকে সমালোচনার দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে শুরু করে। এটা আবার তাকে এমন ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানে উৎসাহ যোগায়, যা কিনা তার 'সুউচ্চ' অনুভূতির সঙ্গতিসম্পন্ন। তাই এতে কোন বৈপরীত্য নেই যে, শিল্পকলা অনুভূতির শিক্ষা দেয় এবং একই সময়ে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সব দিকের গঠনে ও বিকাশে সহায়তাদান করে, নতুন নতুন লক্ষ্যের উদ্দেশে তাকে পরিচালিত করে।

আবেগের কর্মপ্রণালী ব্যবহার করে শিল্পকলা মানুষকে নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের আজ পর্যন্ত সুপ্ত উপাদানগুলি দেখতে, ভবিষ্যৎ কাজকর্মের ভিত্তি প্রণয়নে সাহায্য করে। শিল্পকলা মানুষকে দেখায়, সে হল পারিপার্শ্বিক জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ আবার তার কাছ থেকে

নিজের নানা চাহিদা, লক্ষ্য, ভাবাদর্শ, জগতের প্রতি নিজ সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার দাবি জানায়। অন্যকথায়, মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের উপরে উঠিয়ে, তাকে সামাজিক-ঐতিহাসিকতার মুখোমুখি বসিয়ে শিল্পকলা তাকে বাস্তবতার দার্শনিক অনুধাবনের স্তরে উন্নীত করে। মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব ও তার সামাজিক-ঐতিহাসিক সত্তার মধ্যে শিল্পকলা বুঝি-বা মধ্যস্থতার কাজ করে।

শিল্পকলার সৃজন-শক্তি, তার বহুরূপী কর্মের ব্যাপার বিবেচনা করে এ ভোলা উচিত নয় যে, তা আপনা থেকে মানুষকে তার সামাজিক সারবস্তু সম্বন্ধে সুসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে না, বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগের সারকথার উন্মোচন ঘটায় না। বিশ্বের প্রতি নিজ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষের পক্ষে তার সঙ্গে জড়িত থাকার অনুভূতি, নিজের নানা সম্ভাবনা, নিজ **বিশ্বজনীনতার** সম্পদের শুধু অনুভূতিই যথেষ্ট নয়। কেননা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিশ্বজনীনতা প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত নয়, তার জন্য দরকার হয় মানুষের সব ক্ষমতাকে আকর্ষণ করার, সঞ্চিত জ্ঞানের গোটা সম্পদকে ব্যবহার করার, দরকার হয় শুধু অনুভূতির সংস্কৃতিই নয়, বরং চিন্তাধারার সংস্কৃতিও।

তাই শিল্পকলা ব্যক্তিত্বের আত্মিক বিকাশের সব কর্তব্যের সমাধান ঘটায় না। তা শুধু এসব ব্যাপারে সাহায্য করে, যেমন, নানা চাহিদার সঙ্গে বাস্তবতার অনুপাত রক্ষার। সাধারণের, নগণ্যের, রোজকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করার, অসংখ্য ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে সারবস্তু লক্ষ্য করার ক্ষমতা

তৈরি করা। শিল্পকলার প্রভাব এর মধ্যে নিহিত নয় যে, মানুষ একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে প্রস্তুত। যথার্থ শিল্পকলা মানুষকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য শিক্ষা দেয়, এবং এ ক্ষেত্রে তা তাকে চৈতন্যোদয়ের, গণ-সম্মোহনের উপায়ের কাজ করে না।

তবে শিল্পকলার সাহায্যে অনুভূতি শিক্ষা মানুষ কর্তৃক নিজস্ব পার্থিব কর্তব্য বোঝায় সাহায্য করে শুধু সে ক্ষেত্রে, শিল্পকলা যদি লোকজনের উপর প্রভাব বিস্তারের একমাত্র হেতু না হয়। অন্যথায় সাহিত্যিক আবেগের 'বিমূর্ততার' দরুন — যার জন্য কোন চিন্তাভাবনার দরকার নেই — মানুষের প্রকৃত ক্রিয়াকলাপের সারবস্তুর সঙ্কোচন, ব্যক্তিত্বের নানা আগ্রহ মায়ার জগতে স্থান দিতে পারে।

মানুষের সাধারণ নানা আবেগ ও শিল্প রচনাবলীর দ্বারা উদ্ভূত আবেগগুলিকে কেন এত ঘন ঘন একেবারে বিপরীত বলে গণ্য করা হয়? সত্যিই তো, থিয়েটারে যেসব ঘটনা সয়ে আমরা আনন্দ উপভোগ করি, রোজকার জীবনে সেগুলিই রাগ ও ক্ষোভ জাগাতে পারে, তাহলে কি মানুষের সাধারণ নানা অনুভূতি ও থিয়েটারে দর্শকদের মনে-জাগা অনুভূতিগুলি ষোলআনা বিপরীত ধরনের? এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পকলা মানুষকে বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত করে না, বরং উল্টো : মানুষের সাধারণ অনুভূতিগুলি সেই সোপানের শুধু ধাপগুলিই তৈরি করে, যা গেছে **অনাগ্রহী উপভোগের** জগতে।

তবে স্মরণ করা যাক, বিশ্বের প্রতি নান্দনিক সম্পর্কে 'অনাগ্রহ' — এটা সার্বজনীন আগ্রহ প্রকাশের বিশেষ এক ধরন মাত্র। শিল্পকলা দ্বারা অনাগ্রহী উপভোগের অর্থ

কখনই মানুষের সব অনুভূতির সঙ্গেই নয় বরং মানুষের নানা চাহিদা, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও ফাটলসৃষ্টি। থিয়েটারের অশ্রু — ভন্ড অশ্রু নয়, বরং ষোলআনা প্রকৃত মর্মপীড়া। নান্দনিক আবেগ — এ সেই মানুষেরই আবেগ, তবে 'রূপান্তরিত' ; এ হল অনুভূতির সম্প্রসারণ ও গভীরতাসাধন, তার সৃজনধর্মী পুনর্গঠন। এ হল সেই আবেগ, যা ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা পর্বে সঙ্গ দেয়, সঙ্কীর্ণ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার জগৎ থেকে মানুষকে নিয়ে আসে সামাজিক জগতে। সাধারণ আবেগের থেকে পার্থক্যস্বরূপ নান্দনিক আবেগে আছে নিজের নানা অনুভূতির লক্ষ্যবস্তুর বিশালত্বের ব্যাপারটি মানুষ কর্তৃক টের পাওয়া। আর প্রকৃতপক্ষে সে শুধু তার ব্যক্তিগত নয়, বরং সার্বজনীন স্বার্থাদির সঙ্গে জড়িত সবকিছু সওয়ার ক্ষমতা উপভোগ করে। যেমন, আতঙ্কের অনুভূতি বিষাদজনক বিশ্ববোধের আকার নেয়। সাদামাটা যোগদান, সহযাতনা রূপান্তরিত হয় গোটা জীব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত আকার অনুভূতিতে। ভয়, অবাক-হওয়া, নতজানু-হওয়া রূপ বদলে ঘটমান সবকিছুর মহত্ত্বের অনুভূতি, ইত্যাদি ধারণ করে। তদ্দ্বারাই অনুভূতি শিক্ষা প্রক্রিয়া শিলপকলার সাহায্যে এবং চেতনাজনিত **কর্ম সম্পাদন** শিলপকলার অন্য এক অধিকতর সাধারণ কর্তব্যের — বিশ্ববীক্ষা গঠন — গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক, অত্যাবশ্যক নানা পর্ব হয়ে ওঠে। আর তাই নিজের মধ্যে সুউচ্চ বিশ্ববীক্ষাজনিত সারবস্তু ধারণ করে শিলপকলার রচনা বিশ্ববীক্ষার 'ব্যক্তিত্বজনিত' উপাদানগুলি গঠনে সাহায্য করে। আর তার মাধ্যমেই বিশ্ববীক্ষার তাত্ত্বিক

হারের সারবস্তুর উপর প্রভাব ফেলে।

শিল্পকলার মহান রচনাগুলির প্রতি নজর দিয়ে মানুষ এসব সমস্যার শুধু মীমাংসাই করে না, যেমন, মানুষ ও প্রকৃতি অথবা 'ব্যক্তিত্ব ও সমাজ', 'ব্যক্তিত্ব ও কর্মিদল' ; সে এসব ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করে — প্রকৃতির সঙ্গে 'খোদ আমার' সম্পর্কটি কেমন, কর্মিদলের সদস্য রূপে 'আমি' কেমন, সাধারণভাবে মানুষ রূপেই-বা 'আমি' কেমন। তদ্দ্বারাই সামাজিক অবস্থান থেকে সে নিত্য নিজের মূল্যায়ন করে, সমাজের নানা চাহিদার সঙ্গে নিজের চাহিদাগুলির অনুপাত মাপে। শিল্পকলা জগতের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক উপলব্ধির জায়গা দখল করে না, বরং উল্টো — চিন্তাভাবনার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। মানুষ কর্তৃক বিশ্বের সঙ্গে তার সজীব যোগাযোগটি, নিজের সমৃদ্ধ চেতনামূলক ও ব্যবহারিক-পুনর্গঠনজনিত সম্ভাবনাগুলি অনুভব করে তাকে সেগুলি বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

সুতরাং, শিল্পকলা সেই বহিরাকৃতি নয়, সাধারণ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতাবস্থানগুলি আয়ত্ত করতে যা সাহায্য করছে, নয় খোসা আর 'বনজঙ্গলও', বিশ্ববীক্ষা-জনিত ব্যবস্থার সহভবনগুলি নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেগুলি সাফ করা যায়।

সোভিয়েত লেখক ও সাহিত্যবিদ ভ. স্কলোভ্স্কির রূপক বাক্য ব্যবহার করে বলা চলে, শিল্পকলা হল *এক ধরনের 'জড়ানো ফিতে'*, যা টেনে বেঁধে জড়িত করেছে দুই বিপরীত প্রান্তকে — মানুষ ও পারিপার্শ্বিক জগৎকে। বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার এবং একই সময়ে —

তার থেকে দূরত্বের অনুভূতির ফলে জন্মায় নিজ বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা, যা সুনির্দিষ্ট নানা সামাজিক কর্তব্য উত্থাপনে হাজির থাকে।

মহান শিল্পকলা উপভোগ করে মানুষ শুধু ক্ষনিকের জন্য নিজেকে স্বাধীন, মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বজনীন অস্তিত্ব রূপে অনুভব করে ; শিল্পকলা — 'আনন্দের প্রতিশ্রুতি' মাত্র, স্বাধীনতার স্বপ্ন মাত্র, তার ভাবমূর্তি, যথার্থ স্বাধীনতা নয়, যা অর্জন করা যায় শুধু সামাজিক-পুনর্গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে। সময় সময় মানুষের অসীম নানা সম্ভাবনা, স্বাধীনতা, বিপুল সৃজন-সম্ভাবনাকে — শিল্পকলা দ্বারা প্রাপ্ত — গ্রহণ করা হয় মানুষের যথার্থ বিশ্বজনীনতা রূপে। এ ক্ষেত্রে শিল্পকলাকে গ্রহণ করা হয় মূল উপায় রূপে, যা ব্যক্তিত্বের অখন্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সুনিশ্চিতি দেয়। তবে এ পথে আমাদের বিরুদ্ধে বেশকিছু বিপদ আছে। রুশ বিজ্ঞানী, শল্য-চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ন.ই. পিরগোভ লিখেছেন, 'শিশু ও উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিল্পকলার সঙ্গে, বিশেষত নাট্য-শিল্পের সঙ্গে অপরিমিত ও লক্ষ্যহীন সংস্পর্শের দরুন দম্ভ, 'শশব্যস্ততা' বিকাশে, 'হওয়ার' চেয়ে বেশি 'মনে হওয়ার' প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে।'

প্রায়ই লেখা হয়, শিল্পকলা এক বিশেষ 'দ্বিতীয় বাস্তবতা' সৃষ্টি করে। তবে না-তৈরি মানুষের পক্ষে শিল্পকলার এই 'দ্বিতীয় বাস্তবতা' তার আকর্ষণ-ক্ষমতার দরুন মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই যোগ করা দরকার : সাহিত্যিক ভাবমূর্তিগুলির জগৎ, 'দ্বিতীয়' বাস্তবতা —

লক্ষ্যের জন্য লক্ষ্য নয়, বরং অবজেকটিভ বাস্তবতার নতুন নতুন দিক, সীমারেখা উন্মোচনের উপায় মাত্র।

শিল্পকলার প্রভাব ভাবাদর্শজনিত ও নৈতিক শিক্ষা থেকে, মানুষের সংস্কৃতি সম্পদ আয়ত্ত করার গোটা জটিল প্রক্রিয়া থেকে অবিচ্ছেদ্য। তার কল্যাণে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ও আজকের দিনের নানা ব্যাপারকে ঘনিষ্ট ও ব্যক্তিত্বজনিত রঙদান করা সম্ভব হয়, নিজের নানা চাহিদা, লক্ষ্য, আদর্শের সঙ্গে মানবজাতির আদর্শের অনুপাত রক্ষা করতে, সইতে সাহায্য করে। বাস্তবতার প্রতি নান্দনিক সম্পর্ক গড়ে শিল্পকলা বিশ্ববীক্ষার এক 'ব্যক্তিত্বজনিত স্তর' গঠন করে, যা তার নৈতিক, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদানগুলির সঙ্গে নিত্য পারস্পরিক প্রভাবাধীন থাকে। উল্লিখিত সবকিছুর অর্থ, শিল্পকলা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে দার্শনিক চিন্তভাবনায় মগ্ন করায় এবং একই সময়ে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত দার্শনিক জ্ঞান 'সইতে' সাহায্য করে।

শিল্পসৃষ্টি ও দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার মধ্যে নিবিড় পারস্পরিক প্রভাবটি গণ্য করা আজকাল বিশেষ জরুরী। আধুনিক শিল্পকলা তার সর্বশ্রেষ্ঠ নানা প্রকাশে আরও বেশি **বিশ্ববীক্ষার** বিচারে **ভরপুর** হয়ে উঠছে। আধুনিক শিল্পকলার এই বৈশিষ্ট্য কোনমতেই এর প্রমাণ নয় যে, তা নিজের বিশেষত্ব খোয়াচ্ছে। বরং উল্টো ; বিশ্বের প্রতি মানুষের সম্পর্ক, তার সমগ্র জটিলতা ও *বৈপরীত্য সহ — এই হল শিল্পসৃষ্টির মূল বিষয়*। যেমন শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্রে, তেমনই নানা দার্শনিক মতধারার কেন্দ্রে — যদিও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন

ক্ষেত্রে — রয়েছে সেইসব সমস্যা, যেগুলি জড়িত হল মানুষের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি তার সম্পর্কটি উন্মোচনের সঙ্গে। আধুনিক যুগে শিল্পজনিত ও দার্শনিক উপলব্ধির বিষয়গুলির ঘনিষ্ঠতা হল সেগুলির নিবিড় পারস্পরিক প্রভাবের ভিত্তি। আমাদের যুগের সামাজিক ঘটনাবলীর বিপুল পরিসর, ভাবাদর্শগত ভরপুর অবস্থা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাবের দরুন দার্শনিক সমস্যার প্রতি শিল্পীর নজরদান অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পকলার উচিত দর্শনের পাঠ্যপুস্তকে রূপান্তরিত হওয়া, তার বিশ্ববীক্ষাজনিত ভরপুর অবস্থার পক্ষে যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত (deductivity) অজানা ব্যাপার।

দর্শন ও শিল্পকলার নিবিড় পারস্পরিক প্রভাবের প্রকাশ হতে পারে বিভিন্ন রকমের, তবে শিল্পকলা সর্বাগ্রে মানুষের বিশ্ব-অনুভূতি বিকাশে মানবিক আত্মার অগ্রগতিতে সাহায্য করে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি হল এই ধরনের শিল্পকলার নমুনা। দর্শনের থেকে পার্থক্যস্বরূপ শিল্পকলা ফলাফল নয়, বরং জীবনের দার্শনিক উপলব্ধির খোদ প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করে তার নিজস্ব স্বকীয়তা, অসম্পূর্ণতা ও বৈপরীত্য সহ। এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে আধুনিক শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ই. স্‌ভেভোর 'জেনোর আত্মচেতনা' অথবা ম. ফ্রিশের 'স্টীল্লেরার' কথা স্মরণীয়।

আধুনিক শিল্পকলার বিশ্ববীক্ষাজনিত ভরপুর অবস্থা ফুটে ওঠার অন্য এক ধরন — গুরুতর দার্শনিক,

নৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাদির উত্থাপন। সময় সময় শিল্প রচনা এক উন্মুক্ত রূপক সৃষ্টি হয়ে ওঠে, যার আড়ালে থাকে জটিল বিশ্ববীক্ষাজনিত সমস্যা। এ ক্ষেত্রে শিল্পকলা ও তাত্ত্বিক বিশ্ববীক্ষার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে। শিল্পকলা ও দর্শনের মধ্যে সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে। ব্রেখ্‌ট লিখেছেন, 'বিজ্ঞানের যুগে নাটক দ্বান্দ্বিকতাকে উপভোগে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।'* নিজের নানা ধারণাকে সাহিত্যিক ভাবমূর্তির আকার দিয়ে দর্শনের কাছে আজ বহুকাল হল বর্ণনার উজ্জ্বল আকার জানা ব্যাপার। প্রসঙ্গত প্লেটোর 'কথোপকথন' অথবা বেকনের দার্শনিক রচনাবলী স্মরণ করা যেতে পারে। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের বহু কাজ সুউচ্চ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন। তাই আধুনিক সুইশ লেখক ফ. ডিউরেনমাট্টের এ উক্তি ভিত্তিহীন নয়: দর্শন হল মহান গদ্য সাহিত্যের অনুরূপ।

অবশ্যই, এমন নিবিড় ঘনিষ্ঠতারও নিজস্ব সীমারেখা আছে। শিল্পী শুধু সমস্যা উন্মুক্ত করে, তা সমাধানের নিজস্ব পথের প্রস্তাব দিতে পারে, তবে তার মত প্রমাণ করার খোদ প্রক্রিয়ার অবস্থান তাঁর রচনার গণ্ডির বাইরে। অন্যথায় আমরা বলতে পারি দার্শনিক রচনার শুধু সাহিত্যিক গুণাগুণের কথা, কোনমতেই শিল্পকলার দার্শনিকতার কথা নয়।

এবং পরিশেষে, আধুনিক শিল্পকলার বিষয়বস্তুতে

---

* ব্রেখ্‌ট ব.। নাটক: ৫ খণ্ডে, মস্কো, ১৯৬৫, খঃ ৫/২, পৃঃ ৯১ (রুশ সংস্করণ)।

আরও ঘন ঘন পরিণত হচ্ছে খোদ শিল্পকলা, শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া, শিল্পকলা ও জীবন, শিল্পকলা ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ। টমাস মানের 'ডক্টর ফাউস্টাস' ও আধুনিক লাতিন আমেরিকান লেখক খ. কোর্তাসারের রচনাবলী — সৃষ্টির আত্মবিকাশের নানা পথ ও ধরনের ব্যাপারে শিল্পীর চিন্তাভাবনার দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ওঠে : মানুষের উপর শিল্পকলার আবেগজনিত প্রভাব কমিয়ে তার জায়গায় শিল্পকলার দার্শনিকতা বৃদ্ধির ফলে তার শিক্ষাজনিত ফলপ্রসূতা কি কমে না? কেননা এমন শিল্পকলা — মানসিক ক্রিয়াকলাপের যুক্তিসিদ্ধ কাজ প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় করে — নিত্য 'দ্বিতীয় বাস্তবতার' মায়াকে নিজেই ধ্বংস করে, আর তা একই সময়ে শিল্পকলা ও বাস্তবতাকে অতি সরলভাবে সদৃশ করার কাজকে এড়ানোয় সাহায্য করে। সাহিত্য রচনার কোন নায়কের মুখে বলা জটিল দার্শনিক ধারণা আর বৈজ্ঞানিক রচনায় সেই একই দার্শনিক ধারণা পাঠকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতির দাবি জানিয়ে তার চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টা তর্কের কঠোর যুক্তি দ্বারা, নানা তথ্য সংগ্রহ করে, ইতিমধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের নানা ধারণার সত্যতা প্রমাণ করা হলে, অবজেকটিভ বাস্তবতার সঙ্গে শিল্প রচনার যোগাযোগ আগে থেকে দেওয়া থাকে না, তা প্রতিষ্ঠা করা উচিত খোদ পাঠকের (দর্শকের, শ্রোতার)। আর শিল্প রচনার উপাদান রূপে দার্শনিক ধারণা পাঠকের কাছে দাবি জানায় তার স্বাধীন তুলনা করার

জন্য, আর তা যেমন নিজের নানা নিজস্ব ভাবাদর্শের সঙ্গে, তেমনই অবজেকটিভ বাস্তবতার সঙ্গে। এ প্রক্রিয়ায় যোগ দেয় ব্যক্তিত্বের আত্মিক জগতের সব 'স্তর' : আবেগ ও বুদ্ধিজীবীজনিত ক্ষমতা, জ্ঞানের গভীরতা ও বিশালতা, নৈতিক অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধজনিত স্থিতিবোধ, দার্শনিক সংস্কৃতির মান ও বিশ্ববীক্ষা। বাস্তবতা আয়ত্তে আনার এইসব বহুরূপী ধরন, পদ্ধতির শুধু বিকাশ ঘটিয়েই মানুষ সামাজিক সম্পদ 'দখল' করতে, সামাজিক সম্পর্কসমূহের গোটা যোগফলের যথার্থ ধারক-বাহক হয়ে উঠতে পারে।

সাধারণত শিল্পকলার নৈতিক ফলপ্রসূতাকে জড়িত করা হয় এর সঙ্গে যে, তা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলাদা মানুষের গুণের উপর, এবং তদ্দ্বারাই 'জিনিসপত্রের প্রলোভন' অতিক্রম করতে সাহায্য করে। তবে শিল্পকলার নৈতিক তাৎপর্য অধিকতর গভীর এবং ততটা একার্থক নয়। জিনিসপত্রের জগতের প্রতি, বস্তুর জগতের প্রতি সম্পর্ক ও লোকজনের প্রতি সম্পর্কের প্রতিতুলনা করা চলে না। এও ভোলা উচিত নয় যে, লোকজনের মেলামেশাকে কখনই সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগের পর্যায়ে ফেলা চলে না। মার্কস লিখেছেন, 'জগতের প্রতি তার **মানবিক** সম্পর্কসমূহের প্রত্যেকটি হল...নিজের **বস্তুগত** সম্পর্কে অথবা **বস্তুর** প্রতি নিজের সম্পর্কে, শেষোক্তটি দখল করা।'* প্রায়ই জীবনে অন্য

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৪২, পৃঃ ১২০ (রুশ সংস্করণ)।

মানুষের প্রতি আমাদের সম্পর্ক হয় তাকে জিনিসপত্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনে, তার মধ্যে একপেশে কর্ম-তৎপর চারিত্রিক বিশিষ্ট্যাদির প্রকাশ ঘটায়, নয় সে আমাদের নিজস্ব নানা চিন্তা, আকাঙখা, গঠন-ব্যবস্থার শুধু অভিক্ষেপণ, প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। তখন তার মধ্যকার 'অন্য' সবকিছু অন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাকে বোঝার, স্পর্শ করার ব্যাপারে, তার দৃষ্টিকোণে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আগ্রহ, প্রচেষ্টা জাগায় না। আর অন্যদের মধ্যে আমরা 'শুনি' শুধু নিজেদেরই — নিজেদের পুরো সীমিতাবস্থায়, প্রায়োগিকতায়, সুনির্দিষ্টতায়, 'আজকের জীবনে'।

লোকজনের প্রতি, নিজের প্রতি আগ্রহ নিবিড়ভাবে জড়িত মানুষের জিনিসপত্রজনিত — ক্রিয়াকলাপের সারবস্তুর সঙ্গে। মানুষ যদি জিনিসপত্রের মধ্যে শুধু অতীতের প্রজন্মগুলির প্রচেষ্টাকে, জিনিসপত্রে মানুষের নৈপুণ্যের উন্নতি ঘটানোর সম্ভাবনাকে দেখে, জিনিসপত্রে সে যদি শুধু বস্তুভিত্তিক মানবিক ক্ষমতাকে দেখতে সক্ষম — তাহলে শুধু তখনই লোকজনের প্রতি তার সম্পর্কে তার 'বংশগত' সারবস্তু চাক্ষুষ হয়। শিল্পী যদি নিজের রচনার মাধ্যমে বস্তুর জন্য মানুষকে না ভোলার আহ্বান জানান, তাহলে তার অর্থ কখনও এই নয় যে, বস্তুর প্রতি আগ্রহ, তা উপভোগ করার, তাতে শুধু কাজের প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি দেখার এবং তাকে শুধু নিজের ব্যবহারিক চাহিদাপূরণের লক্ষ্যবস্তু করে তোলার ব্যাপারটি আমাদের অস্বীকার করা উচিত। ঠিক বরং উল্টো। বস্তুর মধ্যে তার 'মানবিক' সারবস্তুটি দেখতে শিল্পকলা

সাহায্য করে, আর তা, যতটা মনে হয়, ততটা সহজ নয়।

ইতিহাসের আদি পর্বে, বাস্তবতা আয়ত্তে আনার পুরাণজনিত পদ্ধতির গন্ডিতে মানুষ বস্তুকে গ্রহণ করেছিল বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগের গোটা সমষ্টিতে, তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একাকার ভাবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করার এই 'প্রাথমিক' সম্পূর্ণতা ভেঙে চুরমার হচ্ছে, কর্মপালনের সন্তুষ্টির সাদামাটা অনুভূতি আর মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণতার প্রকাশ রূপে থাকছে না। বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ, একতার অনুভূতি শিথিল হচ্ছে। এই সম্পূর্ণতার ক্ষতিপূরণের জন্য এক বিশ্বজনীন উপায়ের কাজ বিজ্ঞান নিজেও করতে পারছে না। নানা জিনিস ও প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন উপাদানকে বিজ্ঞান 'আলাদা' করছে, আর তা সেগুলিকে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মসিদ্ধ রূপদান করে। উপর-উপর, মানুষের 'প্রায়োগিক' চেতনার জন্য জিনিস আত্মপ্রকাশ করে নানা অর্থের সমষ্টি রূপে, যেগুলির উদ্দেশেই মানুষ দিকনির্ণয় করেছে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। জিনিস 'আপনা থেকে' নিজের অসংখ্য কর্মে মিশে গিয়ে বুঝি-বা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

মানুষের পক্ষে জগতের — যা রূপান্তরিত হচ্ছে 'নানা দিকচিহ্ন ও লিখিত নির্দেশাবলীর' জগতে — অখন্ডতা ও গভীরতার অনুভূতি খোয়ানোর বিপদ সম্বন্ধে *মানবিক স্থিতিবোধসম্পন্ন চিন্তাবীর* ও *শিল্পীরা* বারংবার লিখেছেন। এই সমস্যা বিশেষ তীব্র হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রখর বিকাশের

যুগে। প্রকৃতিব সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ও তার অখন্ডতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা আলোচিত হয়েছে সেই শিল্পকলায়, মানুষের প্রাণের যুক্তিনির্ভর শক্তির কাছে যা আবেদন জানিয়েছে। মানুষের নানা 'সামাজিক বন্ধন' থেকে তাকে মুক্ত করার ক্ষমতা, প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হওয়ার ক্ষমতা মুক্তির, তথা তার উজ্জ্বল 'দিনের আলোর' বিপরীত ধরনের কিছু প্রদান করে : 'রাতে যুক্তি নিদ্রামগ্ন থাকে এবং বস্তু তার স্বআকারে হাজির থাকে। যা সত্যি সত্যিই জরুরী, তা অখন্ডতা অর্জন করে দিনের বিধ্বংসী বিশ্লেষণের পর। মানুষ পুনরায় নিজ জগতের টুকরো খন্ডগুলি জোড়া লাগায় এবং পুনরায় এক শান্ত বৃক্ষ হয়ে ওঠে।'*

কর্মমুখর জীবনের প্রবল ধারায় প্রচন্ড পরিমাণ বস্তু সহ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার দরুন যেমন জনতার — যার অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে চাহিদার বিচারে পার্থক্য বিদ্যমান — চেতনায় বস্তুর প্রায়োগিক সমীকরণের স্বকীয় এক ফল দেখা দেয়। শিল্পকলার মধ্যে রূপায়িত জিনিসের প্রতি সম্পর্ককে ব্যবহারিক-পুনর্গঠনজনিত ও চেতনালাভজনিত সম্পর্ক থেকে পৃথকীকরণ খোদ বস্তুর পরিসরেই সঙ্কীর্ণ করে, যার ফলে নান্দনিক অথবা সাধারণভাবে আবেগজনিত অনুভূতির উদ্রেক ঘটতে পারে। দেখা দেয় বুঝি-বা এক ধরনের বিশেষ বস্তুজনিত, মানবিক অনুভূতি দ্বারা উষ্ণ পরিবেশ,

---

* সেণ্ট-একজুপেরি আ., দে। নৈশ উড্ডয়ন, ইত্যাদি। মস্কো। ১৯৭৯, পৃঃ ১৫৮ (রুশ সংস্করণ)।

যা বিচ্ছিন্ন বস্তুজনিত পরিভোগী মূল্যাদির গুরুভার থেকে, বাস্তবের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপে আধুনিক মানুষ যার সদ্ব্যবহার করে। তাই পুরনো বস্তুগুলি — বহু প্রজন্মের উষ্ণতায় উত্তপ্ত, যা বহন করছে তাদের নানা অভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস, ইত্যাদি — অতীতের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এই অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। সেই আমাদের পিতামহদের জন্য ছিল 'বাড়ি', ছিল 'কূয়ো', তাদের পরিচিত মিনার, আর শুধুই তাদের নিজস্ব পোষাক, নিজস্ব ওভারকোট ; এ সবেরই সংখ্যা ছিল সীমাহীনভাবে বড়, সীমাহীনভাবে অধিকতর ঘনিষ্ঠ। প্রায় প্রতিটি বস্তুই ছিল পাত্রস্বরূপ, যা থেকে তারা মনুষ্য ধরনের কিছু বের করে নিত, যাতে মনুষ্য জাতীয় কিছু সঞ্চয় করত...। আমাদের জীবনে স্থানলাভ করা, প্রাণমণ্ডিত, আমাদের সঙ্গী স্বরূপ নানা বস্তু বুঝি আর সরছে না এবং তাকে আর কিছু দিয়েই বদলানো যায় না। আমরা মনে হয় শেষ লোক। যারা এমন বস্তুর কথা জানত।'

তবে আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সুপ্রাচীন বস্তু সবার মধ্যেই জগতের সঙ্গে, অতীতের সঙ্গে একাত্ম অবস্থার অনুভূতি জাগায় না। উল্টে বরং এ মতেরই চল অনেক বেশি : **বস্তু** বুঝি-বা **আপনা থেকে** তার অধিকারীকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদানে সক্ষম, বস্তুর মধ্যে যা কিছু সুপ্ত, তার সবই বুঝি-বা আপনা থেকে তার মালিকের সম্পদ হয়ে ওঠে। সুনির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে এই দাম্ভিক সম্পর্কের *দরুন এমন হতে পারে যে, খোদ বস্তু তার সমস্ত সুনির্দিষ্ট* অবস্থায় উধাও হয়, রয়ে যায় শুধু অধিকারের তথ্য, আর তা আত্মিক জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের চিহ্ন রূপে, আর

সোজা কথায় — খোলাখুলি নামযশের প্রকাশ, বস্তুর গভীর সামাজিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অনুপ্রবেশের বদলে তা শুধু অধিকারের প্রচেষ্টা।

জিনিসের জগতের প্রতি এমন সম্পর্ক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল পরিভোগী চেতনার, সঞ্চয় করার আদিম সহজাত প্রবৃত্তির পক্ষে, 'যখন **সব** দৈহিক ও আত্মিক অনুভূতির জায়গায় হয়েছিল এই **সব** অনুভূতির সাধারণ নিঃসঙ্গতা — **অধিকার** করার অনুভূতি।'* তবে অধিকার করার সাদামাটা অনুভূতি এবং পরিপূর্ণ ও সীমাহীন পারিপার্শ্বিকতার যুক্তিহীন অনুভূতিতে তা অতিক্রম করার প্রচেষ্টার মধ্যে সীমারেখাটি — প্রচণ্ড নড়বড়ে; 'বস্তুর যাদুতে' আশা রাখা, এ ধারণা যে, বস্তুর মধ্যে 'মানবিক' সবকিছুর নিজে থেকেই আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তা আমাদের মধ্যে 'মানবিক' সবকিছুর জাগরণ ঘটাবে বিশেষ আলোকপাতের, 'নিশ্চুপ থাকার' ইন্দ্রিয় অনুভূতির পথে, এবং পরিশেষে দেখা দেবে বস্তুর ব্যাপারে নিষ্প্রাণ সম্পর্ক।

বস্তুর প্রতি এমন এক সম্পর্ক প্রণয়নের সম্ভাবনা, যা কিনা তার মধ্যে **সামাজিক সারবস্তু** দেখাতে পারত, জগতের সঙ্গে নিজের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রত্যেক মুহূর্তে নিজের 'আমি'কে কায়েম করতে পারত, তা জড়িত ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে জগৎ অধিকারের ব্যাপারে 'মানবিক সীমাকে' হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাতে নিহিত বিপুল

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী। খঃ ৪২, পৃঃ ১২০ (রুশ সংস্করণ)।

সম্ভাবনাকে ও মানবজাতির সম্মুখস্থ কর্তব্যসমূহ বোঝার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে বস্তু তার আপন আকারে নয়, তার আলাদা আলাদা কাজের সমষ্টিতে, নিজের বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও নয়, বরং বস্তুর সমর্থক মানবজাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার, তার আচরণের বাস্তব ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে বস্তুতে যত বেশি মানবিক শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা নিহিত থাকে, তা ততই বেশি 'মানবিক ক্রিয়াকলাপ ক্ষেত্র' হয়ে ওঠে, বস্তুর সামাজিক সারবস্তুর প্রকাশ ঘটানোর জন্য ততই বেশি প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। শিল্পকলা অবশ্য এ সমস্যার পুরো মীমাংসা ঘটায় না। মনুষ্য সংস্কৃতির সম্পদের অধিকারী হবার জন্য তা আমাদের চেতনা, আমাদের অনুভূতি প্রস্তুত করে মাত্র।

৫। মানবিক ভাবমূর্তি

আমরা দেখছি যে, তেমন এক 'সমৃদ্ধ' ব্যক্তিত্ব শিক্ষাদানের জন্য বিশ্বজনীন কোন উপায় নেই, যে কিনা নিজের মধ্যে শুষে নিতে পারত সেই সর্বোত্তম সবকিছু, মানবজাতি কর্তৃক যা সৃষ্ট হয়েছে তার ইতিহাসের বহু যুগ ধরে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ যত বেশি জটিল, বহুরূপী ও বিপুলায়তনের, তার বিকাশের পক্ষেও ততই বেশি সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়। প্রসঙ্গত জ্যাকব সম্বন্ধে বাইবেলের উপাখ্যান স্মরণ করা অতিরিক্ত হবে না, যে স্বপ্নে *পরীর সঙ্গে লড়েছিল ও পরাজিত হয়েছিল।* আমাদের নানা পরাজয় ও ভুলভ্রান্তি মানুষের সেই যুগ যুগের বিজ্ঞতারই কথা বলে, যেগুলি আমরা করি অসাধারণ

কঠিন নানা কর্তব্য পালন কালে, আর খুদে, 'পিপীলিকা সম' নানা কর্তব্য সমাধান কালে সহজ বিজয়লাভ করে আমরা যা পাই, সময় সময় তার থেকেও বেশি পাই সেসব পরাজয় ও ভুলভ্রান্তি করে। কমিউনিস্ট সমাজ গঠনই হল সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপ, যাতেই উন্মুক্ত হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতাসাধনের এক সুবিশাল প্রান্তর, যা 'গড়ে তুলবে' ভাবীকালের লোকজন, যার আগমন নিকটতর করতে যা সক্ষম।

শ্রম গড়ে তোলে সৃষ্টির ব্যাপারে লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়াস ও ইচ্ছাশক্তি, যৌথবাদ ও সৃজনী ক্ষমতা। খেলা অলীক কল্পনার বিকাশ ঘটায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায়, অন্য মানুষের, অন্য সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। শিল্পকলা 'দূরের' ও 'কাছের' লোকেদের সহানুভূতি জানানোর, একত্রে মর্মপীড়া সওয়ার বিশেষ পদ্ধতি শেখায়, স্বাধীন চিন্তা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। শিক্ষা চিন্তার খোরাক ও চিন্তার খোদ পদ্ধতি যোগায়, সফল শ্রমজনিত কাজকর্মের পটভূমির কাজ করে, মানুষের নানা খেল্-ক্ষমতা প্রকাশের জন্য জমিন তৈরি করে।

শিক্ষাকে শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে বোঝা উচিত নয়, যেমন, মূর্খতার বেড়া অতিক্রম করা। শিক্ষা হল 'মানবিক ভাবমূর্তি' অর্জন করা। সাংস্কৃতিক সমপদের সংস্পর্শে আসা এবং একই সময়ে — নিজেকে, সংস্কৃতির সম্পদ-ভাণ্ডার বহুগুণ করার নিজস্ব পথ খুঁজে পাওয়ার দক্ষতা।

'সর্বকর্মা' ভাবাদর্শের ইউটোপীয় চরিত্রের কথা আমরা আগেই বলেছি। 'সবজান্তা', 'সর্বদ্রষ্টার' ভাবাদর্শও কম ইউটোপীয় নয়। অধুনা প্রখরভাবে ঘটমান বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানের খণ্ড-বিখণ্ডতা প্রক্রিয়ার পরিস্থিতিতে একই সময়ে যেমন সাহিত্যবিদ, তেমনই রসায়নবিদ আর পদার্থবিদ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। ১৯শ শতাব্দীর রুশ সুরকার আ. প. বরোদিন একই সময়ে ছিলেন বিখ্যাত রসায়নবিদ। লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান ব. ভ. রাউশেনবাখ হলেন আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ আকাদেমির কার্যকরী সদস্য। তিনি আবার সুবিদিত প্রাচীন রুশ সংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য বৈজ্ঞানিক রচনার লেখক রূপেও। এমন বহুমুখিতা আমাদের শুধু আনন্দই দেয়। তবে তা হল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

শিক্ষিত মানুষ সে নয়, যে জানে ভাসা-ভাসা, 'মোটামুটি', অপেশাদারের মতো। শিক্ষিত মানুষ নিজের কাজ উত্তম অধ্যয়ন করতে বাধ্য, নিজ ক্ষেত্রে তার স্রষ্টা হওয়া উচিত। তবে কোন এক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার জন্য শুধু নিজের বিজ্ঞান জানা অল্প হয়। বংশবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা-পর্বে স্থানপ্রাপ্ত গ.মেন্দেল বংশ-পরম্পরতার নিয়ম আবিষ্কারের জন্য বহুলাংশে কৃতজ্ঞ নিজের পরিসংখ্যানবিদ বন্ধুর কাছে। নতুন সাধারণত সেখানেই দেখা দেয়, গবেষক যেখানে নিজের জ্ঞানক্ষেত্র, নিজ তত্ত্বের গণ্ডি পেরোতে সক্ষম। তবে এ সম্ভব মানবজাতি সঞ্চিত সাংস্কৃতিক সম্পদ-ভাণ্ডারে শুধু উত্তম স্থিতিবোধের কল্যাণে। অপেশাদার অবস্থা ও সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতা — এই দুই বিপদই বাধাস্বরূপ রয়েছে মানুষের নিজেকে 'শিক্ষিত করার' পথে। চেতনালাভের যেকোন মহলে প্রবেশ করার দক্ষতা থাকা তাই, মানবিক

কোনকিছুই শিক্ষিত মানুষের কাছে অজানা থাকা উচিত নয়।

'অজ্ঞানী বিজ্ঞানীর' — অপেশাদার অবস্থা ও সঙ্কীর্ণ বিশেষজ্ঞতা, ব্যক্তিত্বের উপর যার বিধ্বংসী প্রভাব সমান সমান — রূপক কাহিনী বলেছেন ১৭ শতাব্দীর বিখ্যাত চেক শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবীর ইয়া. আ. কোমেন্‌স্কি। কোন এক পর্যটক এসে হাজির হয়েছে নামকরা একদল বিজ্ঞানীর মধ্যে, যারা জ্ঞানার্জন করে আগে অজানা নানা পদ্ধতিতে : তাদের কাছে জ্ঞান — চিন্তা রোগের বিরুদ্ধে এক ধরনের ওষুধ, তাই তারা জ্ঞানার্জন করে ওষুধ খাবার মতো উপায়েই — উদরের সাহায্যে। আর একদিন হল কি, একজন এত বেশি জ্ঞান গিলল যে তা হজমই করতে পারে না। অন্যজন — বুনিয়াদি চেতনার সাধারণ রুটিতে ঘেন্না বোধ করে বাছল সবচেয়ে মার্জিত, 'সুস্বাদু' জ্ঞান। প্রাপ্ত জ্ঞান-দ্রব্য থেকে একদল নিজেরাই 'মধ্যাহ্নভোজ তৈরি' করে, অন্যদের প্রচেষ্টা কী করে অপরের 'খাবার' খাওয়া যায়। অন্যদের আকর্ষণ করল জ্ঞান-অন্নের ভিতরের সারবস্তু নয়, বরং চমৎকার আচরণ-ভঙ্গি, কাউকে সরবরাহ করা হয়েছিল পুরনো জ্ঞান। অন্যরা এমনকি জ্ঞানের বাক্স খুলেও দেখল না, বরং ব্যস্ত ছিল সে ধরনের অসংখ্য বাক্স সংগ্রহের ও অতিথিদের সেগুলি দেখানোর কাজে। কোমেন্‌স্কির মতে, অপেশাদার অবস্থা, সর্বদ্রষ্টা ও মূর্খতার অবস্থান পাশাপাশি। অসংখ্য জ্ঞান চিন্তা করতে শেখায় না। অথচ শিক্ষা হল ঠিক সংস্কৃতিতে স্বাধীনভাবে স্থিতিবোধের দক্ষতা, এ হল চিন্তা করার দক্ষতা, **চিন্তাধারার সংস্কৃতি**।

এ ছাড়াও শিক্ষা হল সর্বদাই এক প্রক্রিয়া। এর কোন শেষ বিন্দু নেই। এ হল মানুষের মধ্যে নিত্য হাজির এক চাহিদা। মানুষ যতদিন বাঁচে, ততদিন তার শেখা উচিত। সংস্কৃতিতে কোন সর্ট-কাট পথ নেই। এমন কোন যাদুর 'সোনার চাবি' নেই, যা কিনা জ্ঞানের রাজত্বের দরজা খুলতে পারে। মহান জাপানী শিল্পী হকুসাই (১৭-১৮ শতাব্দী) বলেছেন, ৬ বছর বয়সে তিনি বস্তুর আকার সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, ৭৩ বছর বয়সে পশু-পাখি-উদ্ভিদের গঠন-কাঠামো চর্চা করেন। আর শুধু ৯০ বছর বয়স নাগাদ তিনি আশা করছেন শিল্পকলার সারমর্মে ডুব দেবেন।

শিক্ষা হল অনুভব করার দক্ষতাও, এ হল **অনুভূতির সংস্কৃতি**। যেমন ধরুন, সেই শিল্পকলার রচনা আমরা কীভাবে উপভোগ করতে পারি, যদি তার সৃষ্টির সামাজিক-ঐতিহাসিক নানা শর্ত, তার বেড়ে-ওঠা, জমিনের কথাই না জানি? বিগত নানা যুগের বিশ্ববীক্ষার স্বকীয়তার কথা জানা না থাকলে মহান ইতালীয় চিত্রকর স. বতিচেল্লির আঁকা দান্তের 'ঐশ্বরিক প্রহসন' চিত্রটিকে অদক্ষতা রূপেই ব্যাখ্যা করা যায়, যেখানে নরকে চক্কর লাগানো দান্তে ও ভার্জিলকে একই আঁকায় কয়েক বার দেখান হয়েছে। মধ্যযুগীয় চিত্রকলার', তার প্রতীক-ধর্মিতার, উল্টোমুখী ভবিষ্যতের ব্যবহারের নিয়মকানুনের কথা জানা না থাকলে মহান রুশ আইকন-মূর্তির স্রষ্টা আ. রুভলিওভ ও *দিয়নিসিয়ের রচনাগুলিকে প্রশংসার* বদলে অবাক-করা মুচকি হাসির পাত্র হতে হয়। সোভিয়েত লেখক, কবি, অনুবাদক ইলিয়া এরেনবুর্গ নিজের স্মৃতিচারণ 'নানা

মানুষ, নানা বছর, জীবন'-এ এক ঘটনার কথা বলেছেন। অবরুদ্ধ রিপাবলিকান মাদ্রিদে সোভিয়েত সিনেমা 'চাপায়েভ' দেখানো হয়েছিল। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল অপ্রত্যাশিত : চাপায়েভের অনুগামীদের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে দর্শকবৃন্দ প্রকৃত জীবন ও শিল্পের বাস্তবতাকে পুরোপুরি এক করে রূপালী পর্দার উদ্দেশে গুলির ঝড় বইয়েছিল। এই সিনেমা দেখার পর নৈরাজ্যবাদের অনেক সমর্থক — যাদের কোনমতেই রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা যায় নি — ফৌজী শৃঙখলা মানতে শুরু করেছিল, যেহেতু সেই সিনেমায় তা ভঙ্গের দরুনই চাপায়েভকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তবে বিশ্বখ্যাত এই সিনেমার শিল্পজনিত সদগুণ প্রয়োজনীয় হারে গৃহীত হয় নি তার **শিল্পজনিত-নান্দনিক সংস্কৃতির** অভাবের দরুন।

ব্যক্তিত্বের **নৈতিক সংস্কৃতিও** কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার উদ্দেশে পথটি গেছে জ্ঞানের দেশের মধ্যে দিয়ে। আমাদের নৈতিক অনুভূতি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুষ্ট হয় মানুষের 'পবিত্র ও অস্পৃশ্য' জীবন হত্যার চেষ্টা করা হলে। তবে মানুষের দেহযন্ত্রে এমন হস্তক্ষেপকে, এমনকি পুনর্জন্মের খোদ প্রক্রিয়াকে, যেমন আলাদা আলাদা দেহযন্ত্রের ট্রান্সপ্লানটেশন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়রিং, ইত্যাদিকে কোন্ চোখে দেখা চলে? আলোচ্য ক্ষেত্রে 'নৈতিক' অথবা 'অনৈতিক' বলতে পারে শুধু সেই লোক, যে সামাজিক ও জৈবিক, সচেতন ও অচেতনের পারস্পরিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। তখনও কম জটিল সমস্যা দেখা দেয় না, যখন নৈতিক

অনুভূতির দৃষ্টিক্ষেত্রে সমাজের ন্যায় এমন জটিল লক্ষ্যবস্তু রূপে উপস্থিত হয়।

নানা নৈতিক মাত্রাবোধের অবস্থান থেকে সামাজিক বাস্তবতার মূল্যায়ন কালে মানুষের সর্বাগ্রে জানা উচিত, মূল্যায়ন-করা ঘটনা, মানুষের কাজকর্ম, সামাজিক ব্যাপারের রূপটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন! এই জানা বিনা প্রকৃত নৈতিক চেতনা গঠন অসম্ভব। এরই প্রমাণ — নানা নৈতিক মতাবস্থান থেকে পুঁজিবাদের সমালোচনা করার অতীতের অসংখ্য অসফল প্রচেষ্টা, যার মূলকথা ছিল এ হল 'অন্যায়ের সমাজ', যাতে 'সামাজিক চুক্তি' ভঙ্গ করা হয়েছে। এ সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল, যেহেতু পুঁজিবাদী জগৎ — এ হল অর্থনৈতিক, 'ব্যক্তিগত-বহির্ভূত' নির্যাতনের জগৎ। সামাজিক ন্যায় পুঁজিপতি কেন লঙ্ঘন করে, তা জানার জন্য নীতিবাদী হওয়াই সবকিছু নয়, বরং সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির এইসব বৈশিষ্ট্য জানা দরকার, যেমন, উৎপাদন, লেনদেন, বণ্টন, কেননা ঠিক এগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে সামাজিক অন্যায়ের কর্মপ্রণালী, ঠিক সেখানেই জন্মাচেছ উদ্বৃত্ত মূল্য — শ্রেণীজনিত বিরোধিতার অর্থনৈতিক ভিত্তি। মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের সাহায্য বিনা সমাজের মতো এমন জটিল বিষয়ের মূল্যায়ন করায় নৈতিক চেতনা সত্যিই শক্তিহীন।

আধুনিক সমাজের জটিল রাজনৈতিক জীবনে কীভাবে দিকনির্ণয় করা যায়, বৈদেশিক নীতির ধারা, রাষ্ট্রকে কীভাবে বোঝা যায়, রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজর স্থান খুঁজে পাওয়া যায়? কোন রকমের 'শ্রেণীজনিত

সহজাত প্রবৃত্তি' এখানে সাহায্য করবে না। পরিশেষে, দেশের জীবনের সব দিকের গণতন্ত্রীকরণের মতো জটিল প্রক্রিয়ার সঠিক মূল্যায়ন সোভিয়েত শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী কীভাবে করতে পারে ? উন্মুক্ততার নীতি ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে সুউচ্চ **রাজনৈতিক সংস্কৃতির** দাবি জানায়। 'অশিক্ষিত মানুষ থাকে রাজনীতির বাইরে, — লেনিন বলেছেন। তার জন্য থাকে শুধু 'গুজব, রটনা, কল্পকথা, কুসংস্কার, তবে রাজনীতি নয়।'*

সুতরাং শিক্ষার যোগান উচিত চিন্তা পদ্ধতি, মূল্যায়নের মানদণ্ড, কর্মের ভিত্তি। সংস্কৃতিতে 'চলাফেরা করার' পদ্ধতির অধিকারী হওয়াই হল শিক্ষার সমন্বয়সাধক — ব্যক্তিত্বের **দার্শনিক সংস্কৃতির** মানদণ্ড। দার্শনিক সংস্কৃতি — এ হল গৌণ থেকে মুখ্যকে আলাদা করতে পারার দক্ষতা ; যেকোন ব্যাপারের দিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগোনর, তার উৎস ও সম্ভাবনা দেখার ক্ষমতা ; অধিকতর সুপ্রশস্ত মহনের ব্যাপারগুলির সঙ্গে আলোচ্য বস্তুর, প্রক্রিয়ার যোগাযোগ খোঁজা ; প্রত্যাখ্যানবাদের কবলে না পড়ে নিজের ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব পোষণ করার গুণ।

এমন ব্যক্তিত্বের কাছে অতীত, তার **নিজের** অতীতের মতোই উন্মুক্ত, মানবজাতির লক্ষ্যাদির ব্যাপারে সে চিন্তাভাবনা করে ঠিক নিজের ব্যক্তিগত কর্তব্য ভেবে। বিশ্ব সংস্কৃতি দ্বারা সৃষ্ট সর্বোত্তম সবকিছুই এমন ব্যক্তিত্বের

---

* লেনিন ভ. ই.। সংগৃহীত রচনাবলী, খঃ ৪৪, পৃঃ ১৭৪ (রুশ সংস্করণ)।

কাছে উন্মুক্ত থাকা উচিত। লোকজনের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ততা, শিল্পকলার আত্মবিস্মৃত উপভোগ ও নিজ জনগণের ভাগ্যের জন্য দায়িত্ববোধ, সৃজনমূলক শ্রমের আবশ্যিকতা ও বিশ্রাম করার দক্ষতা, বিতর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখার ক্ষমতা ও নিজের ভুল দেখার দক্ষতা। শুধু এমন ব্যক্তিত্বই মানবজাতির সম্মুখস্থ সুবিশাল কর্তব্যগুলিকে উপলব্ধি করার পর্যায়ে উঠতে এবং সেগুলির বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশ নিতে সক্ষম।

৬। ইতিহাস এবং আমরা

ইতিহাস হল সেইসব মানুষের ইতিহাস, 'যাঁরা ইতিহাস তৈরি করেন', নিজের নানা লক্ষ্য অনুসরণকারী মানুষের ক্রিয়াকলাপ, সময়ের সঙ্গে লোকজন সম্বন্ধে বিজ্ঞান, অতীত সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান। মানবজাতির ইতিহাস কী দিয়ে গঠিত হয় — আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের নাকি জনসাধারণের কাজকর্ম দ্বারা?

সিজার, চেঙ্গিস খাঁ, ক্রোমওয়েল — এঁদের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। কিন্তু লেগিওন ফৌজ ছাড়া সিজারের, নৌকর বাহিনী বিনা চেঙ্গিস খাঁর 'লৌহদিক' সেনা বিনা ক্রোমওয়েলের কি কোন তাৎপর্য ছিল?

তবে এমনকি তখনও, নেতা ও সেনাপতিদের সঙ্গে *ছিল যখন জনগণ, সব সময় তারা সাফল্যের মুখ দেখে* নি। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার দেশপ্রেমিকরা কেন বিজয়লাভ করেছিল, আর চে গেভারার বৈপ্লবিক

বাহিনী কেন বলিভিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছিল?

প্রাচীন যুগের ইতিহাসকার — 'ইতিহাসের জনক' হেরদোত, ফুকিদিদা ও পোলিবিয়, লিভিয় ও নেস্তোর থেকে শুরু করে এবং আধুনিক যুগের কিছু সংখ্যক ইতিহাসকার পর্যন্ত এসে দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন সমাধান লাভ করেছে সুমহান নানা ব্যক্তিত্বের পক্ষে। এই মতাবস্থান সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে রূপলাভ করেছে ইংরেজ দার্শনিক, লেখক ও ইতিহাসবিদ টি. কার্লাইলের সৃজনকর্মে, যাঁর মতে, বিশ্ব ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে হল মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস, তাদের কর্মকে কার্লাইল বিবেচনা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাণ রূপে এবং সাহসী নেতা ও অন্ধ, কাপুরুষ ভীড়ের মধ্যে স্বাভাবিক খাদ খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে একের ওপর অন্যদের রাজ হল 'বীরদের' নৈতিক ও মানসিক প্রাধান্যের পরিণাম। সমাজকে তিনি বিভক্ত করেছেন শাসক উচ্চমহল ও জনতা, প্রভু ও দাস, অভিজাত সম্প্রদায় ও নিচু মহলের মধ্যে। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়েছেন জার্মান দার্শনিক ও কবি ফ. নীৎসে, 'সুপারম্যান', রাজ করার ইচ্ছাশক্তিতে ভরপুর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের একনায়কত্ব সংক্রান্ত শিক্ষার স্রষ্টা। ব্যক্তিত্বের 'উপর মহল' সংক্রান্ত তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন রুশ জনপন্থীরাও — পিওতর লাভরোভ, পিওতর ত্কাচোভ, নিকোলাই মিখাইলোভ্স্কি। ত্কাচোভের মতে, 'ইতিহাসের স্নায়ু, প্রাণ' নির্ধারিত হয় স্নায়বিক অবস্থা দ্বারা, আর তা স্বল্পোবুদ্ধিজনিত, ব্যক্তিত্বের প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা। লাভরোভের মতে, সমাজের ইতিহাস নির্ভর করে আলাদা আলাদা

‘বীবনায়কদের’ ইচ্ছাশক্তির উপর, যারা নিজেদের সঙ্গে ভিড় নিয়ে চলে। মিখাইলোভ্স্কি তাঁর ‘বীরনায়ক ও ভিড়’ রচনায় মুখ্য ভূমিকায় বসিয়েছেন ব্যক্তিত্বকে, ‘বীরনায়ককে’, ইতিহাসের স্রষ্টাকে, যে নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভিড়কে কীর্তি ও অপরাধে আকর্ষণ করতে সক্ষম, — এই মতাবস্থানের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল ব্যক্তিগত সন্ত্রাস। ইতিহাসে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে চির সংঘর্ষ, একদিকে নির্যাতন ও অধিকারহীনতা এবং অন্যদিকে শাসন-ক্ষমতা, রুশ দার্শনিক-অতীন্দ্রিয়বাদী নিকোলাই বেরদিয়াভের মতে, — এর দ্বারাই গঠিত হয়েছে মানবজীবনের ট্র্যাজেডি।

ব্যক্তিত্বের ‘উপরি মহলের’ তত্ত্বকে অতিক্রম করে, ব্যক্তিত্বের বিকল্প সমাজ, তা ভুল মনে করে রুশ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বেলিনস্কি, গেরৎসেন, চের্নিশেভ্স্কি, দব্রলিউবভ এই মত পোষণ করতেন, যা অনুসারে ব্যক্তিত্বের কীর্তির কথা ভোলা চলে না, যেমনটি ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকাকেও অপমূল্যায়ন করা চলে না। দব্রলিউবভ ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে তুলনা করেছেন বারুদ-বিস্ফোরিত স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা চলে বিখ্যাত ফরাসী ইতিহাসকার টেরি, গিজো, মিনিয়ের রচনার কথা, যারা ইতিহাসে ব্যক্তিত্ব ও জনগণের ভূমিকার মত প্রশ্নটি প্রণয়ন করেন, শ্রেণী-সংগ্রামের শিক্ষাটি তৈরি করেন, আর তদ্দ্বারাই ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার জন্য জমিন তৈরি করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস আবিষ্কৃত ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা-জনসাধারণকে সামনে এনেছিল। সমাজ হল জনসাধারণ থেকে গঠিত

আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের যোগফল। তার অস্তিত্ব বিদ্যমান লোকজনের শ্রমের কল্যাণে, যারা তৈরি করে জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নানা বৈষয়িক সম্পদ — অন্ন ও বস্ত্র, বাসগৃহ ও উৎপাদনের নানা হাতিয়ার। জনসাধারণ — এ এক সুনির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক ধারণা : দাসসমাজে —এ হল দাস ও প্লিবিসইট, সামন্ত সমাজে — সামন্তের উপর নির্ভরশীল (অনিচ্ছায় অথবা ভূমিদাস) ও কারিগর, পুঁজিবাদী সমাজে — প্রলেতারিয়েত (মেহনতি) ও শ্রমজীবী কৃষককুল। যে-সমাজে শোষণ নেই, যেখানে মানুষ মানুষকে নির্যাতন করে না, — সেখানে গোটা জনসমষ্টিই হল জনসাধারণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম 'পবিত্র পরিবারে' ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকা বৃদ্ধির নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেখান যে, জনসাধারণ — ইতিহাসের স্রষ্টা, সমাজের গোটা বৈষয়িক সংস্কৃতির নির্মাণকর্তা, প্রত্যেক প্রজন্মের ক্রিয়াকলাপ চলে পূর্ববর্তীর 'কাঁধে' ভর দিয়ে, দাসদের শ্রমে গড়ে উঠেছে প্রাচীন সংস্কৃতি, অনিচ্ছা-বন্দিদের শ্রমে — সামন্ত, মেহনতিদের শ্রমে — আধুনিক সভ্যতা। জনগণের রোজকার শ্রম বিনা সুমহান নানা ব্যক্তিত্বের — বিজ্ঞানীদের, রাজনৈতিক কর্মীদের, শিল্পীদের কাজকর্ম বাস্তবে রূপলাভ করত না।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বিকল্পের — ব্যক্তিত্ব অথবা জনসাধারণ — অবসান ঘটিয়েছিল। জনসাধারণের চূড়ান্ত ভূমিকা ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করে না। ব্যক্তিত্ব সৃষ্ট সবকিছুই ইতিহাসের সম্পত্তি। মহান ব্যক্তিত্ব আকস্মিকভাবে নয় বরং দেখা দেয় প্রয়োজনের খাতিরে,

সেখানে এবং তখন, যেখানে ও যখন সমাজ, ইতিহাস দ্বারা তার আবশ্যিকতা দেখা দেয় : 'এমন ব্যক্তির যখন প্রয়োজন হয়েছিল, তার খোঁজ পাওয়া গেছিল : সিজার, অগস্টাস, ক্রোমওয়েল।'* রেনেসাঁসের 'সুমহানদের' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন, সুমহান ব্যক্তিত্ব চূড়ান্ত আকারে সমাজের চাহিদার প্রতিফলন ঘটায়, নিজ কালের নানা স্বার্থের ভরাট ক্ষেত্রে বাস ও কাজকর্ম করেন, তদ্দ্বারাই সামাজিক-ব্যবহারিক কর্তব্যগুলি সমাধানে সহায়তা করে...। কেউ কথায় ও লেখায়, কেউ তরবারি দিয়ে, আর কেউ এটা ও অন্যটা দিয়ে একত্রে।**

ঐতিহাসিক সৃষ্টির ব্যাপারে জনসাধারণের চূড়ান্ত ভূমিকা মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা কমায় না। ইতিহাসের গতিবিধি বদলের শক্তি 'মহান' ব্যক্তিত্বের নেই, তবে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গতিবিধির উপর সুনির্দিষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেন।

ব্যক্তিত্বের ভূমিকা 'মাপা হয়' ইতিহাসে তার কর্ম পরিসর দ্বারা, নিজের সামনে স্থাপিত নানা লক্ষ্য ও কর্তব্য দ্বারা। রুশ বিপ্লবী, মার্কসবাদী প্লেখানভ মনে করতেন, 'মহান ব্যক্তি মহান... তদ্দ্বারা যে, তাঁর সেইসব বৈশিষ্ট্য আছে, নিজ কালের মহান সামাজিক প্রয়োজনীয়তাগুলির সেবার জন্য যেগুলি তাঁকে সর্বাধিক দক্ষ করে তোলে।' মহান ব্যক্তিরা ঘন ঘন দেখা দেন

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী, খঃ ৩৯, পৃঃ১৭৬ (রুশ সংস্করণ)।

** ঐ। খঃ ২০, পৃঃ ৩৪৭।

ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে। ইংলন্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব ইতিহাসে ক্রোমওয়েলের নাম যুক্ত করেছে, মহান ফরাসী বিপ্লব ইতিহাসকে দিয়েছে সাঁত-জুস্ট ও মিরবো, দাঁতোঁ ও মারাত, রোবস্‌পিয়ার ও নেপোলিয়ন।

তাও কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস — আলাদা কিছু মহান ব্যক্তির ইতিহাস নয়, এ হল সমাজের ইতিহাস, — লোকজনের ইতিহাস। ব্যক্তিত্ব হল সমাজের ফল, তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ গঠনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজকে দেখা উচিত নয় : এ দুই-ই নিবিড়ভাবে জড়িত, গঠন করে এক অখন্ড সত্তা।

সমাজের ইতিহাসের উদ্ভব ঘটেছিল পৃথিবীতে মানুষ ও আদিম মানবপাল দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, এবং সে মুহূর্ত থেকেই তা হল লোকজনের ইতিহাস। ইতিহাসের কর্তা হল মানুষ। সমাজ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় লোকজন দ্বারা,মানবজাতি দ্বারা ঐতিহাসিক 'সৃষ্টির' কাজ, যা হল ইতিহাসের সারবস্তু। লোকে গড়ে নানা বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম চালায়, সমাজের অভ্যন্তরীণ নানা বৈপরীত্য অতিক্রম করে, তদ্দ্বারাই নিজেদের বদলায়, বদলায় নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক। সমাজের ইতিহাস হল আলাদা আলাদা মানুষের, মানুষের নানা কর্মিদলের, গোটা মানবজাতির সুনির্দিষ্ট ও বহুরূপী কাজকর্মের সমষ্টি।

শত হাজার বছর ধরে মানবজাতি-অতিক্রান্ত পথ দেখাচ্ছে যে, তার ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়া অবজেকটিভ, আইনসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সমাজ বিকাশে প্রভাব

ফেলে অনেক হেতু — সেগুলির জটিল দ্বান্দ্বিক পারস্পরিক ক্রিয়ায় : উৎপাদনী শক্তি, উৎপাদন সম্পর্ক ও তদানুযায়ী সেগুলির উপরি-কাঠামো-জনিত ব্যাপারগুলির (রাষ্ট্র,আইন, ইত্যাদি) বিকাশ হার, ভৌগোলিক পরিবেশ, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও তার বৃদ্ধি, নিজেদের মধ্যে জনগণের মেলামেশা, ইত্যাদি। এর প্রতিটি হেতুই সমাজ বিকাশে সবিশেষ প্রভাব ফেলে, আর তা তার অস্তিত্ব ও বিকাশের অত্যাবশ্যক শর্তাদির যোগফল সৃষ্টি করে।

আমরা আগেই বলেছি, সমাজ বিকাশের নানা হেতুর সমষ্টিতে প্রধান হল নানা বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন, অর্থাৎ মানুষের জীবনধারন ও তার কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা। কেননা লোকেদের 'রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম, ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার মতো অবস্থা হবার আগে সর্বাগ্রে তাদের খাওয়া, পান করা দরকার, বাসগৃহ থাকা ও পোষাক পরা দরকার।'*

বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন প্রণালীর উপরই শর্তাধীন সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক কাঠামো, তাতে প্রভুত্বকারী সম্পর্কের ধরনও তা নির্ধারণ করে। আলোচ্য প্রতিটি সমাজের সামাজিক চেতনা, তার নানা সামাজিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান হল তার সামাজিক সত্তার আর সর্বাগ্রে সে সমাজে প্রভুত্বকারী উৎপাদন প্রণালীর প্রতিফলন।

---

* ক. মার্কস, ফ. এঙ্গেলস। রচনাবলী। খঃ ১৯, পৃঃ ৩৫৫ (রুশ সংস্করণ)।

জীবনে পা ফেলে লোকেদের প্রতিটি নতুন প্রজন্ম সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট এক অবজেকটিভ সামাজিক ব্যবস্থার দেখা পায়, যা শর্তাধীন উৎপাদনী শক্তির অর্জিত হারের উপর। তবে সেই একই সময়ে নতুন নতুন সামাজিক ধারণা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সেগুলি দেখা দেবার পর তাদের দ্বারা উদ্ভূত বৈষয়িক সমপর্ক থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা লাভ করে, এবং সুনির্দিষ্ট ধারায় লোকেদের কাজ করার উৎসাহ দিয়ে, তদ্দ্বারাই সামাজিক বিকাশের গতিবিধিতে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে।

বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তি বিকাশে রদবদল, যে-শক্তি বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বৈপরীত্যে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ সামাজিক সত্তার রদবদল, লোকেদের সামাজিক চেতনায় প্রতিফলিত হয়, তা হল নতুন নতুন ধারণা দেখা দেবার কারণ। এই বৈপরীত্যের ফলে সমাজের ভিতরে সেইসব লোকের নানা শ্রেণী ও গ্রুপের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেয়, যারা নতুন ও পুরনো সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার সমর্থক, তাও আবার লোকজন ও সুমহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের কাজকর্মে সচেতন হেতুগুলি হল নানা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন।

পরস্পর-বিরোধী সমাজগুলিতে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তি ও বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের অসঙ্গতি ফুটে ওঠে শ্রেণী-সংগ্রামে। মালিকানা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরনগুলির রদবদল সর্বদা লোকজনের শ্রেণী স্বার্থগুলিও স্পর্শ করে। এবং এখানে উদ্ভূত নানা অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের মীমাংসা করা যেতে পারে শুধু

শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে, যার সর্বোচ্চ প্রকাশ হল জনসাধারণ দ্বারা করা সামাজিক বিপ্লব। জনগণ হল ইতিহাসের মুখ্য স্রষ্টা, যেহেতু মানবসমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক বিকাশে তা চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

ঠিক সে কারণেই ব্যক্তিত্বের সামাজিক সক্রিয়তার উপর মার্কসবাদ বিপুল গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক সক্রিয়তা বলতে কী বোঝায় ?

ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষমতা থেকে পার্থক্যস্বরূপ ব্যক্তিত্বের সামাজিক সক্রিয়তা নিহিত আছে ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে। ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা আছে সবার আর সর্বাগ্রে তার, যে কাজ করে নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্যাদি পূরণের উদ্দেশ্যে। এইসব লোকের সম্বন্ধে মার্কস লিখেছেন : 'তথাকথিত 'ব্যবহারিক' লোকজন ও তাদের অতিবিজ্ঞতার উপর আমার হাসি আসে। পশু হতে চাইলে অবশ্য মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের গাত্রচর্মের যত্ন নেওয়া চলে।'*

এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা সামাজিক সক্রিয়তা থেকে ঠিক ততই দূরের ব্যাপার, যেমনটি নিষ্ক্রিয় অনুধ্যান। যথার্থ সক্রিয়তা পরিচালিত হয় মানবজাতির মঙ্গলের উদ্দেশে, সেইসব কর্তব্য সমাধানের উদ্দেশে, যেগুলি প্রতিফলিত করে সমাজ বিকাশে নানা প্রগতিশীল প্রবণতা। বিভিন্ন ভাবে সামাজিক সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে। এ হল প্রচণ্ড মেহনতে মরীয়া-হওয়া দাসের রোষ, এ হল

---

* ঐ, খঃ ৩১, পৃঃ ৪৫৪।

নিজের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ধরে-রাখা অটল চিন্তাবীর, এ হল মাতৃভূমি রক্ষাকারী সৈনিকের বীরত্ব। তবে মার্কসবাদীদের মতানুসারে, সামাজিক সক্রিয়তার সর্বোচ্চ ধরন হল সচেতন সংগ্রাম, যার উদ্দেশ্য সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন এবং মানবজাতির কমিউনিস্ট ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা।

সামাজিক সক্রিয়তা — এ হল সামাজিক রদবদলের ভাগিদার হওয়ার অনুভূতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক একতা।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থাদির মিল সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয়তার বিপরীত-ধর্মী নয়। বরং উল্টো ; প্রত্যেকের সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপ — সমাজের লক্ষ্য অর্জনের শর্ত। সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের সামাজিক সক্রিয়তা কর্মিদলের, শ্রেণীর, গোটা সমাজের সামাজিক সক্রিয়তা থেকে অবিচ্ছেদ্য, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক মীমাংসার প্রয়োজনীয় নানা কর্তব্যের বিপুল আয়তনের জন্য যৌথ সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের একান্ত প্রয়োজন আছে।

সংজ্ঞাভিধান

অদৃষ্টবাদ (ফরাসী fetiche— মূর্তি, টালিসম্যান), প্রাণহীন বস্তুর কর্তৃত্ব, ধর্মবিশ্বাসীদের ধারণায় যা অপরিসীম (সুপারন্যাচারাল) গুণাগুণের অধিকারী।

অনুমান (গ্রীক hypothesis থেকে — ভিত্তি, পূর্বানুমান), নানা ঘটনার আইনসিদ্ধ যোগাযোগের ব্যাপারে আন্দাজভিত্তিক মত।

আদর্শ (ফরাসী ideal), নমুনা, সুসম্পূর্ণ কোনকিছু প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

আবেগ (*ফরাসী emotion, লাতিন emoveo* — কাঁপছি, উৎকণ্ঠা বোধ করছি), মানুষ ও পশুর প্রতিক্রিয়া, দেখা দেয় ভিতরের ও বাইরের উত্তেজকের

প্রভাবে, উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত এক সাবজেকটিভ আকার আছে। নানা চাহিদা মেটা, না-মেটার সঙ্গে জড়িত।

আবেগবাদ (ইংরেজি emotive — আবেগ সৃষ্টি), এক নান্দনিক তত্ত্ব, যার মতে নৈতিক মতামত ও বোধ আবেগের শুধু প্রকাশ ও জাগানোর কাজ করে।

ইন্দ্রিয় অনুভূতি (পরবর্তী কালের লাতিন intuitio — অনুধ্যান থেকে), কোন প্রমাণ ছাড়াই তার প্রত্যক্ষ বিবেচনার পথে সত্য লাভের ক্ষমতা।

উৎকণ্ঠা (লাতিন affectus থেকে — প্রাণকাঁপা, কামনা), স্বল্পকালীন প্রবল আবেগ, দেখা দেয় প্রচণ্ড উত্তেজনার প্রত্যুত্তরে।

কল্পনা, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া, দেখা দেয় নানা ধারণা ও মনে মনে চিন্তা করা পরিস্থিতি গড়ার দরুন, মানুষ কর্তৃক কখনই বাস্তবে পুরো উপলব্ধি করা হয় না।

ক্ষমতা — ব্যক্তিত্বের নিজস্ব নানা বৈশিষ্ট্য, সুনির্দিষ্ট ধরনের ক্রিয়াকলাপের সফল বাস্তবায়নের সাবজেকটিভ শর্তস্বরূপ।

জনগণ — বস্তুজনিত সম্পদের স্রষ্টা, আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের মুখ্য শক্তি।

নিঃসঙ্গতা — এই সামাজিক প্রক্রিয়া, যার বৈশিষ্ট্য মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও তার ফলাফলকে এক স্বাধীন শক্তিতে পরিণত করা, যা তার উপর আধিপত্য করে ও তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

নৃতত্ত্ববাদ, দার্শনিক মতবাদ, মানুষের প্রকৃতিকে যা এক অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক সত্তা রূপে ব্যাখ্যা করে, যাতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মিল ঘটে।

নৃআকারবাদ (গ্রীক anthropos মানুষ ও morphé—আকার ধরন), মানুষের অনুরূপ, মানুষের গুণাগুণের অধিকারী নানা বস্তু, ঘটনা, পশু ও পৌরাণিক সত্তা।

পুরাকাহিনী — দেবদেবী ও বীর নায়কদের কাজকর্মের সুপ্রাচীন গুণগান, যার মূলকথা ছিল জগৎ সম্বন্ধে আলৌকিক ধারণা।

বংশতত্ত্ব (গ্রীক phylon — বংশ, উপজাতি), জীব জগতের ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়া। বংশতত্ত্বকে বিবেচনা করা উচিত দেহযন্ত্রগুলির ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে একত্রে, প্রাণতত্ত্বের সঙ্গে।

বিশ্ববীক্ষা, অবজেকটিভ জগৎ ও তাতে মানুষের স্থানের ব্যাপারে, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রতি ও খোদ নিজের প্রতি মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে

সাধারণীকৃত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের এক ব্যবস্থা, এবং তৎসহ এইসব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শর্তাধীন মানুষের নানা বিশ্বাস, ভাবাদর্শ, চেতনালাভের ও ক্রিয়াকলাপের নীতি।

ব্যক্তিত্ব — সামাজিক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপের কর্তা (subject) রূপে মানুষ ; সামাজিক-তাৎপর্যসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীর এক সুস্থায়ী ব্যবস্থা, ব্যক্তি-বিশেষকে যা সমাজের সদস্য রূপে উত্থাপন করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা — কোন এক ঘটনার, সত্তার, মানুষের অদ্বিতীয় স্বকীয়তা।

মানুষের-রূপদান (লাতিন persona মানুষ)। প্রকৃতির নানা ঘটনা, মানুষের গুণাগুণ, বিমূর্ত বোধকে মানুষের ভাবমূর্তিতে পেশ করা।

মূল্যবোধ — মানুষ, শ্রেণী, সমাজের পক্ষে পারিপার্শ্বিক জগতের নানা লক্ষ্যবস্তুর ইতিবাচক তাৎপর্য, মানুষের কর্মজীবনের ক্ষেত্রে সেগুলির জড়িত থাকার ব্যাপার নির্ধারণকারী।

মূল্যায়ন — নানা সামাজিক ব্যাপার, আচরণের প্রতি সম্পর্ক, সেগুলির সামাজিক তাৎপর্য নিরূপণ, সামাজিক মূল্যবোধ অনুসারে।

লক্ষ্য — ক্রিয়াকলাপের ফলের আদর্শ, মনে মনে প্রশংসা করা।

শ্রেণী, সামাজিক, বড় বড় গ্রুপের লোকজন, যাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় স্থান অনুসারে, উৎপাদন উপকরণসমূহের প্রতি সম্পর্কের বিচারে, শ্রম সংগঠনে ভূমিকার বিচারে, প্রাপ্ত আয়ের নানা পদ্ধতি ও আয়তনের বিচারে।

সংযুক্তিবাদ (গ্রীক sinkëtismos — সংযুক্তি), অবিভাজ্যতা, কোন ব্যাপারের অবিকশিত অবস্থার পরিচায়ক।

সমব্যথা (গ্রীক empatheia — দরদ), দরদের আকারে অন্য মানুষের আবেগজনিত অবস্থায় পৌঁছান।

সম্প্রদায় — প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে এক সামাজিক গ্রুপ, প্রথা অথবা আইন অনুসারে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নানা নিয়ম ও দায়দায়িত্বের অধিকারী।

সাফাই (গ্রীক kátharsis — সাফাই থেকে), *অ্যারিস্টটল* প্রদত্ত সংজ্ঞা, বিষাদজনক শিল্পের লক্ষ্য রূপে ভীতি ও সহযাতনার সাহায্যে প্রাণ সাফাই করা।

সামাজীকরণ (লাতিন socialis — সামাজিক), মানুষ কর্তৃক বিভিন্ন জ্ঞান, মাত্রা ও মূল্যাবোধের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আয়ত্তে আনার প্রক্রিয়া।

সৃষ্টিতত্ত্ব (লাতিন creatio — সৃষ্টি থেকে), শূন্য থেকে ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্ব।

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব (লাতিন, spontaneus — আপনা-আপনি, স্বেচ্ছায়), আপনা-আপনি দেখা দেওয়া, স্বেচ্ছা-অগ্রগতি, যা দেখা দেয় বাইরের হেতু দ্বারা নয়, বরং অভ্যন্তরীণ নানা কারণ দ্বারা।

স্বৈরতন্ত্র (লাতিন autoritas — শাসন-ক্ষমতা থেকে), রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতার গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা। সাধারণত এর সঙ্গীস্বরূপ থাকে ব্যক্তিগত একনায়কত্বের নানা উপাদান, শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির পরম দোষপাপহীনতা প্রচার করা।

স্মৃতি — অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা, স্নায়ু ব্যবস্থার অন্যতম এক মূল বৈশিষ্ট্য, যার প্রকাশ ঘটে বহির্জগতের ঘটনাবলী ও দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে খবরাখবর সুদীর্ঘকাল ধরে বজায় রাখার এবং বার বার তাকে চেতনা ও আচরণ ক্ষেত্রে নিয়ে আসার ক্ষমতা দ্বারা।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা :

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

03 DECEMBER 2016
CALCUTTA
BENGAL
INDIA

₹ 30

লেনিনব

... মিউনিজম

...স্তুবাদ কী

ঐ... ক বস্তুবাদ কী ?

পুঁজিত... কী

সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্বৃত্ত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

রাষ্ট্র কী

বিপ্লব কী

উত্তরণ পর্ব কী

ট্রেড ইউনিয়ন কী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী

ব্যক্তিত্ব কী

সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ

ISBN 5-01-001678-8